ধর্ম ও জীবন

রণজিৎ কুমার সেন

পরিবেশক
গ্রন্থনিলয়
৫৭/১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

DHARMA-O-JIBAN
[Religion and Life]

By RANAJIT KUMAR SEN

প্রকাশক

নায়ক বুক হাউস

প্রধান কার্যালয়

৮১/১ই, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

শাখা

স্টেশন রোড * মেদিনীপুর

প্রথম প্রকাশ

বড়দিন, ১৯৬০

প্রচ্ছদ

সুভাষচন্দ্র দত্ত

মুদ্রক

নায়ক প্রিণ্টার্স

৮১/১-ই, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

বিষয় সূচী

উৎসর্গ

শ্রীমৎ স্বামী পরমাত্মানন্দজী মহারাজ

প্রীতিনিলয়েষু,—

ধর্ম ও জীবন

শাস্ত্র বলেছেন ঃ 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'। ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। এর অর্থ কি ? অর্থ এই যে, ধর্ম কোনো বাইরের জড়বস্তু নয় ; জড়বস্তু মাত্রেই ইন্দ্রিয়-বোধগ্রাহ্য, তাকে দেখা যায়, তাকে স্পর্শ করা যায়, কিন্তু ধর্ম রয়েছে চেতনার গভীরে অন্তর্গুহায় নিবদ্ধ, তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না, মন দিয়ে ধরতে হয়, অনুভূতি দিয়ে জানতে হয়। সে-ই পরমসত্য—যা আমাদের সমস্ত সত্তাকে আবৃত ক'রে মনকে ভূমি থেকে ভূমামুখী ক'রে তুলছে। ভূমি থেকে ভূমার অর্থ ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, সসীম থেকে অসীম। প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের এই জীবজগতে আমরা ক্ষুদ্র ও সসীমকেই জানি, কিন্তু এ'জানা আমাদের সম্পূর্ণ নয়। ফুলের একটি চারা এনে লাগালে তাতে যে একদিন ফুল ফুটবে—এটা প্রাকৃতিক নিয়মের একটি প্রত্যক্ষানুভূতির প্রায় অনিবার্য সত্য, কিন্তু কোনো একটি মানুষকে ধরলেই তার মধ্যে যে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত বা দর্শনের স্ফূরণ অবশ্যই লক্ষ্য করবো, এমন নিশ্চয়তা নেই। প্রাকৃতিক নিয়মের প্রত্যক্ষানুভূতির তা বাইরে। তবে সে কি সাধনার বস্তু ? অবশ্যই, কিন্তু একমাত্র নয়। সাধনার সুফল তখনই প্রত্যাশা করা যায়—যখন সাধনার মূল বিষয়টি তার অন্তরে স্বতস্ফূর্তভাবে বিকীরিত হয়। সূর্যের আলো যেমন সর্বত্র একইভাবে বিকীরিত হয় না, তেমনি মানুষমাত্রের জীবনেও সেই সাধন-বিষয়ের স্বতস্ফূর্ত বিকীরণ একইভাবে ঘটে না। তাই কেউ কেউ শিল্পী বা স্রষ্টা হয়, সকলে নয়। তার মূলে আছে সেই ভূমার স্ফূর্তি—যে স্ফূর্তি না ঘটলে এই ভূমিজগতে প্রতিভার আলোর অবতরণ ঘটে না। তবে কি সাধনা মিথ্যে ? না, মিথ্যে কেন হবে ? সাধনা সেই ভূমার স্ফূর্তিকে অন্তরে সম্ভাব্য ক'রে তোলে। তাই দেখতে পাই—একদিনের দস্যু রত্নাকরকে আর-একদিনের বাল্মীকি হয়ে উঠতে। দু'য়ের মাঝখানে রয়েছে সেই সাধনা। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে অকস্মাৎ যে শ্লোক উচ্চারিত হলো—'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং',—তা কোথা থেকে এলো ? এলো সেই ভূমালোক থেকে—যা তাঁর ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে, যা সসীম ছেড়ে অসীমে ।

তা হলে দেখা যাচ্ছে—একমাত্র এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক জগৎই জগৎ নয়, এই ক্ষুদ্র ও সসীমের ঊর্ধ্বেও একটি বৃহৎ ভূমা-জগৎ আছে—যা অসীম। এই সীমায় এবং অসীমে মিলে আমাদের জীবন অনবরত লীলায়িত হয়ে উঠছে। কিসের এই লীলা ? লীলা প্রাণের। সেই প্রাণ ভূমা থেকে এই দেহের গুহায় কেবলই আবর্তিত হচ্ছে। উপনিষদ তাই বলেছেন ঃ 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণঃ এজতি নিঃসৃতম্' ঃ জগতের সব-কিছুকে এই প্রাণই জাগিয়ে রাখছে, মহাপ্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে এই প্রাণই জীবদেহে আবর্তিত হচ্ছে। এই প্রাণই ধর্ম ও সত্যরূপে নিহিতং গুহায়াম্,—অন্তরের গুহায় নিহিত। এই সত্যকে জানাই মানবজীবনের

সাধনা। সাধনাই ধর্মকে সত্যরূপে জগৎকে জানিয়ে দিচ্ছে। জগৎও চলছে, জীবনও চলছে ; জগৎ ও জীবন এখানে একার্থক। এই চলাকে চলমান ক'রে রাখছে ধর্ম। যা ধরে থাকে, তাই ধর্ম। মনুষ্যধর্মই হচ্ছে সত্যকে জানা ; সত্যের দ্বারা সে বিধৃত, এবং সত্যেই তার গতি। ভূমাসত্য থেকে সে কেবলই ভূমিসত্যে প্রকাশিত হচ্ছে। নিরীশ্বরবাদীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও সত্যকে স্বীকার করে। এই সত্যই যখন সত্যধর্মরূপে গ্রাহ্য হয়, তখনই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে হয়, উপলব্ধি করতে হয় ঈশ্বরকে। কারণ ভূমালোকই হচ্ছে ব্রহ্মলোক। সেই সত্য বা ঈশ্বরকে দিয়েই এই জগৎ আচ্ছাদিত। উপনিষদ তাই বলেছেনঃ 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'। তিনিই সত্য এবং ধর্মরূপে জাগ্রত। যারা অবিবেকী-চিত্ত, তারা মায়ার আচ্ছাদনে আবৃত হয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের স্পর্শকাতর বিষয়বস্তুর মধ্যেই আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু যারা স্থিতপ্রজ্ঞ, তারা ভূমির আসনে বসেই সহজে ভূমাকে উপলব্ধি করতে পারে, বলতে পারে ঃ 'ভূমৈব সুখং', কারণ তারা বুঝেছে—'নাল্পে সুখমস্তি'। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই প্রাকৃতিক জগতের যাকিছু সুখ, তা প্রকৃত সুখ নয়, স্থায়ী সুখ নয় ; আর যা স্থায়ী সুখ নয়, তা দুঃখেরই নামান্তর মাত্র। সেই দুঃখকে অতিক্রম করার পথ হচেছ সাধনা। সাধনাই মোহপাশ ছিন্ন ক'রে সত্যকে অবলোকন করায়, প্রতিষ্ঠিত করে ধর্মে। নিজের অন্তরেই মানুষ তখন ধর্মের তত্ত্ব উপলব্ধি ক'রে ভূমার সঙ্গে যুক্ত হয়। দুঃখের সুখ ছেড়ে তখন সে আনন্দের সুখে অমৃত লাভ করে, কারণ 'আনন্দরূপমমৃতম্'। মানুষের জীবনে এই সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা।

এই প্রাকৃতিক জগতে ইন্দ্রিয়-সুখ, কাঞ্চন-সুখ, কোনো সুখই জরা-মরণ-নিরপেক্ষ নয়। এখানে অর্থের কৌলিন্য ক্ষণিকের, যাবতীয় ভোগের শেষ-পরিণাম শ্মশান। মানুষ তাই মৃতলোকে কেবলই অমৃতের সন্ধান করে। এই সন্ধানের জন্যেই নানা তিতিক্ষা, নিয়ম, প্রাণায়াম ও তপস্যা। যাকে আপাতভাবে সে ধর্ম বলে মনে করে, আসলে তা ধর্ম নয়, তা কিছু বা লোকাচার, কিছু বা সংস্কার। তাকে জয় ক'রে মানুষ যখন আপন স্বরূপে প্রবেশ করে, তখন সে জ্ঞাননেত্রে লক্ষ্য করে যে, ধর্মের আসনে সত্য ব'সে আছেন। এই সত্যই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, এই সত্যই সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। এই সত্যই ঈশ্বর। মানব-দেহের গুহায় তিনি নিহিত আছেন বলেই চক্ষু এমন ক'রে বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখতে পায়, কর্ণ এমন ক'রে ভূমার ধ্বনি শুনতে পায়, শব্দ এমন ক'রে মুখনিঃসৃত হয়ে বিশ্বকে ভাষা দেয়, মস্তিষ্ক এমন ক'রে সমস্ত দেহকে পরিচালিত করে, মন এমন ক'রে সৃষ্টিশীল চিন্তায় রূপ দেয় কর্মকে। এই গুহা থেকে যখনই তিনি অন্তর্হিত হন, তখনই মৃত্যু এসে জীবনের রঙ্গমঞ্চে কালো যবনিকা টেনে দেয়। জীবনকে তাই সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতেই মানুষের চিরকালের সাধনা। জীবনেশ্বরের স্তবই মানুষের যখন সব হয়, সবকিছুকে মানুষ যখন ঈশ্বর-

চেতনায় গ্রহণ করে, জীবন তখন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে সর্বকিছুর মধ্যেই অমৃত আস্বাদ করে। জীবনকে সেই স্তরে নিয়ে যাবার সাধনাই মানুষের অলক্ষ্যসাধনা। তার জন্যেই তার যা-কিছু হোম, যজ্ঞ, তিতিক্ষা, নিয়ম, সংযম, পূজা, আরাধনা, প্রার্থনা, ধ্যান ও তপস্যা।

জীবজগতে মনুষ্যধর্মের অবশ্যই কিছু সোপান আছে। যেমন—অপরের প্রতি দয়া ও ক্ষমা, দুর্বলের প্রতি মমতা, প্রার্থীর প্রতি দান, হিংসা ও হত্যা থেকে বিরত থাকা, সৎ ও পুণ্য কর্ম সাধন প্রভৃতি। কিন্তু এই সমুদয় বিষয়ই মনুষ্যত্বের অঙ্গ বা সোপান মাত্র। মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জনই প্রধান। এই মনুষ্যত্বকে ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে প্রায়শঃই আমরা মূল ধর্ম থেকে সরে থাকি। মানুষকে মানবিক বোধ নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে তার জীবনধারণের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অনুষঙ্গকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়, নইলে জীবন কলুর ঘানি বা জাঁতাকলে রূপ পায়, পুষ্পিত বাগিচা হয়ে ওঠে না। এই বাগিচা হয়ে উঠতে গিয়েই তার সুকুমার বৃত্তিগুলির স্ফুরণ আবশ্যক। এই স্ফুরিত বৃত্তিগুলির দ্বারাই মানুষ ভালোবাসে, দান করে, মমতাশীল হয়। মনুষ্যত্বের এ সমস্তই সোপান মাত্র, কিন্তু মূল ধর্ম নয়। যেমন নানা যোগে বা পার্বণে বা বিশেষ বিশেষ তিথিতে পুণ্যস্নান করা। তাতে ক্ষণ-কালের মানসিক বিশুদ্ধি বা পবিত্রতা ঘটলেও তাকে কোনোক্রমেই ধর্ম ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। এও ধর্মে পৌঁছাবার সোপান মাত্র। কারণ মন বিশুদ্ধ না হলে একাগ্র হয় না, এবং একাগ্র না হলে পরম সত্যের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়া যায় না। যোগীরা এই যোগের পথকেই নির্দেশ করেছেন। যখন সর্বদিকের সকল পথ এক উৎসে গিয়ে মেলে, তখনই ঘটে ধর্মের সাক্ষাৎ। গঙ্গোত্রীর ধারার মতো তখন সেই মূল ধর্ম মানুষকে সত্যের সহস্র ধারায় প্লাবিত ক'রে তোলে। তখন তার কাছে আচার-অনুষ্ঠান, পাল-পার্বণ, স্নান-অভিষেক সবই তুচ্ছ হয়ে যায়। তখন বর্ণ, জাতি ও বংশ-পরিচয় মুছে গিয়ে মানুষে মানুষে একাত্ম হয়ে ওঠে। তখন আর বিকার থাকে না, বিরোধ থাকে না, একটা বিরাট সামঞ্জস্যের মধ্যে তখন সবই নির্বিকার—সবই একাকার। ধর্ম তখন প্রসন্ন ব্রহ্মসত্তায় আপন লীলায় কেবলই দিতে থাকেন, আর পেতে পেতে মানুষ কেবলই সত্যনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এই হয়ে ওঠাই মানুষের প্রকৃত ধর্ম। আচারনিষ্ঠ পুরুষ আর ধর্মনিষ্ঠ পুরুষে এইখানেই প্রভেদ। মানুষের কাছে এই প্রভেদের অঙ্কুরগুলি যতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ততই সে সুখী হয়, ততই আপন অন্তরের ব্রহ্মবিহারে সে আত্মনিষ্ঠ বা ঈশ্বর হয়ে ওঠে। মানুষ তার নিজের অজ্ঞাতে এই ঈশ্বর হয়ে উঠতে চায় বলেই প্রাত্যহিক নানা বস্তুবাদী কর্ম ও জীবন-সংগ্রামের মধ্যে তার যা-কিছু জপ-তপ যাগ-যজ্ঞ ও সাধনা।

পার্থিব জগতে যত মত ও যত পথে যত মঠ, মন্দির, গীর্জা ও মস্‌জিদ গড়ে উঠেছে, যত বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় গ'ড়ে তুলে নানা শাস্ত্র রচনা

করেছে, তার মূলে রয়েছে এই একই সত্য। বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের সমস্ত শাস্ত্র মন্থন ক'রে অমৃত আহরণ করা সীমিত আয়ুর মধ্যে কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই কারণে বলা হয়েছে—

'অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্।'

অর্থাৎ শাস্ত্র অনন্ত, তা বিদিত হতে বহুদিনের আবশ্যক, অথচ জীবন স্বল্পকাল স্থায়ী এবং তার মধ্যেও বহুসংখ্যক বিঘ্ন দৃষ্ট হয়। সুতরাং হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হতে কেবল সারাংশটুকুই গ্রহণ করে, তেমনি নানা শাস্ত্রমধ্যে যা সারভূত, তা লাভ করতে যত্নবান হওয়াই বিধেয়। এই উদ্দেশ্যে সর্বশাস্ত্রের মধ্যে যে সমন্বয় খুঁজে পাই, তার প্রকৃত বাক্-রূপ লক্ষ্য করি নিম্নে উদ্ধৃত সুভাষিতবলীতে—

(ক) একমাত্র ধর্মই বন্ধু—যিনি মরণকালেও অনুগামী হন ; সংসারের আর সমুদয় বস্তুর সম্বন্ধ শরীরের সঙ্গে বিনাশ পায়. কিন্তু কেবল ধর্মই থাকেন।

হে জীবসকল ! উত্তিষ্ঠত, উত্থান করো, অজ্ঞান-নিদ্রা থেকে জাগ্রত হও, এবং বরণীয় আচার্যের নিকটে গিয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করো। পণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম ব'লে অভিহিত করেছেন।

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম-মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পরম পতি. সেই পরাৎপর প্রকাশবান ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই। তাঁকে জানতে পারলে তবেই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে মুক্ত হয়, তিনি ভিন্ন আর গন্তব্যপথ নেই।

যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশচ্ছলে গার্গিকে বললেন : 'হে গার্গি, অবিনাশি পরমেশ্বরকে কেউ দর্শন করেনি, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন ; কেউ তাঁকে শ্রুতিগোচর করেনি, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন ; কেউ তাঁকে মনন করতে সমর্থ হয়নি, কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন ; কেউ তাঁকে জ্ঞাত হয়নি, কিন্তু তিনি সকলই জানেন ; তিনি ব্যতীত দ্রষ্টা নেই, তিনি ব্যতীত স্রষ্টা নেই, তিনি ব্যতীত শ্রোতা নেই, তিনি ব্যতীত মননকর্তা নেই, তিনি ব্যতীত বিজ্ঞাতা নেই। হে গার্গি, আকাশ এই অবিনাশী পরমেশ্বরে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে।' —উপনিষদ।

(খ) ধর্মের দশবিধ লক্ষণ, যথা—ধৈর্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য, দেহ ও অন্তরশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্যকথন ও অক্রোধ।

মনুর মতে : অহিংসা, সত্যবাক্য, অচৌর্য, দেহ ও চিত্তশুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সংযম— সংক্ষেপে এই কটিই সকল জাতির সাধারণ ধর্ম। —মনুসংহিতা।

(গ) যিনি স্বয়ং সর্বভূতে ঈশ্বরকে সন্দর্শন করেন, তিনি সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মের পরম পদ লাভ করেন।

বৃক্ষাদিও জীবন ধারণ করে, মৃগপক্ষীরাও জীবন ধারণ করে ; কিন্তু যাঁর মন ব্রহ্মমনন দ্বারা সজীব হয়, তিনিই যথার্থ জীবন ধারণ করেন।

সাধুচিত্ত-ব্যক্তি নির্মল শান্তি-সুখ সম্ভোগ করেন, এবং শান্তিরসের দ্বারা অধিকতর শান্তিলাভ করেন। তিনি প্রশান্ত হৃদয়ে সুখস্বরূপ ব্রহ্মে চিরকাল উৎকৃষ্টরূপে অবস্থান করেন। —যোগবাশিষ্ঠ।

(ঘ) 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।' ঈশ্বরের নামই হচ্ছে 'ওঁ', তাঁর এই নামের মর্ম উপলব্ধি করলে চিত্ত একাগ্র হয়ে সমাধি লাভ করে। সমাধি লাভ করাই তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া। —পাতঞ্জল যোগদর্শন।

(ঙ) মনুষ্যজীবনে স্বর্গলোকপ্রাপ্তির সাতটি গুণ, যথা—তপস্যা, দান, শম, ইন্দ্রিয়সংযম, লজ্জা, সরলতা ও প্রাণীগণের প্রতি দয়া।

যে ধর্ম অপর ধর্মের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে, সে ধর্ম ধর্মই নয়। বিরোধ-পরিহারযুক্ত যে ধর্ম, সেই হচ্ছে সত্যধর্ম।

যিনি সম্মানেও হৃষ্ট হন না এবং অবমাননাতেও সন্তপ্ত হন না, যিনি প্রশান্ত হ্রদের ন্যায় অক্ষুব্ধ থাকেন, তিনিই জ্ঞানী।

সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপস্যা, সত্যই প্রাণীমাত্রকে সৃজন করে, সত্য দ্বারাই সকল লোক ধৃত হয়ে থাকে এবং সত্য দ্বারাই মানুষ স্বর্গলাভ করে।

যেমন চক্ষু দ্বারা নির্মল সলিলে আপনার প্রতিরূপ দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি ইন্দ্রিয় সকলের বিমলতাবশতঃ জ্ঞানের দ্বারা স্বীয় অন্তরে জ্ঞেয় পরমাত্মাকে দর্শন করা যায়।

যিনি সমুদয় প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরের মধ্যে সমুদয় প্রাণীকে দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন।

সুখেই থাকুন আর দুঃখেই থাকুন, যিনি তজ্জন্য নিজের সৎচরিত্রতা থেকে বিচলিত হন না, তিনিই শাস্ত্রচক্ষু।

যিনি পরমাত্মার সঙ্গে স্বীয় আত্মার সংযোগ সাধন ক'রে অবিচলিত চিত্তে যোগী হয়ে অবস্থান করেন, তিনি যেমন পাপিগণের পাপ নাশ করেন, তেমনি অক্ষয় ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

মা মা গৃধঃ,—হিংসা কোরো না। অহিংসাই পরম ধর্ম, অহিংসাই একমাত্র ইন্দ্রিয়-দমন, অহিংসাই শ্রেষ্ঠ দান, অহিংসাই উৎকৃষ্ট তপস্যা, অহিংসাই পরম যজ্ঞ ও পরম বল, অহিংসাই পরম বন্ধু ও পরম সুখ, অহিংসাই পরম সত্য ও পরম শাস্ত্র।

—মহাভারত।

(চ) যার মন ঈশ্বরে লিপ্ত, ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, বিষয়কর্মে লিপ্ত হয়েও ইন্দ্রিয়-দোষমুক্ত, এরূপ ব্যক্তিকেই নির্লিপ্ত সংসারী বলে।

ভগবান বললেন : যে ব্যক্তি আমারই কর্মবোধে সমুদয় কর্ম করেন, আমিই যাঁর একমাত্র গতি, যিনি সর্বপ্রকারে আমাকে ভজনা করেন, যিনি সমস্ত বিষয়ে

আসক্তিশূন্য, কারুর উপর যাঁর বৈরভাব নেই, একমাত্র তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।

—গীতা।

(ছ) যোগী প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় স্থির, গম্ভীর, দুরবগাহ্য, অক্ষয় ও অপার, এবং তিনি কিছুতেই ক্ষুব্ধ হন না।

সাধুব্যক্তি অপ্রমত্ত, গম্ভীরাত্মা ও ধৈর্যবান; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু তাঁর বশীভূত। তিনি নিজে অমানী, অপরকে তিনি সম্মান দান করেন; তিনি সুদক্ষ, সকলের মিত্র, দয়ালু ও জ্ঞানবান।

যে ব্যক্তি ভূমণ্ডলে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হন, তিনিই পৃথিবীতে ধন্য পুরুষ, তিনিই কৃতী ও তত্ত্বজ্ঞ। —বিষ্ণুপুরাণ।

(জ) কামনার বিষয় বহু দুঃখে সঞ্চিত হয়, অথচ সঞ্চিত হয়ে তাতে কেবল দুঃখই উৎপন্ন হয়। যাদের চিত্ত দৃঢ় হয়নি, কামনার বিষয় তাদেরকে ধ্যান, অধ্যয়ন এবং তপস্যা থেকে পরিভ্রষ্ট করবে। পণ্ডিতেরা বলেনঃ কামনার বিষয় সম্ভোগে কিছুতেই পরিতৃপ্তি হয় না; অজ্ঞানীদেরও যাতে প্রজ্ঞাজনিত তৃপ্তি হয়, আমি তাই-ই করবো। —ললিতবিস্তর।

(ঝ) শীল দ্বারা পরিব্যাপ্ত সমাধিতে মহাফল ও মহালাভ হয়। সমাধিদ্বারা পরিব্যাপ্ত প্রজ্ঞাতে মহাফল ও মহালাভ হয়। প্রজ্ঞাদ্বারা পরিব্যাপ্ত চিত্ত কাম, অস্মিতা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা প্রমুখ সকলপ্রকার দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করে।

—মহাপরিনির্বাণ।

(ঞ) ধর্মই প্রকৃত কল্যাণ। অহিংসা, আত্মসংযম ও তপস্যাই ধর্মের উপাদান। যার চিত্ত ধর্মে অবস্থিত, দেবতারাও তাকে শ্রদ্ধা করেন।

জৈনানুশাসনে বলেঃ সকল জগতের কল্যাণ হোক, প্রাণীগণ পরহিতে নিযুক্ত হোক, যাকিছু দোষ—সব বিনষ্ট হোক এবং লোকে সর্বত্র সুখী হোক।

—জৈনশাস্ত্র।

(ট) কখনো শত্রুতা দ্বারা শত্রুতা দমন হয় না, প্রেমের দ্বারা শত্রুতা উপশম হয়। এই সনাতন ধর্ম।

ধর্মদান সব দানকে পরাজিত করে, ধর্মরস সর্ব রসকে পরাভূত করে, ধর্ম-রতি সর্ব রতিকে জয় করে এবং তৃষ্ণাক্ষয় সর্ব দুঃখকে পরাভূত করে। —ধম্মপদ।

(ঠ) সে-ই শ্রেষ্ঠ ধর্মসম্প্রদায়—যার মধ্যে সকল সম্প্রদায়। মনকে জয় করলে জগৎকে জয় করা যায়। নমস্কার, তাঁকে নমস্কার। তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি অনাদি, অনাহত, যুগে যুগে তাঁর একই বেশ।

বেদ ও কোরাণ দর্পণের ন্যায় দুই ভাই, তদ্দ্বারা অন্তরের চিন্তা দূর হয় না। দুই পদ যে বিশ্বাস ক'রে অগ্রসর হয়, তার সামনে তখনই ঈশ্বর উপস্থিত হন।

—শিখধর্মশাস্ত্র।

(ড) মৃগ যেমন জলাশয়ের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়, হে ঈশ্বর,
আমার আত্মা সেইরূপ তোমার জন্য সদা তৃষিত।

ঈশ্বর বলেন ঃ স্বর্গ আমার সিংহাসন এবং পৃথিবী আমার পাদপীঠ। আমার নিমিত্ত তোমরা কোথায় গৃহনির্মাণ করবে এবং আমার বিশ্রাম-স্থানই বা কোথায়!

—ইহুদীশাস্ত্র।

(ঢ) যাচ্ঞা করো, পাবে ; অন্বেষণ করো, পাবে ; আঘাত করো, তোমাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত হবে। কারণ যে যাচ্ঞা করে, সে লাভ করে ; যে অন্বেষণ করে, সে প্রাপ্ত হয়, এবং যে আঘাত করে, তার প্রতি দ্বার উন্মুক্ত হয়।

ঈশ্বরেই আমরা জীবিত আছি, ঈশ্বরেই আমরা বিচরণ করি, এবং ঈশ্বরেই আমাদের অস্তিত্ব ; কারণ আমরা সকলেই তাঁর সন্তান।

যে প্রীতি করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রীতিস্বরূপ।

—যীশু ঃ খ্রীষ্টশাস্ত্র।

(ণ) পূর্ব পশ্চিম দিক উভয়ই ঈশ্বরের, অতএব যেদিকে ফিরেই তুমি উপাসনা করো, সেদিকেই তাঁর আনন ; পরমেশ্বর সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।

যিনি ক্ষমা করেন, এবং শত্রুদের সঙ্গে মিলিত হন, তিনি ঈশ্বরের নিকট পুরস্কৃত হন।

পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ কোরো না ; তুমি তো কখনই পদভারে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতসমান হতে পারবে না।

পৃথিবীতে সমুদয় বৃক্ষ যদি কলম হয়, এবং এই যে সমুদ্র—এর সঙ্গে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর গুণাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। —কোরাণশরিফ।

(ত) মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট—যে মানুষের কল্যাণ সাধন করে। যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহও তাকে দয়া করে না। —হাদিস।

(থ) পবিত্রতা শিক্ষা করো, প্রশংসার উপযুক্ত হও, মন সর্বদা সৎচিন্তা করুক, বাক্য শুভ বলুক, যাবতীয় দুষ্ট চিন্তা পলায়ণ করুক, যাবতীয় দুষ্ট বাক্য হ্রাস হোক এবং যাবতীয় দুষ্ট কার্য দগ্ধ হোক।

আহুরা-মাজদা জীবজগৎকে অতি সুন্দর, অতি উচ্চ ও উন্নতিশীল এবং অতিশয় মহৎ ক'রে সৃজন করেছেন—যাতে তারা পৃথিবীকে পুরণো হতে না দিয়ে ক্রমেই উন্নতির সোপানে তুলে ধরতে পারে। সেখানে কোনোকিছুকেই তারা মৃত, দুষিত বা পুতিগন্ধময় হতে দেবে না। সবকিছুকে তারা চিরজীবন্ত ও চিরফলভোগী করবে—যেখানে জীবমাত্রের জন্য সেই অমরত্ব আসবে—যার মধ্য দিয়ে পৃথিবী হবে অমৃতময়। —আবেস্তা ঃ পার্শীশাস্ত্র

যদিও শাস্ত্রমাত্রেই ধর্মতত্ত্বকে ঈশ্বরতত্ত্বে আরোপ করা হয়েছে, এবং ধর্মস্থানে সম্বদ্ধ অবস্থায় একমাত্র ঈশ্বরই বসে আছেন, তবু বিজ্ঞানভিত্তিতে ধর্ম হচ্ছে এমন

একটি দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রাণশক্তি—যা শিক্ষা, জ্ঞান ও বোধশক্তির সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে জীবনকে উদ্দীপিত করে। ভিন্ন সূত্রে ধর্মকে বলা যায় মানবদেহের মেরুদণ্ড স্বরূপ। মেরুদণ্ড যেমন সমস্ত দেহভাণ্ডকে মেদ ও মজ্জাসহ একটি শক্তিদণ্ডে ধরে রাখে, তেমনি ধর্ম মানবজীবনকে এক অদৃশ্য সূক্ষ্মদণ্ডে ধরে রাখে—যেখান থেকে তার চেতনা, বুদ্ধি ও জ্ঞান একটি পরম সত্যের আলোকে স্ফুরিত হয়ে ওঠে। এই সত্যই ব্রহ্মসত্য, এই সত্যই মানবসত্য। উপনিষদ তাই বলেছেন ঃ 'স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ', অর্থাৎ হৃদয়মধ্যে যে প্রসিদ্ধ আকাশ, তাতে বিজ্ঞানময়, অমৃতময় ও জ্যোতির্ময় পুরুষ অবস্থিত আছেন। তিনিই ঋত স্বরূপ, অর্থাৎ সত্যস্বরূপ। ধর্মের বোধিক্ষেত্রে তিনি বসে আছেন। তাই নির্দেশ ঃ সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্, ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্, কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্, সত্যং বদ, ধর্মং চর।' অর্থাৎ—'সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়োনা, ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়োনা, সর্বদা কুশল কর্ম করো, সত্য বলো এবং ধর্মে স্থিত হও।' জীবনধারণের পরম চরিতার্থতা এইখানেই, এই ধর্মবোধের মধ্যেই নিহিত।

সুধা-সাগরতীরে

গ্রীষ্মের খরতাপে তাপিত দেহ নিয়ে শ্রান্ত পথিক বৃক্ষছায়ায় এসে বসে ক্লান্তি জুড়োতে। বৈশ্বানরের অগ্নিদাহে ছায়াশীতল বনানীব কী অনন্য করুণা! তেমনি মরুযাত্রীর তৃপ্তি সাগরস্নানে! 'মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে' এসে পৌঁছালেই জীবনের আনন্দ-সহচরের সঙ্গে মিলনের তৃপ্তি। 'অন্তবিহীন পথ' পেরিয়ে তবে এই 'সুধাশ্যামলিম পারে' এসে নির্ভয়ে পা রাখা যায়। এখানে এলে সকল ক্ষয়, সকল ক্ষতি ও সকল ক্লান্তির অবসান। তেম্‌নি অবিদ্যা থেকে বিদ্যায়, অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে, ভয় থেকে অভয়ে, অন্যায় থেকে ন্যায়ে, পাপ থেকে পুণ্যে, বিভেদ থেকে ঐক্যে, ক্ষুদ্রতা থেকে বৃহতে, দুঃখ থেকে সুখে, অহঙ্কার থেকে প্রেমে এবং মৃত্যু থেকে অমৃতেই আনন্দ। মুক্তির দূত হয়ে এই আনন্দ মানব-জীবনকে শান্তিময় করে তোলে। তাতে প্রপঞ্চময়তার পাশমুক্তি ঘটে। উপনিষদের মন্ত্রে তাই বলা হয়েছে—

'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।'

অর্থাৎ—মানুষ কর্ম করতে করতেই ইহলোকে শতবর্ষের আয়ু লাভের প্রয়াসী হয়। ত্যাগবুদ্ধিজাত এই প্রয়াসে মানুষের জীবনে কখনো ফলভোগজাত কর্মলেপ ঘটে না। মনুষ্যজীবনে এছাড়া অন্য পথ নেই।

মানুষের চিরকালের তাই প্রার্থনা—

'অসতো মা সদ্‌গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।'

—'অসত্য হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার হতে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও এবং মৃত্যু হতে আমাকে অমৃতে নিয়ে চলো।'

অন্ধ নিশীথ রাত্রির পরপারে যে ঊষার অরুণদীপ্তি, পৃথিবী চায় সেই দীপ্তি-স্নাত হয়ে পবিত্র হতে। চিরকাল তাই প্রভাত-বন্দনা এমন দীপ্ত ভৈরবীরাগে সমুদগীত হয়ে চলেছে।

উপনিষদের ঋষি বলেছেন—

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্,
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।'...

অর্থাৎ—অজ্ঞানের পরপারে যে মহান্ আদিত্যবর্ণ পুরুষ বিরাজিত, আমি তাঁকে জেনেছি। তাঁকে জেনেই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। অমৃতত্বপ্রাপ্তির এ ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই। এবং 'তমেব বিদিত্বা', 'তুমি' অর্থে তিনিই একমাত্র জ্ঞেয়।

সংসার-মরুভূমির তাপে দগ্ধ হয়ে মানুষ তাই এমন কিছুর আশ্রয় চায়—যাতে তার সমস্ত তাপ, সমস্ত জ্বালা শীতলতার স্পর্শে জুড়োয়। মহাসমুদ্রে জাহাজ নিমজ্জিত হলে মানুষ কিছু-একটা অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। জীবন-পথে চল্‌তে চল্‌তে অকস্মাৎ কখনো বিপদ ঘনিয়ে এলে মানুষ ব্যাকুলচিত্তের কান্না নিয়ে তাঁকেই স্মরণ করে—যিনি পরিত্রাতা। আমরা সুখে যাকে ভুলে থাকি, দুঃখে তাকেই বড় করে গ্রহণ করি অন্তরে। তখন বুঝতে পারি—অহঙ্কারে যাকে একদিন অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রেখেছি, আমার অন্তরের শূন্যতাকে ভরে তুলতে তাকেই প্রয়োজন সব চাইতে বেশী।

এই নয়ন-লোভন পৃথিবী সুন্দর হয়েও তা বিষভাণ্ডে পূর্ণ। মোহে আমরা সেই সুন্দরে আকৃষ্ট হয়ে বিষে জর্জরিত হই। সম্ভোগের মায়ায় তা আমাদের বুদ্ধিতে প্রবেশ করে না; যখন সেই মায়ার আবরণ অপসারিত হয়ে ভোগকে তিক্ত মনে হয়, এবং জ্ঞানোন্মেষ ঘটে, তখন দু'হাতে সেই বিষভাণ্ড ভাগাড়ে নিক্ষেপ ক'রে অমৃতপিয়াসী আমরা চাই সুধা-সাগরতীরে এসে মিলতে। সেই সাগরতীরে বিষের জ্বালা নেই, অগ্নির দাহ নেই, বৈশ্বানরের খরতাপ নেই, মরুভূমির দুঃসহতা নেই, বজ্রের প্রাবল্য নেই, সংসারের আবিলতা নেই, নীচতার দুরভিসন্ধি নেই, দীনতার পীড়া নেই, সেখানে সবই মধুময়, সবই আনন্দময়। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'—আনন্দরূপ অমৃতের উদ্ভাসে সেখানে সবই স্বর্গীয়, শান্তঃ শান্তম্, শিবম্, সুন্দরম্। সেখানে বিষকে জয় ক'রে কেবলই শিব হয়ে ওঠা। অমৃতের প্রত্যাশায় আমরা শিবত্বে উত্তীর্ণ হতে চাই বলেই সুধা-সাগরতীরের সন্ধানে কেবলই খেয়াপাড়ি দিয়ে চলেছি। অনন্ত সাগর পেরিয়ে তবে সেই তীর। সেখানে যিনি বিরাজ করেন, তিনি চিরকালের 'নিত্য', তিনি সমস্ত চেতনার চৈতন্য, সকলের সর্বকাম্যবস্তুর বিধায়ক তিনি; যিনি স্থিতধী প্রাজ্ঞ—তিনি অন্তরে তাঁকে দর্শন ক'রে পার্থিব সকল বিরোধের মধ্যে শান্তি লাভ করেন। উপনিষদ তাই বলেছেন—

'নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা—
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥'

তাঁর উদ্দেশ্যে পুনর্বার বলতে হয়—'তমেব বিদিত্বা'—তিনিই একমাত্র জ্ঞেয়; তিনিই 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ', তিনিই বিপুল বারিধির অকূলে একমাত্র কূল। সেই তীরে নিয়ে তরী ভিড়াতেই আমাদের আপ্রাণ বৈঠা বেয়ে চলা।

ব্যবহারিক জীবনে শাস্ত্রীয় শিক্ষা

আমাদের সংহিতায় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের কথা বলা হয়েছে। তেমনি মনুষ্যজীবনের চারটি স্তরের সন্ধান পাওয়া যায় ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ-সবের ব্যাখ্যা দিতে কার্পণ্য করেন নি, কিন্তু জনসাধারণ এই যাবতীয় বিষয়গুলিকে তাদের বস্তুবাদী জীবনের কর্মপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করতে সমর্থ হয়নি। ফলে ঋষিবাক্য শুধু প্রবচনই থেকে গেছে। তাতে ক্ষতি কার? শাস্ত্রের—না লোকজীবনের? অবশ্যই শাস্ত্রের নয়, কারণ মানব-জীবনের সার্বভৌম কল্যাণের কথাই তাতে নিহিত। সেই কল্যাণের পথ থেকে স'রে আসাটাই মানুষের ক্ষতি। কিন্তু এ ক্ষতি কি মানুষ স্বীকার করে? করে না। সে তার নিজের জীবনচর্যার জন্যে যেমন কতকগুলো উপাদান সংগ্রহ করে, তেমনি চলবার জন্যে তৈরী ক'রে নেয় তার নিজস্ব রুচিগত পথ। এ পথের সঙ্গে শাস্ত্রীয় পথের কোনো মিল নেই। এ পথ রাজকীয় পথ, বৈরাগ্যের পথ নয়। এখানে শুধুই ভোগ, শুধুই আমিত্ব। এই আমিত্ব দিয়েই বস্তুবাদীর জগৎ নানা প্রাচীরে গাঁথা। সে চায় তার গোটা জীবনটাকে ভোগ ও উপভোগের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করতে। তার জন্যে বিন্দুমাত্র ত্যাগস্বীকারেও সে কুণ্ঠিত। তার এই ভোগের জন্যে চাই পৌরুষদীপ্ত ক্ষমতা, ধনপ্রাচুর্য, সামাজিক প্রভুত্ব, সম্পদের অধিকার, সুন্দরী ও মনোরমা ভার্যা, সাংসারিক কর্তৃত্ব ও সম্পত্তির অবারিত প্রসার। সে মনে করে—ধনপ্রাচুর্যই সর্বসুখের আকর; রোগে শান্তি, শোকে শান্তি, মনুষ্যহৃদয়-জয়ের 'ম্যাগ্‌নেট'ই হচ্ছে ধনবল। কিন্তু চিত্ত-সরোবরে বুদ্‌বুদের মতো যে-মনটি ভেসে বেড়াচ্ছে, সে কিন্তু হঠাৎই তরঙ্গবিক্ষেপে মিলিয়ে যায় না, তার কাজই হচ্ছে মানুষের গোটা জীবনটাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখা। অলক্ষ্যে একটি তৃতীয় শক্তির ইচ্ছা তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কখনো 'হাঁ'-কে 'না' করছে, কখনো বা 'না'-কে 'হাঁ' করছে। ফলে দেখা যায়—ধনপ্রাচুর্যশীল সেই পৌরুষদীপ্ত বস্তুবাদীর ভোগের মধ্যে অপমানিতের দুর্ভাগ্যের ছায়াপাত ঘটেছে। সেই দুর্ভাগ্যের ভার বইবার জন্যে পৃথিবীতে তখন আর তার পাশে কেউ অপেক্ষা ক'রে নেই। এ থেকে তখন তার পরিত্রাণ চাই। সে তখন নিজের মধ্যে গুমরে গুমরে বলে ঃ 'হে সকল জীবের ত্রাতা, তুমি আমাকে ত্রাণ করো।' সে তখন বস্তুজগৎ ছেড়ে ভাবজগতের দিকে কাতর দৃষ্টি তুলে ধরে, পরিত্রাণ খোঁজে শাস্ত্রের প্রবচনে আর সংহিতার বাণীতে। সে তখন জানতে চায়—কী ঐশ্বর্য লুকিয়ে আছে ঋষিবাক্যে!

সেখানে জীবনচর্যার প্রথম সূত্রটিই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। এখানে শুদ্ধচিত্তে শুধু গুরুর কাছে অধ্যয়নই নয়, সেই অধ্যয়নের মূল বিদ্যা যে অধ্যাত্মবিদ্যা, সেই বিদ্যায় বিদ্যমানতাই ব্রহ্মে বিচরণ; তাকেই বলে ব্রহ্মচর্য। এ-সময়ে সর্বদিকে নিজেকে

বেধে নিতে হয় ; ছেড়ে দিলেই স্খলন, ব্রহ্মভূমি থেকে একেবারে নিরালম্ব অতলভূমিতে পতন। এই ব্রহ্মচর্য শিক্ষার পরেই গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ। মানুষ তখন গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করছে ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে। সংসার-সমুদ্র-বারি সেখানে লবণাক্ত ঘোলা নয়, পরিশুদ্ধ—ফিলটার্ড্। ব্রহ্মচর্যপালনকারীর কাছে গার্হস্থ্যধর্ম আশ্রমিক ধর্মেরই নামান্তর। কিন্তু যেখানে এর বিপরীত, সেখানেই বিপর্যয় ; সেখানেই সংসারকে মনে হয় কণ্টকসদৃশ, মনে হয় 'ওয়েসিস'হীন মরুভূমি। ব্রহ্মচারীর কাছে এই মরুভূমিই মনোভূমি হয়ে ওঠে, কণ্টককে মনে হয় ক্যামেলিয়া। কেন ? কারণ সে প্রাক্-গার্হস্থ্য জীবনকে সুসংগঠিত ক'রেই তবে সংসারধর্মে মন দিয়েছে। এখানে ভার্যাগ্রহণ, প্রজাসৃষ্টি ও প্রজাপালন, কর্তব্যসম্পাদন এবং যাবতীয় কর্মনিষ্পন্নতা সবই তার অধিগত—ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা সমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই তার আনন্দে কখনো বিষাদের সুর বাজে না। সে অনায়াসে সংসারসমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৌঁছাতে পারে বানপ্রস্থের ঘাটে। বানপ্রস্থ কি ? পরিপূর্ণ বৈরাগ্য, নিজেকে বৈরাগ্যে প্রোথিত ক'রে সংসার থেকে মনকে সরিয়ে আনা। জীবনের এ এক প্রশান্ত অধ্যায়। এই অধ্যায়েরই শেষ সমাপ্তি সন্ন্যাসে। নিজেকে যোগযুক্ত ক'রে জীবনকে সমিধরূপে জীবনেশ্বরের যজ্ঞে আহুতি দেওয়াই পার্থিবজন্মের শেষ সার্থকতা।

এই বোধটা যতক্ষণ না নিজের কাছে পরিষ্কার হচ্ছে, ততক্ষণ চতুর্বর্গের কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না। চতুর্বর্গের প্রথম বর্গ ধর্মই প্রধান। ব্রহ্মচর্যের মতো এই ধর্মই হচ্ছে জীবনের ভিৎ ; এই ভিৎ-এর উপর যে-ব্যক্তি আয়ুর সীমানা দিয়ে পার্থিব জন্মের অট্টালিকা গড়তে পারে, তার কাছে অর্থ এবং কামও ধর্মসিদ্ধ হয়ে ওঠে। সে ধর্মরক্ষার জন্যেই অর্থ বা সম্পদ সংগ্রহ করে এবং কামের ক্ষেত্রেও সে ধর্মকে অতিক্রম ক'রে যায় না। তাতে তার জীবনে যেমন ভারসাম্য রক্ষা পায়, তেমনি এক অনাবিল আনন্দে তার চিত্ত পূর্ণ হয়ে ওঠে। পার্থিবজগতে তখন আর কোনোকিছুতেই অতৃপ্তি থাকে না। এই তৃপ্তিবোধই মানুষকে নিয়ে যায় মোক্ষের পথে। মোক্ষ কি ? সংসার-নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে যোগযুক্ত করাই মোক্ষ। Liberation of the Soul from Matter.

এই জীবনচর্যাই একদিন ভারতবর্ষে ছিল। হৃদয়ের ক্ষেত্রে মানুষ তখন নিজেকে সুখের স্বর্গে সংস্থিত রেখে পার্থিব কর্তব্যগুলিকে সংশোধন ক'রে জীবনবৃক্ষের অমৃত ফল আস্বাদন করেছে। বিষয়ে সেই তৃপ্তি ছিল না, সম্পদে সেই তৃপ্তি ছিল না, পৌরুষের প্রবল প্রতাপে সেই তৃপ্তি ছিল না, প্রভুত্বে সেই তৃপ্তি ছিল না ; সেই তৃপ্তি ছিল এক নির্মোহ অনাবিল বৈরাগ্যে। এ বৈরাগ্য সর্বস্বত্যাগের বৈরাগ্য নয়, এ বৈরাগ্য ত্যাগের অগ্নিশিখায় ভোগের পাত্রকে উষ্ণ ক'রে রাখা। তার জন্যে তার জীবন-শৈশবেই জীবনের প্রাথমিক পাঠ তৈরী হয়ে যেতো, ভিৎ গ'ড়ে উঠতো সেইখানেই। সেই পাঠের প্রথম সূত্র ব্রহ্মচর্য, দ্বিতীয় সূত্র ধর্ম। এই দু'টি সূত্রের আলোকেই তার গোটা জীবনটা আলোকিত হয়ে যেতো। পৃথিবী থেকে বিদায়

নেবার মুহূর্তে সে মুক্তকণ্ঠে ব'লে যেতে পারতো : 'আমার জীবনের পূজা সমাপ্ত, এ পূজায় আমি নিজেকে সানন্দে অঞ্জলি দিতে পেরে ধন্য হলাম।'

আধুনিক পৃথিবীতে ভোগবাদ যখন আকাশ স্পর্শ করেছে, যখন সর্বত্র কেবল ক্ষমতার লড়াই, সম্ভোগের লড়াই, যখন চারদিক থেকে কেবলই চিৎকার শুনি : 'চাই, আরও চাই ; অর্থ চাই, সম্পদ চাই, ক্ষমতা চাই, অট্টালিকা চাই, আওরৎ চাই, যন্ত্র চাই, বন্দুক চাই, যুদ্ধ চাই,' তখন সেই সুরের সঙ্গে আর-একটি হৃদয়বিদারী সুর শুনি : 'নাই, কিছু নাই ; সুখ নাই, শান্তি নাই, নিদ্রা নাই, আনন্দ নাই, জীবন নাই।'— জীবনকেই যদি বোধের মধ্যে ধরা না গেল, তবে এই তীব্র ভোগবাদের এত চাহিদা কি নিয়ে, কাকে নিয়ে ? উন্মত্ততা নিয়ে। মানুষ যেমন নেশায় মত্ত, তেমনি ভোগে উন্মত্ত। কারণ আধুনিক পাঠে সেই অধ্যায়গুলো নেই, নেই সেই ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা, নেই সেই ধর্মের শিক্ষা, নেই বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস ও মোক্ষের বোধ। আজকের মানুষ ভোগের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজতে গিয়ে কেবলই নিজের মধ্যে কঁকিয়ে উঠচে, আর যত কঁকিয়ে উঠচে, ততো তার জেদ বেড়ে যাচ্ছে ভোগের চরমে গিয়ে পৌঁছাতে। একটি মানুষ শুধু মদ খেতে খেতেই প্রাণ হারালো। না রইল তার তৃপ্তিবোধ, না রইল জীবনবোধ ; অথচ জীবনের গভীরেই সে ডুবতে চেয়েছিল। কিন্তু হলো না, কারণ সেভাবে তার জীবনের পাঠ তৈরী হয়নি। Preparation of Self বা আত্মপ্রস্তুতিটা রয়েছে সেই পাঠে। সেই পাঠের অধ্যয়ন যে অর্বাচীনকালে একেবারেই অবলুপ্ত, একথা বলবো না। আমাদের পরিচিত পরিমণ্ডলের মধ্যে এমন মানুষ একেবারেই অজ্ঞাত নয়—যিনি সেই পাঠ থেকে শিক্ষাগ্রহণ ক'রে জীবনকে মানবিক আদর্শে ও মনুষ্যত্বের মহিমায় সার্থক ক'রে তুলেছেন। তিনি কি সংসারকে পাননি, সামাজিক মর্যাদা পাননি, সম্পদ পাননি ? তিনি কি নিষ্কাম পুরুষ ? না ; তাঁর পার্থিব জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতাকে তিনি সত্য, ধর্ম ও ব্রহ্মচর্যের কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে নিয়েছেন। এই যাচাই ক'রে নেওয়াটাই আসল নেওয়া। যেখানে তার অভাব, সেখানেই সম্পদ, সম্মান ও কর্তৃত্ব জীবনকে ভারগ্রস্ত ক'রে তোলে, এবং তার পরিণাম ঘটে বিষাদে। শাস্ত্রের তাই নির্দেশ : 'আত্মানং বিদ্ধিঃ, নিজের ব্রহ্মসত্তাকে জানো', এবং 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা', ত্যাগের পাত্রে ভোগকে গ্রহণ করো। শাস্ত্রীয় চতুর্বর্গ ও চতুরার্য স্তর বিশ্বমানবকে এই শিক্ষাই দিয়েছে।

অভী

আদি ব্রহ্মাবর্ত থেকে অধুনাতন খণ্ডিত ভারতভূমির প্রতিকোষে নানা যুগে নানা মানব-সম্প্রদায় এসে মিলেছে; কেউ এসেছে শাস্ত্র বহন ক'রে, কেউ এসেছে শস্ত্র উঁচিয়ে ধরে। এমনি করেই প্রাচীন ঐতিহাসিক কালের আর্যসমাগম যেমন ঘটেছে, তেমনি এই বৃহত্তর ভূখণ্ডকে আপন অধিকারে আনতে চেয়েছে শক, হুণ, তুর্কি, পাঠান, মোগল, পর্তুগীজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি নানা শক্তি। সিন্ধুসভ্যতা কালক্রমে হিন্দুসভ্যতায় রূপ নিলেও ভারতীয় মানসিকতায় গ্রীকসভ্যতা থেকে শুরু ক'রে দূরাগত বিদেশী জাতিপুঞ্জের সর্বাত্মক প্রভাবে যে মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়, তার দ্বারা এই ভূখণ্ডের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ যেমন উদ্বুদ্ধ হয়, তেমনি বিদেশী জাতিপুঞ্জও এখানকার মানসিকতা ও পরিবেশের সঙ্গে একীভূত হয়ে ওঠে। এইভাবেই এখানে একদা আর্যের সঙ্গে অনার্যের সংমিশ্রণ ঘটেছে, সংসাধন ঘটেছে বাইরের সঙ্গে অন্তর্দেশের। কিন্তু এই সংসাধন ছিল যতটা বহিরাঙ্গিক, ততটা আভ্যন্তরিক নয়। তার প্রধান কারণই বোধ হয় একটি। তা হচ্ছে—বহির্দেশের মতো এই আর্যভূমি বা ভারতবর্ষে কখনো একজাতীয় সংহিতা বা অনুশাসন অক্ষয়লাভ করেনি। মুসলমান বলতে যেমন ইসলাম এবং ইংরেজ বলতে যেমন ক্রিশ্চিয়ানিটি বুঝি, ভারতবর্ষীয় হিন্দু বলতে আমরা এমন বিশেষ কিছু বুঝি না। এখানে সিন্ধু সভ্যতায় একদা যে-আর্যভারত গড়ে ওঠে, এবং কালের বিবর্তনে যে-ভারত আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত, তা নানা সমাজ ও ধর্মবিশ্বাসে বিভক্ত। কিন্তু বিভক্ত হয়েও একটি জাতিসূত্রে ঐক্যবদ্ধ; সেই জাতিসূত্রটি হচ্ছে ভারতীয়তা। এখানে হিন্দু অর্থে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়, একটি জাতিসমষ্টি। তাই এখানকার প্রতিটি অধিবাসীই হিন্দু, ধর্মে তারা নানা-ভাবে বিভক্ত। এই বিভক্তির ক্ষেত্রে বহির্দেশীয় কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের মতো এখানে কোনো বলপ্রয়োগ বা কড়াকড়ি নেই; ধর্মানুসরণ এখানে স্বেচ্ছাধীন। তাই একই হিন্দুসমাজের ভিতের উপর নানা ধর্মীয় শাখা গ'ড়ে উঠতে এখানে কোনোদিন বাধেনি। ভারতবর্ষীয় হিন্দু তাই এক বিরাট বনস্পতির মতো, তার প্রসারিত শাখা-প্রশাখাই হচ্ছে নানা ধর্মমত। ভারতবর্ষীয় মুসলমানও তাই জাতি হিসেবে হিন্দু হয়েও ধর্মমতে ইসলামধর্মী। তেমনি শিখ, মারাঠী, রাজপুত, রাজবংশী, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গানপত্য প্রভৃতি। তারা অনেক-সময় ধর্ম ও সমাজকে একাত্ম মনে করলেও আসলে এক বিরাট বৃক্ষেরই বিভিন্ন শাখা মাত্র। সেই নানা শাখায় সমাচ্ছন্ন যে বনস্পতি, সেই হচ্ছে হিন্দু—যার অন্তরে সিন্ধুর ধারা, মস্তিষ্কে হিমালয়ের প্রসন্ন আশীর্বাদ ও দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক দৃশ্যপট। এখানে নানা ধর্মমতের নানা গ্রন্থ গ্রথিত হলেও তার মূল মন্ত্র হচ্ছে একটি, তা হচ্ছে

'অভী'। অর্থাৎ সর্বকার্যে সর্বাবস্থায় নির্ভয় হওয়া, নির্ভীক হওয়া। এই 'অভী'-মন্ত্রই নির্বিশেষ মানুষের চিত্তে জাগিয়ে তোলে আত্মবিশ্বাস। সে বলে : 'তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত, তুমি চেষ্টা করে দেখ, অগ্রসর হয়ে দেখ—তুমি অসাধ্য সাধন করতে পেরেছ। কারণ পরম স্রষ্টার সঙ্গে তুমি অভিন্ন। তাঁরই বহু বিচিত্র রূপবিভাস এই দৃশ্যমান জগৎ। 'একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা।' এই শিক্ষাই বৈদিক ভারতের শিক্ষা। বেদ বিভেদবিরোধী। তার বাণীই হচ্ছে 'জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ।' তাই জীবমাত্রকে সে শিবজ্ঞানে সেবা করতে শিক্ষা দেয়। কোরাণের মূলগত শিক্ষাও তাই। এখানে Potential Divinity in man-ই হচ্ছে Unity in mankind, আর তার দৃষ্টি হচ্ছে Equal validity of all Religion বা সর্বধর্ম-সমন্বয়ে। যেমন বিভিন্ন শাখা-সমন্বিত এক বনস্পতি। কারণ, যার বোধিতে জীবমাত্রেই শিব, সেখানে কোনো বর্ণের বা সমাজের ভেদ থাকতে পারে না। সেখানে 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু'—সকলকে নিজের মধ্যে দেখা, নিজের করে দেখা। ভারতের এই এতবড় আন্তরদর্শনের দিকটি পৃথিবীর অপর কোনো ধর্মীয় শাস্ত্রে এত উজ্জ্বল ও স্পষ্ট নয়। এই বোধ থেকেই ভারতীয় চিত্তে সঞ্চারিত হয়েছে মাতৃত্বের মমতা। বেদ থেকে বৌদ্ধে এসে তার সুন্দর প্রকাশ লক্ষ্য করি তথাগত বুদ্ধদেবের একটি বাণীতে—

'মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে,
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমানং।'

অর্থাৎ—'মা যেমন তাঁর একমাত্র পুত্রকে স্নেহে-মমতায় নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, তেমনি বিশ্বের সমস্ত প্রাণীতে তোমার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে।'

বুদ্ধদেব সমার্থবাচক আর একটি বাণীতে বলেছেন—

'মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবয়ে অপরিমানং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।'

অর্থাৎ—'ঊর্ধ্বে নিম্নে সর্বদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন, হিংসাহীন ও শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস ও মৈত্রী রক্ষা করবে।'

কোরাণে তেমনি বলা হয়েছে—

'...আল্লাহু মান্ কাতালা নাফ্ছান বে গায়রে নাফ্ছিন আও ফাছাদিন ফিল আর্দে ফাকাআন্নামা কাতালান্নাছা জামিআন্; অ মান আহ্য়্যাহা-ফাকাআন্নামা আহ্য়্যান্নাছা জামিআ।'

অর্থাৎ—'যে ব্যক্তি জীবনের বিনিময়ে অথবা ভূপৃষ্ঠে উৎপাত সৃষ্টির অপরাধ ব্যতীত একজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মনুষ্যসন্তানকে হত্যা করলো, আর যে ব্যক্তি একজন বিপন্নের জীবন রক্ষা করে, সে যেন সমস্ত মনুষ্যসন্তানকে জীবন দান করলো।'

এই তো বিশ্ববোধ, এই তো ভারতবোধ, এই তো মানবিকতাবোধ! সর্বজীবে ও

সর্ববস্তুতে এই অপরিমিত মানস ও মৈত্রীই তো সাম্যবাদের মূলতত্ত্ব। 'Commune' বা 'Community' অর্থে আমরা সাধারণতঃ যে ভৌগোলিক সীমারেখায় পরিবৃত মানবসমাজকে বুঝি, বেদ বা বুদ্ধের বোধ তার মধ্যে ধরা পড়ে না, সেখানে 'উদ্ধং অধো চ সব্বলোকস্মিং', কারণ 'জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" সর্বত্র মৈত্রী ও সাম্যদর্শনই সাম্যবাদ। এই সাম্যবাদই ভারত-মন্ত্রে উচ্চারিত। উপনিষদ তাই বলেছেন—

'যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যাতি,
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।'

অর্থাৎ—'যিনি নিজেকে সর্বভূতে দর্শন করেন, এবং সর্বভূতকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করেন, তিনিই উত্তম মানুষ, তাঁর বিনাশ নেই।'

এই অবিনাশী সত্তা লাভের প্রয়াসই ভারতবর্ষের আত্মিক প্রয়াস। বোধের গভীরে গিয়ে প্রবেশ করেছে বলেই তার কাছে অর্বাচীনকালের বিশ্বসূত্রগুলি যাদু বা চমকের মতো লাগে মাত্র। আধুনিক বিশ্বে যাঁরা সমাজতন্ত্রের নানা সূত্র ও ব্যাখ্যা সৃষ্টি করে ব্যক্তিভাবনাকে সাম্যবাদের স্তরে পৌঁছে দেবার প্রয়াসী, তাঁরা বিজ্ঞানের যান্ত্রিকতাতেই মাত্র বিশ্বাসী, বিজ্ঞানের যে বিশিষ্ট দর্শন, সেই দর্শনকে তাঁরা তাঁদের যান্ত্রিক বুদ্ধির সঙ্গে মেলাতে পারেননি। তাই আধুনিক বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক ফাটলগুলিতে পলাস্তারা এঁটে থাকচে না, উঁচু-নীচুর ভেদ ঘুচে সবাই অভেদ হতে পারছে না। তাই সাম্যবাদ সেখানে লক্ষযোজন দূরে প্রতিবন্ধী শিশুর মতো বহির্দ্বারে বসে অশ্রুবিসর্জন করছে। বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে দর্শন ও নৈয়ায়িক বুদ্ধির সংযুক্তি না ঘটলে আত্মবুদ্ধি বা অহংই প্রবল হয়ে দাঁড়ায়, আর যেখানে এই অহংয়ের প্রাবল্য—সেখানে একই যন্ত্রের চাকায় ঘুরেও একজন আর-একজন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। তার জন্যে প্রয়োজন সেই মন্ত্রগ্রহণ—যেখানে বলা হয়েছে ঃ 'সমানো মন্ত্রঃ—সমিতি সমানি', প্রয়োজন বুদ্ধের সেই অপরিমিত মানসবোধ, প্রয়োজন Potential Divinity in man-এর অনুভূতি, কারণ ভারতবোধে জীবমাত্রেই শিব। জীবমাত্রকে তাই শিবে মেলাতে হবে, বিশ্ববোধেও তাই, দেশবোধেও তাই। সেখানে তোমার জন্যে আমার জন্যে ভিন্ন ব্যবস্থা নয়, অভিন্ন একাত্মতাই সমাজতন্ত্রকে রূপময় ক'রে তুলতে পারে, পারে সমাজমানসকে সাম্যবাদে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে। সেই যে একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা—তাঁকে সকলের বোধের মধ্যে প্রতিফলিত ক'রে সকলের সুখ-দুঃখকে নিজের ক'রে নিতে হবে, মমতার সঙ্গে স্পর্শ করতে হবে সকলের প্রয়োজনকে, সকলের ক্ষুধাকে ; তবেই উৎপন্ন ফসলের সমবণ্টন ও সমানাধিকারকে কেন্দ্র ক'রে মানুষ এমন কিছু মহৎ পাওয়া পেয়ে যাবে, যাতে সে ক্রমেই 'অভী' হয়ে উঠতে পারে, পারে নির্ভয় হতে। মানুষের মনে সেই অদ্বৈত বিশ্বাস যত বেশী জাগ্রত হবে, ততই তার মুক্তি, ততই তার সাম্যবাদে গতি।

প্রকৃতি, মানুষ ও অতিমানুষ

পৃথিবীতে মৃত্তিকার অংশ যত সম্প্রসারিত হয়েছে, মানবসমাজের বসতিও ততই ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে প্রাণী হিসেবে মানুষই কি একমাত্র জীব? তা নয়। মানুষের জন্মেরও বহু পূর্বে উদ্ভিজ্জশ্রেণীর সৃষ্টি, তারপর আছে সরীসৃপ ও পশুসমাজ। কীট-পতঙ্গ ও পক্ষীসমাজও বিশেষভাবেই গণনীয়। মানুষের জন্মের পূর্ব থেকেই মানুষের আহার্য পৃথিবীতে প্রস্তুত হয়ে ছিল। মানুষ কেবল তার পর্যায়ক্রমিক উন্নতির ধাপে ধাপে নানা অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে সেই আহার্যকে আবিষ্কার ক'রে ক্রমে সভ্যতার বিকাশের পথে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু মানুষ সভ্য হয়ে উঠেছে অর্থে সে তার মৌলিক বৃত্তিগুলির যে বিলোপসাধন করেছে, তা নয়। বরং ধাপে ধাপে সে যত উন্নতির পথে এগিয়েছে, তত সে তার প্রাকৃতিক পরিবেশকে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করেছে। জলজাত পদার্থ, উদ্ভিদজাত পদার্থ, এবং পশু-পক্ষীজাত প্রাণী—কোনো কিছুই তার ভোগ্যবস্তু থেকে বাদ যায়নি। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়—সৃষ্টির একটা বিশেষ পর্যায়ে এসে পৃথিবীর এই মাটিতে একই সময়ে এই সমুদয় প্রাণীর অবস্থিতি এবং ধ্বংস ও উন্নতি সমভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে চলেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয় মানুষকে। কিন্তু তার এই শ্রেষ্ঠতা প্রকৃতি-নিরপেক্ষ নয়। বরং প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়েই তাকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হয়েছে। যে ভূমিতে তার জন্ম, সেই ভূমি খনন ক'রে তাকে যেমন নানা আবিষ্কারের পথে এগোতে হয়েছে, তেমনি সেই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে তাকে নানা গঠনমূলক কাজেও মাথা খাটাতে হয়েছে; তেমনি যে জল তার জীবন, সেই জলধারাকেও তাকে নানা বৈজ্ঞানিক প্রকরণে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়েছে। অন্যদিকে বন-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ দিনে দিনে মিতালী পাতিয়েছে; একদিকে যেমন উদ্ভিজ্জশ্রেণী তার হাতে ধ্বংস পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বনমহোৎসবের আয়োজন ক'রে সে বৃক্ষবন্দনায় মুখর হয়ে উঠেছে। তেমনি গবাদি-পশু প্রভৃতি শুধু তার কৃষিকর্ম বা শকট চালনেই মাত্র সহায়ক হয়নি, একই সঙ্গে নিজের দেহ এবং দেহজাত দুগ্ধের দ্বারা মানুষের দেহগঠনে ও প্রয়োজন-সাধনে পূর্ণমাত্রায় সাহায্য করেছে। জলজাত মৎস্যশ্রেণী ও নভোচারি পক্ষীসমাজও তেমনি মানুষের প্রীত্যর্থে নিজেদেরকে অজস্রভাবে দান করেছে। অর্থাৎ এই যে সমুদ্র ও নদীবিধৌত ভূ-প্রকৃতি—তার কোলে আশ্রয় নিয়ে প্রতিটি শ্রেণীর প্রাণীই আপন আপন সমাজে যেমন কৌলিন্য রক্ষা ক'রে চলেছে, তেমনি পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতাতেও ত্যাগের গৌরব তার কম নয়। প্রধানতঃই এ গৌরবের সুযোগ গ্রহণ করেছে মানুষ। কারণ সৃষ্টিজগতে বিধাতা তাকে দিয়ে তাঁর আপন লীলা পরিসমাপ্ত করতে চেয়েছেন।

কিন্তু শরীরের একটি অঙ্গে ব্যাধির প্রকোপ ঘটলে গোটা দেহটাই যেমন অচল হয়ে পড়ে, তেম্‌নি সৃষ্টিক্ষেত্রে কোথাও কোনো দুর্যোগ ঘটলে বিশেষ একশ্রেণীই মাত্র আক্রান্ত হয় না, আক্রান্ত হয় পুরো জীবসমাজই। এবং যেহেতু সৃষ্টিধর্মে এই জীবসমাজের উচ্চকুলে অধিষ্ঠিত রয়েছে মানুষ, সেই হেতু যে-কোনোরকম দুর্যোগের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হয়েছে মানুষকেই। সে জানে—তার একার বাঁচাটাই বাঁচা নয়, তার পূর্ণাঙ্গ জীবন নির্ভর করছে প্রকৃতিজাত সর্বশ্রেণীর প্রাণীসমাজের পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তার উপর। সেই প্রাকৃতিক নিরাপত্তাকে সাথক ক'রে তুলতে পারে তার সমূহ চেতনা, তার বুদ্ধিবৃত্তি, তার বিবেক ও শক্তি। কারণ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব সে, তার ধর্মই হচ্ছে সামগ্রিকতাকে রক্ষা ক'রে সৃষ্টিকে রক্ষা করা।

কিন্তু সৃষ্টির বুকের মধ্যেই এমন বিদ্রোহ আছে যে, মাঝে মাঝে সে আত্মপ্রকাশ না ক'রে সৃষ্টিকে সচেতন রাখতে পারে না। তারই ফলে কখনো ভূমিকম্প হয়, কখনো আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে, কখনো ঝড়-ঝঞ্ঝা ও সাইক্লোন ভেঙে পড়ে, তার সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে চলে প্রবাহসঙ্কুল বান ও বন্যা ; কখনো পাহাড়ে নামে ধ্বস, কখনো বা অতিরিক্তমাত্রায় বিদ্যুৎস্ফূরণ বা বজ্রপাত ঘটে। বিজ্ঞানীরা এসব ঘটনার যে-কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই দিন না কেন, এবং এই ঘটনাবলীকে যতই তাঁরা নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করুন না কেন, তবু এসব ঘটনা প্রকৃতির নানা আবর্তনে-বিবর্তনে সংঘটিত হওয়া থেকে বিরত নেই। প্রকৃতির চরিত্রের মধ্যেই তার নিজের একটি ধ্বংসের দিক হচ্ছে এই সব সংঘটন। বুঝি-বা অন্যদিকে সংগঠনের উদ্যোগটিও একেবারে উহ্য নেই। কিন্তু তার এই ধ্বংসলীলার অর্থ কি প্রাণীসমাজেরই ধ্বংস বা ক্ষতি নয় ? পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত ভূমিকম্পে, সাইক্লোনে, বন্যায়, পার্বত্য-ধ্বসে ও বজ্রপাতে যত প্রাণী ধ্বংস হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বাসভূমি ও শস্যক্ষেত্রের ক্ষতি হ'য়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও আমাদের হিসেবের বাইরে। বলবো না যে, প্রকৃতির এই আপন ধ্বংসাত্মক চরিত্রটি একান্তই তদ্‌গত ; মানুষও তার জন্যে কিয়দংশে দায়ী। প্রকৃতির কাছ থেকে সে তার আপন স্বার্থে যতখানি সুবিধে আদায় করতে চেয়েছে, সেই মুহূর্তে প্রতিশোধেরও কিছু একটা জটিল ইকুয়েশন ক'ষে নিয়েছে প্রকৃতি। ফলে কত রাজ্য-সাম্রাজ্য ডুবেছে, কত জাহাজ তলিয়ে গেছে মহাসমুদ্রের অতলে, কত এরোপ্লেন ভেঙে পড়েছে ভূতলে। সেই সঙ্গে এসেছে মহামারী ও মড়ক, ছড়িয়ে পড়েছে নানা ব্যাধি। কত মরুভূমি রূপান্তরিত হয়েছে সমুদ্রে, কত জলাশয় শুকিয়ে হয়েছে মরুভূমি !

কিন্তু তার মধ্যে সৃষ্টির কাজও অব্যাহতভাবেই চলেছে। এগিয়ে চলেছে মানুষ। দুর্জয় শক্তিতে বারবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে সে। প্রকৃতি যত বিদ্রোহী হয়েছে, ততো তাকে নিজের আয়ত্তে আনতে জীবন-পণ করেছে মানুষ। কারণ জীব হিসেবে পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র বুদ্ধির অধিকারী। সেই বুদ্ধিপ্রবণতাকে সে নানাভাবে খাটিয়েছে প্রকৃতির ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে নানা সংগঠনে। এক্ষেত্রে

সে তার আপন কীর্তিকেও ছাড়িয়ে উঠেছে। মানব-সত্যের বিজয়কেতন উড়েছে সর্বকালে সর্বদিকে। সে পর্বত জয় করেছে, সমুদ্র শাসন করেছে, অভিযান করেছে চন্দ্রে, অগ্নিকে এনেছে আপন আয়ত্তে, পীড়াকে বেঁধেছে ভেষজে। যত সে ডুবেছে, ততো সে ভেসেছে, আর যত সে মরেছে, ততই সে বার বার বেঁচে উঠেছে। এই বাঁচা তার একক বাঁচা নয়, সামুহিক বাঁচা। যে-কালে যে-পরিবেশে সে জীবনধারণ করেছে, সেই কালে ও সেই পরিবেশে তার সহাবস্থিত অন্যান্য প্রাণি-কুলেরও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নিতে হয়েছে তাকে। এখানে ভূচর, জলচর ও নভোচর-জাত সর্ববিধ বিষয়ও এই প্রাণীকুলেরই অংগীভূত। কারণ কোনো কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এককভাবে জীবনধারণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সে প্রতিমুহূর্তের জন্যেই প্রকৃতিনির্ভর; তাই প্রকৃতির সর্বব্যাপী প্রাণপ্রবাহকে বাঁচিয়ে রাখাই তার প্রাণের ধর্ম। এই ধর্ম-যুদ্ধে যত সে হেরেছে, ততোধিক সে জয়ী হয়েছে। এই জয়ের ইতিহাসই চিরকালের অগ্রগামী মানবযাত্রীর ইতিহাস।

কিন্তু যে-মানুষ প্রকৃতির অধীনে থেকে অথচ প্রকৃতিকে জয় ক'রে ভূমিক্ষেত্রে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করলো, সেখানে ছিল তার আপন স্বার্থে দুঃসাহসিকতার পরিচয়। তখনো সে সর্বাঙ্গীন মানবিক গুণের অধিকারী হয়নি। অধিকারী হ লো সেদিন—যেদিন তার সকল দুঃসাহসিকতা মানসিক ও দৈহিক শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে তার মধ্যে র্যাশেনালিটিতে এসে যুক্ত হলো। প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে এখানে এনিম্যালিটিকে জয় ক'রে র্যাশেনালিটি বা গুণবাচক মানবিক বৃত্তিতে উত্তীর্ণ হবার যে শক্তির পরিচয়, সেইটেই মানুষের আসল পরিচয়। সেই শক্তি যেমন ষড়-রিপুকে বশে এনে তার মধ্যে সুকুমার বৃত্তির স্ফুরণ ঘটালো, তেমনি এই সুকুমার বৃত্তিকে আশ্রয় ক'রেই সেই শক্তি মানুষকে নানা দিকে নানা কাজে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিল। পৃথিবীর এই বিরাট ভূমিক্ষেত্রে মানুষের শুধু একচ্ছত্র অভ্যুত্থানই ঘটলো না, সেইসঙ্গে তার বুদ্ধিবৃত্তি (talent with ethical sense) ও নানা উদ্ভাবনী শক্তির (Power of creativity) বিকাশে নানা দিকে নানা প্রয়োজনের উপাদান গ'ড়ে উঠলো। সমাজ-বিকাশের মূলে রয়েছে মানুষের র্যাশেনালিটিজাত এই উদ্ভাবনী শক্তি। তার কৃষিকর্ম ও শিল্পকর্ম থেকে শুরু ক'রে বিদ্যাচর্চার যাবতীয় দর্শন ও বিজ্ঞান এই শক্তির উপরেই ভিত্তিশীল। কিন্তু সময়ের অগ্রগামিতার সংগে সংগে তার জ্ঞানের ক্ষেত্র কিন্তু তার সীমিত কৃষিক্ষেত্র ও শিল্পক্ষেত্রেই আবদ্ধ রইল না, এই বস্তুজগতের মতো মানুষের একটি মনোজগতেরও সন্ধান পাওয়া গেল—যার পরিধি কোনো সীমানার বন্ধন মানলো না। মানুষের জীবনের একটা অংশ যদি এই বস্তুজগতের সংগে যুক্ত রইল তো তার দ্বিতীয় অংশটি ছড়িয়ে পড়লো সেই পরিব্যাপ্ত মনোজগতের অসীমে। জীবনের সেই ব্যাপ্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই পংক্তিটি স্মরণীয়—

'জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে,

তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে,
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।'

ভূমিক্ষেত্রের নিত্যপ্রয়োজনীয় জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র ক'রে মানুষ পৌঁছালো দেশ-কালের অতীত মহাবিশ্বলোকে—যেখানে ভাবের সঙ্গে ভাব যুক্ত হয়ে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধন দৃঢ় হয়ে জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ বেড়ে গেল। এই জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগই মানুষের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগ। প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে সে যেমন প্রকৃতিকেই শুধু জয় করলো না, জয় করলো প্রবৃত্তিকেও, তেম্‌নি তার এই বিজয়ী মানসিকতা ক্রমে জয় করতে উদ্যত হলো অন্তরীক্ষকেও। কারণ অন্তরে সে আহ্বান পেয়েছে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর, নক্ষত্রলোকের নিমন্ত্রণ পেয়েছে সে আলোকের অক্ষরে। নিজের মধ্যে তখন সে সঙ্গীত হয়ে বেজে উঠেছে। বৃক্ষ যেমন নিজেকে ছাড়িয়ে ওঠে তার পুষ্পে, তেম্‌নি মানুষ দিনে দিনে নিজেকে ছাড়িয়ে উঠেছে তার আপন কীর্তিতে। দস্যু রত্নাকর রূপান্তরিত হয়েছে বাল্মীকিতে। তার কণ্ঠে তখন মহাকাব্যের শ্লোক।

একথা বলবো না যে, সর্ববিজয়ী হ'য়েও মানুষ দুঃখ থেকে, শোক থেকে ত্রাণ পেয়েছে, কিন্তু সেই দুঃখ ও শোক তার মধ্যে সৃজন করেছে অগ্নি—যার তেজে সে দুঃখ ও শোককে এক মরমী সহনশীলতায় নিজের ব্যক্তিত্বের প্রসাদগুণের সঙ্গে যুক্ত ক'রে আপন অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রেখেছে। তার গৌরবের যোগফলকে সে এগিয়ে ধরেছে ভাবীকালের উদ্দেশ্যে—যে-কালের নব-প্রজন্মের সঙ্গে তার আদৌ যোগ নেই। পাশ্চাত্যের কবি Ella Wheeler Wilcox তাই বলেছেন—

'You were, and you will be ; know this while you are ;
Your spirit has travelled both long and after.
It comes from the source to the source it returns ;
The spark that was lighted, eternally burns.'

রবীন্দ্রনাথ বললেন: 'মানুষের মাহাত্ম্য প্রভাতের সূর্যের মতো। দিগন্ত তার সম্মুখে বহু দূরে, আলোর মতো সে দূরে প্রসারিত। মানুষের জীবনযাত্রা বর্তমান জীবনকে অতিক্রম ক'রে চলে, তার সঞ্চয় অজানা অধিকারীদের জন্যে। মানুষের মধ্যে যাঁরা মহত্তম, তাঁরা বাস করেন অনাগত কালে, তাঁরা প্রস্তুত করেন ভাবী যুগের আশ্রয়। বলবো না যে তাঁদের জীবন দুঃখ থেকে মুক্ত। দুঃখ তাঁদের জীবনে সৃষ্টির অগ্নি ; তাই নিয়ে চিরজীবনের সম্পদ মানুষের জন্যে তাঁরা রচনা করেন, যেমন গাছ করে আপন অন্তরে সূর্যের তাপ সঞ্চয় ; সূর্যালোককে মজ্জাগত ক'রে ফলে ফুলে নিজেকে বিকশিত করাই তার তপস্যা। মানুষের সংসারে দুঃখ আছে, তার এই তাপের প্রয়োজন আপনার জগৎ নির্মাণের জন্যে, আপনার মধ্যে আপনাকে পরিণতি দেওয়ার জন্যে। মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁরা সেই দুঃখকে তেজ রূপে মর্মের মধ্যে সঞ্চিত ক'রে জীবনকে শস্যসম্পদে ফলবান করেন, সেই সম্পদ দান করেন এমন সকল মানুষকে, যারা তাঁদের জানাও না, এখনও যারা আসেনি।'

প্রতিদিনের বস্তুসংঘাতে জর্জরিত জীবনের ঊর্ধ্বে যখন এই মহত্তম জীবন মনুষ্যত্বের মহিমায় উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, তখনই মানুষের বোধিলাভ হয়। প্রীতির দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা এই বোধিকে সে আলোর মতো বিকীর্ণ ক'রে দেয় প্রাণীজগতে। জ্ঞানের পথে, সাধনার পথে সে তখন নিজের মধ্যে আয়ত্ত করে সেই দুর্লভ শক্তি—যে শক্তির গতিবেগে গ্রহ-নক্ষত্র অবিরাম ছুটে চলেছে মহাশূন্যে। তাকে আপন আত্মার মধ্যে উপলব্ধি ক'রে আত্মস্থ হয় মানুষ। ক্রমে উত্তীর্ণ হয় সে অতিমানুষে, মহামানবে। ইতিহাসের এক-একটা পর্যায়ে তাই পৃথিবীতে এক-একটি মানুষ কখনো হয়ে ওঠেন বুদ্ধ, কখনো যীশু, কখনো শঙ্কর, কখনো চৈতন্য, কখনো-বা রামকৃষ্ণ। তাঁদের কণ্ঠনিঃসৃত বাণী তো তাঁদের জীবনবেদ বা চৈতন্যসত্তারই অভিব্যক্তি! সেই তো Life Divine ! এই অতিমানুষে উত্তীর্ণ হয়ে সেই মহা-জীবন তখন সকল মানুষের সকল প্রাণীকুলের মুক্তির পথ রচনা ক'রে দিয়ে যায়। বিশ্বপ্রকৃতির উপর সূর্যালোক পতিত হ'যে যেমন সমস্তকিছুকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দেয়, তেমনি মানুষ অতিমানুষে উত্তীর্ণ হ'য়ে মহনীয়তার ও শ্রেয়তার মহিমালোকে মানব-সংসারকে ভাস্বর ক'রে তোলে। মানুষের জীবনে এই অভ্যুদয়ই মানব-অভ্যুদয়। নিজের মধ্যে ক্রমাগতই হয়ে উঠতে উঠতে সে একদিন ঋষি হ'য়ে ওঠে। তখন সে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব চায় না, সমাজের উপর কর্তৃত্ব চায় না, তখন সে প্রতিষ্ঠা চায় সেই লোকে—যে লোক ধ্যানলোক, দেবলোক, আনন্দলোক। তখন তার কাছে কোনো কিছুতেই ভেদ থাকে না, সবই অভেদ ; তখন বাউলের কণ্ঠে সে গেয়ে ওঠে—

একই বেদের রূপ প্রকাশে বেদ-অবেদে।
যা দেখি সব একই দেখি ভেদ-অভেদে।
একই মানুষ, একই মন্ত্র,
কি বেদান্ত, কি বা তন্ত্র,
এক দেহ কি ভাগ করা যায় মজ্জা-মেদে ?
এই যে আকাশ, বাতাস হু-হু,
শ্বাস বহে যে মুহুর্মুহু,
সব জীবেরই জীবন-খেলা হেসে-কেঁদে।
সবার মাঝে আছেন যিনি,
সবই করেন, করান তিনি,
লোকাচারের আচার শুধু মনকে বেঁধে।
যা দেখি সব একই দেখি ভেদ-অভেদে।

তখন সকল চিন্তার সকল অশান্ত ধারা যেমন একই আত্মার মহাবিন্দুতে এসে শান্ত হয়, আর আপন বেগবতী সাধনায় নদী যেমন উত্তীর্ণ হয় মহাসমুদ্রে, তেমনি মানুষ ক্রমাগতই নিজের মধ্যে হ'য়ে উঠতে উঠতে উত্তীর্ণ হয় অতিমানুষে। এই উত্তীর্ণ হওয়াই মানবজীবনের পরম সার্থকতা।

প্রার্থনার রূপ

এই বিশ্বপ্রকৃতি যেন নানা স্তবের সমাহারে ঈশ্বরের নিকট একটি মূর্ত প্রার্থনারূপে সংস্থিত। কারণ জগতের স্থাবর জঙ্গম যা কিছু, সবই তাঁর দ্বারা আচ্ছাদিত ঃ 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'। সুতরাং জগতের যাকিছু উপাসনা, প্রার্থনা- সব কিছুর মূলে জাগ্রত রয়েছেন সেই চিরউপাস্য ঈশ্বর, সেই চিরপ্রার্থিত ব্রহ্ম। তিনি শুধু এই বিশ্ব-প্রকৃতির নন্, তিনি ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোকের নিয়ন্তা। গায়ত্রী মন্ত্রে তাই বলা হয়েছে—'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ'।—'যিনি আমাদের ধীশক্তিকে নিয়ত প্রেরণ করছেন, সেই ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোকের অধিদেবতার বরণীয় শক্তিকে ধ্যান করি'।

প্রার্থনার প্রাথমিক পর্যায়ে রযেছে এই ধ্যান, মন্ত্র, স্তব ও উপাসনা। এই সীমিত ক্ষুদ্র-প্রাণের আবেদনকে সেই অনন্ত প্রাণে পেঁছে দিতেই এই ধ্যান, এই উপাসনা। কারণ—'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্,'—বিশ্বে এই যাকিছু চলছে, সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হ'য়ে প্রাণেই স্পন্দিত হচ্ছে।' তাই অনন্তপ্রাণ যেমন চিরকাল এই ক্ষুদ্র-প্রাণকে তাঁর দিকে টানছেন, তেমনি এই ক্ষুদ্র-প্রাণও চিরকাল সেই অনন্ত প্রাণের স্তবে একাগ্র হ'য়ে বলছে ঃ তুমি আমাকে তোমার মধ্যে পূর্ণ ক'রে নাও, তবেই আমার মুক্তি'।

পৃথিবীর অগ্নি ও জলবিন্দু থেকে শুরু ক'রে প্রতিটি শস্যকণা, ফুল, তৃণ, লতা, বিটপী ও গুল্মের এই ধ্যান, প্রতিটি মানুষের এই উপাসনা, এই প্রার্থনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়—আপনাকে দান করবার উপাসনা। দিনে দিনে ভক্তি দ্বারা, ক্ষমা দ্বারা, সন্তোষের দ্বারা, সেবার দ্বারা, তাঁর মধ্যে নিজেকে মঙ্গলে ও প্রেমে বাধাহীনরূপে ব্যাপ্ত ক'রে দেওয়াই তাঁর উপাসনা।' সেই দেবতাকেই বার বার নমস্কার ক'রে উপনিষৎ বলেছেন—

'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥'

নদীর দুই পারের দুই ভূমিখণ্ডকে যেমন সংযুক্ত ক'রে দিচ্ছে সেতু, তেমনি ঈশ্বরের ইচ্ছা ও মানুষের ইচ্ছার মধ্যে সেতু হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে প্রার্থনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একে বলা হয়েছে 'দৌত্যসাধন'।—'ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মাঝখানে দৌত্যসাধন করে প্রার্থনা। দুই ইচ্ছার মাঝখানে, যে বিচ্ছেদ আছে, সেই বিচ্ছেদের উপরে ব্যাকুলবেশে দাঁড়িয়ে আছে এই প্রার্থনাদুতী। এইজন্যে অসাধারণ সাহসের সঙ্গে বৈষ্ণব বলেছেন যে, জগতের বিচিত্র সৌন্দর্যে ভগবানের বাঁশীর যে নানা সুর বেজে উঠেছে, সে কেবল আমাদের জন্যে তাঁর প্রার্থনা—

আমাদের হৃদয়কে তিনি এই অনির্বচনীয় সঙ্গীতে ডাক দিয়ে যাচ্ছেন, সেই জন্যেই তো সৌন্দর্যসঙ্গীত আমাদের হৃদয়ের বিরহ-বেদনাকে জাগিয়ে তোলে।'

আমাদের মন তখন হ্লাদিনী রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুরে উতলা হ'য়ে ওঠে। তখন শঙ্করাচার্যের হরিস্তোত্রের শ্লোক উচ্চারণ ক'রে এই রাধা-গত মন ব'লে ওঠে—

'সর্বজ্ঞো যো যশ্চ হি সর্বঃ সকলো যো,
যশ্চানন্দোঽনন্তগুণো যে গুণোধামা।
যশ্চাব্যক্তো ব্যস্তসমস্তং সদসদ্ য
স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥'

অর্থাৎ—যিনি সর্বজ্ঞ, সমস্ত অথচ 'সকল'. আনন্দময়, অনন্তগুণসম্পন্ন, গুণাধার, যিনি অব্যক্ত, সর্বব্যাপী. সৎ ও অসৎ, আমি সেই সংসারতমোনাশী হরিকে স্তব করি।

এখানেও তাঁব কাছে কিছু যাচ্ঞা করা হচেছ না, শুধু তাঁর অনন্ত মহিমাকেই স্তব করা হচ্ছে। তেমনি ঈশ্বরও ভক্তকে আশ্বাস দিয়েছেন—

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে,
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।'

অর্থাৎ—সব ছেড়ে তাঁর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল হ'য়ে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রার্থনা হিসেবে তাঁকে পাওয়া।

আকাঙ্ক্ষিতই হোক আর অনাকাঙ্ক্ষিতই হোক্, জীবনকে যদি একটি পরম 'প্রার্থনা' ক'রে তোলা না যায়, তবে পরম প্রার্থিতকে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' তেমনি একটি পরম প্রার্থনা, 'নৈবেদ্য' আর একটি। রাজার ভিক্ষা পেতে হলে দাসের মতো স্কন্ধে ঝোলা চাই, পিতার আশীর্বাদ পেতে হলে চাই সন্তানের শ্রদ্ধা। ব্রহ্ম যে রাজাধিরাজ, তিনি যে পিতা, পিতার পিতা। উপনিষৎ বলেছেনঃ 'পিতা নোঽসি'—পিতা তুমি আছো। ব্রহ্ম সেই পিতা, সেই রাজাধিরাজ। তাঁবই উদ্দেশ্যে কবির প্রার্থনা জাগ্রত হ'য়ে উঠেছে—

'তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
...ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।'

স্বাধীনতা-হীনতায় যে জীবন, ঘৃণ্য তার প্রাত্যহিক বোধ-চর্যা। আমাদের প্রতিদিনের জীবনচর্যায় যেখানে শুধু অঙ্কুশাঘাত, শুধু পদলেহিতা, তা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তবেই তো ব্রহ্মস্বাদ গ্রহণ। প্রাত্যহিক এই জীবনযুদ্ধে আমরা কেবল মৃত-

সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে চলেছি। তা থেকে মুক্তি পেতেই যে উন্মুখচিত্তে বার বার উচ্চারণ করি—

'দাও হস্তে তুলি
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু।'...

একলব্যের মতো একান্ত 'প্রার্থনা' হ'যে নিজেকে সেই অসীমের উদ্দেশ্যে উত্তোলিত ক'রে না তোলা পর্যন্ত নিজের সংশয়, দ্বিধা ও ভয় থেকে মুক্তি নেই। আমরা যে সদা-ভয়ে ভীত, সদা-সংশয়ে শঙ্কিত, সহস্র দ্বিধার নিগড়ে আবদ্ধ। প্রতিমুহূর্তে এখানে সীমিত 'ক্ষুদ্র-আমি'র ব্যর্থতার হাহাকার। মনে দুর্বলতা, মুখে মিথ্যা আর চিন্তায় আবিলতা—এই নিয়ে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের রথচক্র অবিশ্রাম গতিতে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলেছে। অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখি না—আগামীকালের জন্যে আমরা কী বহন ক'রে নিয়ে চলেছি! নিজেকে নিয়ে প্রতিমুহূর্তের নিষেধের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে ভবিতব্যের পথে পোঁছে তখন কবির ভাষায় বলি—

'ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।'

প্রার্থনার মধ্যে প্রধানতঃ যে একটি স্বার্থ সর্বদাই ক্রিয়াশীল, তাতে সন্দেহ নেই। আকাঙ্ক্ষা অনাকাঙ্ক্ষার মধ্যে আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সেই স্বার্থকে যত স্পষ্ট ক'রে দেখা যায়, অনাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তত স্পষ্ট ক'রে দেখা না গেলেও সূক্ষ্মভাবে স্বার্থ একটা থেকেই যায়। সেটা নৈর্ব্যক্তিক স্বার্থ, ব্যক্তিস্বার্থ নয়। যেখানে অপরের কল্যাণ-প্রার্থনা বা দেশ ও জাতির জন্যে কল্যাণ-প্রার্থনা, সেখানে সেই প্রার্থনা ব্যক্তির অনাকাঙ্ক্ষাগত নৈর্ব্যক্তিক প্রার্থনা। যেমন—

'যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।'

আবার ব্যক্তিস্বার্থ হয়েও নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মবাদী প্রার্থনার পরিচয় পাই—যখন ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে—

'হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।'

অর্থাৎ—হে পূষণ, হে জগৎ-পোষক সূর্য, তোমার যে জ্যোতির্ময় পাত্র দ্বারা সত্যস্বরূপ মহান্ পুরুষের মুখ আবৃত ক'রে রেখেছ, তা উন্মোচন ক'রে সত্যসন্ধী আমাকে সেই মহান্ পুরুষকে দেখতে দাও।

তেমনি আবার কঠোপনিষদে যমের কাছে নচিকেতা আত্মতত্ত্ব জানতে চেয়ে তৃতীয় বর-প্রার্থনায় বলেছেন—

'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়।'

অর্থাৎ—কেউ বলে মৃত্যুর পর আত্মা থাকে না, কেউ বলে থাকে। আত্মা সম্বন্ধে লোকের মনে এই যে দ্বন্দ্বমূলক সন্দেহ বিদ্যমান, আপনার উপদেশে সেই তত্ত্ব—সেই আত্মতত্ত্ব আমি সম্যক অবগত হতে চাই।

ব্যক্তিস্বার্থ হয়েও এ প্রার্থনা বস্তু, বিষয় ও সম্পদ-নিরপেক্ষ আত্মিক-উৎকর্ষগত প্রার্থনা। এখানে অনন্ত ব্রহ্মের কাছে মানসিক বল, দৈহিক বল ও আত্মার বিকাশ কামনা করা হচ্ছে, যেমন উপনিষদে বলা হয়েছে—

'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়,
আবিরাবীর্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম।'

অর্থাৎ—অসত্য হতে তুমি আমাকে সত্যেতে নিয়ে যাও, অন্ধকার হ'তে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও, মৃত্যু হতে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও। হে আবি, হে প্রকাশ, তুমি আমার নিকট প্রকাশিত হও; হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে নিত্য রক্ষা করো।

তেমনি আবার বাজসনেয় সংহিতায় প্রার্থনা করা হয়েছে—

'তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি।
সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি।'

অর্থাৎ— 'তেজ তুমি, তেজ দাও; বীর্য তুমি, কর বীর্যবান।
ওজঃ তুমি, ওজঃ দাও; বল তুমি, কর বলীয়ান।
অন্যায় সহ না তুমি, অন্যায়-বিদ্রোহী কর মোরে।
সহ-রূপী! শক্তি দাও দুঃখ-কষ্ট সব সহিবারে।'

এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি স্মরণ করতে পারি—'উপাসনাকে কেবল

হৃদয়ের ধন করবো না, চরিত্রের সম্বল করবো ; তার দ্বারা কেবল স্নিগ্ধতা লাভ করবো না, প্রতিষ্ঠা লাভ করবো।'

কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থগত প্রার্থনার পরিচয়ও আমাদের ধর্মগ্রন্থেই রয়েছে। যেমন চণ্ডীতে প্রার্থনা করা হয়েছে—

'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।
ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্।'

আবার ক্রুশবিদ্ধ হবার সময় যীশুর যে প্রার্থনা : 'Father, forgive them, because they do not know what they are doing'—এ প্রার্থনা একান্তই পরার্থে পরম নৈর্ব্যক্তিক প্রার্থনা।

এই প্রার্থনারই বিভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে স্তবে, ভজনে, আরাধনায়, উপাসনায়, পূজায় ও হোমে। এই প্রার্থনায় মানুষ কি ক'রে ব্রহ্মের কাছে নিজেকে ব্যক্ত করে ? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'সেতারের তার যেমন ক'রে গানকে বলে। সে নিজের সমস্ত গতির দ্বারা, স্পন্দনের দ্বারা, ক্রিয়ার দ্বারাই বলে—সর্বতোভাবে গানকে প্রকাশের দ্বারাই সে নিজের সার্থকতা সাধন করে।' তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'আমার প্রার্থনা এই যে, হে প্রাণস্বরূপ, আমার সেতারের তারে যেন মরচে না পড়ে, যেন ধুলো না জমে—বিশ্বপ্রাণের স্পন্দনাভিঘাতে সে দিনরাত বাজতে থাকুক—কর্মসঙ্গীতে বাজতে থাকুক—তোমারই নামে বাজতে থাকুক। প্রবল আঘাতে মাঝে মাঝে যদি তার ছিঁড়ে যায় তো সেও ভালো, কিন্তু শিথিল না হয়, মলিন না হয়, ব্যর্থ না হয়। ক্রমেই তার সুর প্রবল হোক, গভীর হোক, সমস্ত অস্পষ্টতা পরিহার ক'রে সত্য হ'য়ে উঠুক—প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত এবং মানবাত্মার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হোক—হে আবি, তোমার আবির্ভাবের দ্বারা সে ধন্য হোক।'

প্রার্থনার শ্রেয়তা এইখানেই।

উপনিষদ ও গীতা

বেদ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই চারভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বেদে পৃথক পৃথক সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদসমূহ দৃষ্ট হয়। বেদের ৪টি উপবেদ, ৬টি বেদাঙ্গ ও ৪টি উপাঙ্গ আছে। উপবেদ, যথা—(১) আয়ুর্বেদ, (২) ধনুর্বেদ, (৩) গান্ধর্ব বেদ ও (৪) অর্থশাস্ত্র। বেদাঙ্গ, যথা—(১) শিক্ষা, (২) কল্প, (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, (৫) ছন্দ ও (৬) জ্যোতিষ। উপাঙ্গ, যথা—(১) পুরাণ, (২) ন্যায়, (৩) মীমাংসা এবং (৪) ধর্মশাস্ত্র। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত, সাংখ্য দর্শন, পাতঞ্জল দর্শন, পাশুপাত দর্শন ও বৈষ্ণব দর্শনাদি সন্নিবিষ্ট। বেদের প্রতিশাখায় একখানি ক'রে উপনিষদ রয়েছে। এই উপনিষদসমূহের মধ্যে ১০৮ খানি উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। এই ১০৮ খানি উপনিষদের মধ্যে ঋক্‌বেদের অন্তর্গত ১০ খানি, শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত ১৯ খানি, কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত ৩২ খানি, সামবেদের অন্তর্গত ১৬ খানি এবং অথর্ববেদের অন্তর্গত ৩১ খানি। উপনিষদসমূহই সমস্ত বেদের সার। পুরাণসমূহের মধ্যে কোনো কোনোখানিতে উপনিষদে উক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপদেশগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—দেবীভাগবত পুরাণের অন্তর্গত দেবীগীতা ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণ। এ'রকম অন্যান্য পুরাণেও আছে। মীমাংসার মধ্যে উত্তরমীমাংসা-গ্রন্থটি উপনিষদোক্ত সত্যসমূহের একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ। যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণে সর্ব-উপনিষদের সার দেখতে পাওয়া যায়। গীতা মহাভারতের অন্তর্গত। আলোচনাসূত্রে শাস্ত্রবিদ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ উল্লেখ করেছেনঃ 'উপ' ও 'নি' পূর্বক 'সদ্' ধাতু 'ক্বিপ্' প্রত্যয়ে 'উপনিষদ' পদ হয়। অনেকে বলেন—'সদ্' ধাতুর অর্থ 'বিনাশ'। তদনুসারে যা-দ্বারা অবিদ্যা ও বাসনা বিনষ্ট হয়, তা-ই উপনিষদ। অন্য মতে 'উপ' অর্থ নিকট, 'নি' অর্থ বিশেষরূপে, 'সদ্' অর্থ গমন। অর্থাৎ যা গুরুর নিকট বিশেষরূপে গমন ক'রে শিক্ষা করা যায়, তা-ই উপনিষদ। উপনিষদসমূহের কথিত প্রসিদ্ধ উক্তিগুলি ভারতীয় তত্ত্বচিন্তার চরম পরিণতি বেদান্তদর্শনের ভিত্তি। এই আলোচনা প্রধানতঃ আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় হলেও এতে জগতের উৎপত্তি, প্রাণের উৎপত্তি, বাক্, মন, চক্ষু, কর্ণ, অগ্নি, যজ্ঞ প্রভৃতি নানাবিষয়ের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক বিচার আছে। এই সকল বিষয় আলোচনায় বহু উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে। তন্মধ্যে কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতার উপাখ্যান, বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ, ছান্দোগ্যোপনিষদে সত্যকাম-জাবালের উপাখ্যান রয়েছে। এতদ্ব্যতীত জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ, শ্বেতকেতু-আরুণি সংবাদ, নারদ-সনৎকুমার সংবাদ ও উষস্তির উপাখ্যান সমধিক প্রসিদ্ধ।

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটিতেই বলা হয়েছে—

'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যাসিদ্ধনম্ ॥'

অর্থাৎ 'জগতের যাকিছু অনিত্য ও পরিবর্তনশীল সমুদয় বস্তু, সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাই কারো ধনে লোভ কোরো না, ত্যাগবুদ্ধি-বিশিষ্ট হয়ে ভোগ করো।'

কঠোপনিষদে বলা হয়েছে—

'অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥'

অর্থাৎ 'একই অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়, তেমনি সর্বভূতের এক অন্তরাত্মা নানা বস্তুভেদে ভিন্ন হয়েছেন এবং সমুদয় পদার্থের বাইরেও আছেন।'

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত হয়েছে—

'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥'

অর্থাৎ 'যিনি অগ্নিতে, জলে, বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষধিতে ও বনস্পতিতে সঞ্চারিত, সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।'

শ্বেতাশ্বতর পুনরায় বলেছেন—

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥'

অর্থাৎ 'অজ্ঞানের পরপারে এই মহান আদিত্যবর্ণ পুরুষকে আমি জেনেছি। তাঁকে জেনেই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। অমৃতত্বলাভের আর কোনো পথ নেই।'

ছান্দোগ্যোপনিষদ তাই বলেছেন—

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।'

অর্থাৎ 'সর্ব জগৎই ব্রহ্ম। সমস্ত পদার্থ তিনি-হতেই জাত, তাঁতেই জীবিত ও তাঁতেই লীন হয়। এই কারণে শান্তচিত্তে তাঁকে উপাসনা করো।'

এই জাতীয় অর্থবহ অজস্র শ্লোকের সমাহারে বিভিন্ন উপনিষদ গ্রথিত। গীতায় আরও সুসংবদ্ধভাবে সমার্থবাচক শ্লোকের সঙ্গে আমরা পরিচিত হবার অবকাশ পাই। উপরন্তু গীতায় যে অবতারতত্ত্বের পরিচয় রয়েছে, উপনিষদে প্রধানতঃ তা অনুপস্থিত।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে বিষাদযোগ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রধানতঃ আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। এজন্য একে সাংখ্যযোগও বলে। কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানমূলক ত্রিবিধ যোগ এবং প্রসঙ্গক্রমে ত্রিগুণ, পুরুষ-প্রকৃতি, সংসার-মোহ, মোক্ষ প্রভৃতি বিষয় সূত্রাকারে এখানে বিভিন্নস্থলে উল্লেখিত হয়েছে। এই কারণে এই অধ্যায়কে গীতার্থসূত্র বলে, মূল লক্ষ্য ব্রাহ্মীস্থিতি জ্ঞান।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়েই প্রকৃত গীতার আরম্ভ। অর্জুনের মোহ এবং ভগবান কর্তৃক সেই মোহনাশের উপদেশে সমৃদ্ধ এই অধ্যায়। অর্জুন এখানে মাত্র তৃতীয় পাণ্ডব নন্, তিনি সমগ্র মানবপ্রতিভূ। প্রপঞ্চময় পৃথিবীতে মায়াবদ্ধ ও মোহান্ধ মানবকে পাশমুক্ত হ'য়ে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভের উদ্দেশ্যে নানা শ্লোকের মাধ্যমে ধ্রুবতত্ত্ব উপদেশ দানই এই অধ্যায়ের লক্ষ্য।

তৃতীয় অধ্যায় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্ন্যাসযোগ, ধ্যান বা অভ্যাসযোগ, জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ, অক্ষর ব্রহ্মযোগ, রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ, বিভূতিযোগ, বিশ্বরূপ দর্শনযোগ, ভক্তিযোগ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ, গুণত্রয় বিভাগযোগ, পুরুষোত্তমযোগ, দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ, শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ এবং মোক্ষযোগ বিবৃত হয়েছে।

সমগ্র গীতার সারার্থ পাওয়া যায় একাদশ অধ্যায়ে। এখানে স্বতঃই উপলব্ধি হবে—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', তিনি অক্ষরপুরুষ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্থাবর-জঙ্গম সবই তিনি, তিনিই জীবদেহে অবস্থান করে কর্মপ্রতিপাদন করছেন। আসক্তিহীন ও কর্তৃত্ব-বোধহীন হ'য়ে সর্বকর্ম তাঁকেই সমর্পণ করতে হয়। তাঁরই নির্দেশে সূর্য উদিত হচ্ছে, অগ্নি সঞ্চালিত হচ্ছে, বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, তিনিই সর্ববস্তুর একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র পরিচালক। বিশ্বরূপ দর্শন ক'রে অর্জুন তাই বলছেন ঃ 'তুমিই অক্ষর পরব্রহ্ম, তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, তুমিই অব্যয় সনাতন পুরুষ, তুমি আদি, তুমি অনাদি, তুমিই পরমধাম। হে সর্বরূপ সর্বেশ্বর, সর্বত্রই তুমি, তোমাকে সর্বদিকে নমস্কার করি।'

ভক্তের উদ্দেশ্যে তাই ভগবান বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি আমারই কর্মবোধে সমুদয় কর্ম করেন, আমিই যার একমাত্র গতি, যিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তিশূন্য, কারুর উপর যার বৈরীভাব নেই, যিনি সর্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা করেন, আমি তাঁকেই ধরা দিই। আমিই অন্তর্যামি রূপে সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, আমিই বেদ-সমূহের একমাত্র জ্ঞাতব্য, আমিই আচার্যরূপে বেদান্তের অর্থপ্রকাশক এবং আমিই বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থেকে বেদার্থ পরিজ্ঞাত হই।'

জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তি—গীতা এই চারটি মার্গের সমন্বয় ক'রে চতুরঙ্গ যোগ-শিক্ষা দিয়েছেন এবং এই যোগের মধ্য দিয়েই যোগেশ্বরের প্রাপ্তি। পুরুষোত্তমবাদ দ্বারাই গীতা জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় সাধন করেছেন। সর্বভূতাত্মৈক্য জ্ঞানই পুরুষোত্তমের জ্ঞান, সর্বভূতে প্রীতি ও সেই সর্বশরণে আত্মসমর্পণই পুরুষোত্তমে ভক্তি

এবং সর্বলোকসংগ্রহার্থ নিষ্কাম কর্ম পুরুষোত্তমেরই কর্ম ; এই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মিলনের দ্বারা আত্মা সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়,—যিনি একই কালে অনন্ত আধ্যাত্মিক শান্তি এবং অনন্ত বিশ্বব্যাপী কর্ম উভয়েরই অধীশ্বর, সেই পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করে। দৈবীসম্পদ মোক্ষের হেতু এবং আসুরীসম্পদ সংসার-বন্ধনের কারণ হয়। গীতাকে বলা হয়েছে—

'সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥'

অর্থাৎ সমগ্র উপনিষদরাশি গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্তা, অর্জুন বৎস এবং মহৎ গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ ও সুধীগণ তা পান করেন।

শাস্ত্রগত দিক ভিন্ন গীতাকে যদি বস্তুবাদী-দর্শনের আকররূপে গ্রহণ করা যায়, তবে বলা যায়—সমগ্র মানবশ্রেণীর প্রতীক এখানে অর্জুন। মানুষের অহংকে কেন্দ্র ক'রে তার ত্রিগুণাত্মক সত্য-রজঃ ও তম, তার বিষাদ, নির্বীর্যতা, পাপ-পুণ্যবোধ, নিষ্কাম ও সকাম কর্ম, ইন্দ্রিয়বশতা, রিপুবশতা, ফলাকাঙ্ক্ষা, চিত্তবিক্ষেপ, জীবন-মৃত্যু, পাপ-পুণ্যবোধ, আচার-অনাচার, রাগ-দ্বেষ-ঘৃণা, আত্ম-তাড়না, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, বৈরিতা, রতি-বিরতি, মাৎসর্যপরায়ণতা, যজ্ঞ-দান ও তপস্যা প্রভৃতিকে কেন্দ্র ক'রে তার মুক্তিতত্ত্বের মুমুক্ষুতা—এই যাবতীয় জাগতিক লক্ষণগুলি সম্পর্কে মানুষ সম্যক তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করে তার চৈতন্যস্বরূপ বিবেকের কাছ থেকেই। এই চৈতন্যস্বরূপ বিবেকই হচেছন ঈশ্বর,—এখানে পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই আত্মার অবিনাশিতা সম্পর্কে বলেন—

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২-২০

অর্থাৎ 'এই আত্মা জন্ম-মৃত্যুরহিত। ইনি নিত্য ও শাশ্বত। শরীর হত হলেও ইনি হত হন না।'

অপর শিক্ষাও এখানে প্রত্যক্ষ। সে শিক্ষা জীবনযুদ্ধের। জীবনের পথ কোথাও মসৃণ নয়, তা—ক্ষুরস্যধারাতুল্য, প্রতিপদে সংগ্রাম, প্রতিপদে যুদ্ধ। শাস্ত্রগত কুরুক্ষেত্র হচ্ছে মানবজীবনের এই সংগ্রামক্ষেত্র। সেখানে প্রতিনিয়ত বিরুদ্ধশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সুখ-দুঃখ ও লাভালাভের প্রশ্ন অতিক্রম ক'রে আত্মশক্তিতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। ২-৩৮ শ্লোকে তাই বলা হয়েছে—

'সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥'

অর্থাৎ 'সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় তুল্যজ্ঞান ক'রে যুদ্ধার্থ উদ্‌যুক্ত হও।'

অর্জুনের প্রতি ভগবানের এই আদেশই জীবনসংগ্রামী মানবমাত্রের প্রতিই আদেশ। সেই সঙ্গেই বলা হ'লো—

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ২-৪৭

অর্থাৎ 'তোমার কর্মে অধিকার, ফলে নয়। তাই ফলাকাঙ্ক্ষা ক'রে কর্মে প্রবৃত্ত হয়ো না : আর ফলাকাঙ্ক্ষা নেই ব'লে কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। যোগস্থ কুরু কর্মাণি। আর এই যোগের দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ হবে।' মানবজীবনের পরম আদর্শ ও পরম আনন্দ হচ্ছে—

'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥' ২-৫৬

অর্থাৎ 'যিনি দুঃখে উদ্বেগশূন্য, সুখে স্পৃহাশূন্য, যার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হয়েছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। আর সর্বকামনাত্যাগ, ইন্দ্রিয় সংযম, আত্মাভিমান ও মমত্ববুদ্ধি বর্জনপূর্বক আত্মচিন্তা বা ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হওয়াকেই ব্রাহ্মীস্থিতি বলে।'

ঈশ্বর তখন ভক্তকে আশ্বস্ত ক'রে বলেন—

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥' ৯-২২

অর্থাৎ 'অনন্যচিত্ত হ'য়ে যে ভক্ত আমার উপাসনা করে, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই ভক্তের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করি।'

মানুষকে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছাতে হয়। এই পৌঁছাবার পথটি সহজ নয়। তার জন্য নানা পদ্ধতিগত পথ ও অনুশাসনের প্রয়োজন। যোগের মধ্যে রয়েছে এই পথের সন্ধান। 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'—রাজযোগ বা অষ্টাঙ্গযোগের প্রধান বক্তব্যই হচ্ছে এই। অষ্টাঙ্গযোগ, যথা—যম. নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। তাই ৬-২৬ শ্লোকে বলা হয়েছে—

'যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বলং নয়েৎ ॥'

অর্থাৎ 'মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, অতএব অস্থির হ'য়ে মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় থেকে তাকে প্রত্যাহার ক'রে আত্মাতেই স্থির করবে।—এই অনুভবিত যোগযুক্ত পুরুষই সর্বত্র সমদর্শী হ'য়ে আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করে থাকেন।'

গীতায় বার বার বলা হয়েছে—কর্ম করো, যুদ্ধ করো ; এবং সেই সঙ্গেই বলা হয়েছে—জ্ঞানী হও, যোগী হও, ভক্ত হও। এর দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কর্ম-জ্ঞান-যোগ ও ভক্তি পরস্পরসাপেক্ষ ও সমন্বয়সাধ্য ; নিরপেক্ষ বা বিরোধী নয়। পণ্ডিতপ্রবর জগদীশচন্দ্র ঘোষের ব্যাখ্যানুসারে গীতা সাংখ্যের পুরুষ, প্রকৃতি

ও তার পরিণামক্রম স্বীকার করেন বটে, কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতিই যে মূলতত্ত্ব, তা স্বীকার করেন না ; মূলতত্ত্ব হচ্ছে পরমপুরুষ বা পুরুষোত্তম। তাই গীতায় জড়া প্রকৃতিকে ভগবানের অপরা প্রকৃতি এবং চেতন পুরুষকে পরাপ্রকৃতি বলা হয়েছে। সমস্ত ভূত এই দুই প্রকৃতি হতে জাত, এবং ঈশ্বরই জগতের একমাত্র কারণ, তাঁর সত্তাতেই সকলের সত্তা। আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চতুর্বিধ ভক্ত সেই ঈশ্বরতত্ত্ব জানতেই আগ্রহী। কারণ জরা-মরণ সীমার পারে একমাত্র তিনিই অবস্থিত। যেমন বায়ু আকাশে সঞ্চালিত হলেও আকাশের সঙ্গে তা সংস্পৃষ্ট হয় না, তেমনি সর্বভূতে ঈশ্বর থাকলেও তাঁর সঙ্গে কারুর সংশ্লেষ হয় না। তিনি সর্বসংশ্লিষ্ট অথচ সর্বাতীত।

তেমনি মানবসংসারে যে-মানুষ সংসারের যাবতীয় কর্মসংসাধন ক'রেও সংসারমুক্ত ও আত্মসন্ন্যাসে স্থিত, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মবিদ ও ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত ঃ 'সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি।' তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন ক'রে অর্জুন যেমন বিস্মিত ও বিমূঢ়, তেমনি মানবকূলে ভক্তবৃন্দও তাঁর বিভূতি লাভ ক'বে কৃতার্থ ও ধন্য হন। প্রথম স্তরে অভ্যাসযোগের দ্বারাই তাঁতে মন সংস্থিত হয়।

এতদ্ভিন্ন জীবদেহধারণজনিত যে যে বিষয়সমূহ মানবজীবনকে শৃঙ্খলার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে, তদ্‌সমূহের সম্যক জ্ঞানও গীতায় বিস্তৃতভাবে আভাসিত হয়েছে। সৃষ্টিরহস্য, গুণভেদে বর্ণভেদ ও কর্মভেদ, অন্নময়তা, স্বধর্মনিষ্ঠা, নৈষ্কর্মবাদ ও সিদ্ধি, প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য, সর্বধর্ম-পরিহার ও শরণাগতি, বিষয় ও বিষয়াতীত বোধ, আসক্তি ও বৈরাগ্য, জ্ঞেয়তত্ত্ব, সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাস, সর্বভূতে সমদৃষ্টি, জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ও অভেদ, পুরুষোত্তম তত্ত্ব, মোক্ষ প্রভৃতি বিষয়ক সম্যক জ্ঞানের আকরগ্রন্থ হিসেবেও গীতার অবদান অনন্য। ভাগবৎসম্পৃক্ত হয়েও বিজ্ঞানভিত্তিতে তা অধিক প্রগতিসমৃদ্ধ। গীতার মূল প্রবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পরমাশক্তির তিনি একীভূত সত্তা। জগৎ হিতার্থে ও মানবকল্যাণে যুগে যুগে তাঁর দেহী-আবির্ভাব। বিশ্বপ্রকৃতিকে কেন্দ্র ক'রে পুরুষকে ক্রমে পুরুষোত্তম হ'য়ে ওঠাতেই গীতার সার্থকতা। উপনিষদে তারই ভিৎ রচনা করা হয়েছে। ধ্রুবতত্ত্ব উপলব্ধির ক্ষেত্রে উপনিষদ ও গীতা সমার্থবাচক।

চতুঃশ্লোকী ভাগবত

মহারাজ পরীক্ষিতের দেহান্তকাল আসন্ন। সুতরাং কিভাবে তিনি মৃত্যুভয়জনিত দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে পারেন, এই চিন্তাই তাঁর মনে তখন প্রবল হয়ে উঠেছে। কারুর কোনো সান্ত্বনা বা উপদেশই তাঁর অশান্ত মনকে তৃপ্ত করতে পারছে না। তখন তিনি পরম তত্ত্ববিৎ শুকদেবের শরণাপন্ন হলে তিনি মহারাজকে ব্রহ্মবিদ্যামূলক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে অনুপ্রাণিত করলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব শ্রীহরি সর্বপ্রথম চারটি শ্লোকে ব্রহ্মার নিকট বিবৃত করেন ; সেই হেতু এর অপর নাম চতুঃশ্লোকী ভাগবত। বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টি সম্পর্কে মহারাজ পরীক্ষিৎ কতকগুলি প্রশ্ন তুলে ধরেন—যা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের অন্তর্গত। শুকদেব কর্তৃক সেই প্রশ্ন-সমূহের জবাব লিপিবদ্ধ হয়েছে সেই স্কন্ধেরই নবম অধ্যায়ে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্লোক পর্যন্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ যে পাঁচটি প্রশ্নের অবতারণা করেন, তা হচ্ছে—

(১) অলৌকিক পরম পুরুষ বা পরম ব্রহ্মা কে ? তিনি কোথায় এবং কিভাবে অবস্থান করছেন ?

(২) সৃষ্টির আদিতে অণ্ড থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি, অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাভিকমল থেকে যাঁর জন্ম, সেই ব্রহ্মাকে অবগত হতে ইচ্ছা করি।

(৩) যে পুরুষ মহৎ-তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বের সৃজন করেছেন, যিনি সকলের অন্তরের অন্তস্থলে বিরাজমান, সেই পুরুষকে জানতে ইচ্ছা হয়।

(৪) যে পরমপুরুষ সর্বভূতে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁর কথা সবিস্তারে বলুন। এবং—

(৫) যাঁর মধ্যে যাবতীয় জীবের সমন্বয় ঘটেছে, সেই পুরুষ সম্পর্কে অবগত হতে ইচ্ছা করি।

এই পাঁচটি প্রশ্ন শান্ত, প্রীতি ও ভক্তিরসের দ্যোতক। শ্রীভগবানের স্বরূপপ্রকাশক এই পঞ্চ গুণ জীবকে ভগবান থেকে পৃথক করে। শান্তরস ভক্তির প্রথম সোপান। এই রসের দু'টি গুণ ঃ ঈশ্বরে নিষ্ঠা এবং সংসারবাসনাত্যাগ। দেহাবসানের পূর্বে মহা-রাজ পরীক্ষিতের এই একমাত্র কাম্য। তাই তাঁর ব্যাকুল প্রশ্ন—

স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ।
মুক্ত্বাত্মমায়াং দায়েশঃ শেতে সর্বগুহাশয়ঃ ॥ ৯

অর্থাৎ—শ্রীভগবান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারী সকলের অন্তরে বিরাজ-মান, মায়াশক্তির নিয়ামক, অথচ মায়াসম্বন্ধশূন্য হ'য়ে যে স্থানে অবস্থান করেন, তদ্বিষয়ে আমি জানতে ইচ্ছা করি। কিন্তু এখানেই মহারাজের কৌতূহলী প্রশ্নের শেষ নয়। আরও যে যে প্রশ্ন তিনি তত্ত্ববিৎ শুকদেবের নিকট উপস্থিত করেন, তা

হচ্ছে—সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যবর্তীকাল এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কিসে জানা যায় ? স্থূলাভিমানী পিতৃ এবং দেবতাদির আয়ুষ্কাল কত ? পরমাণুপ্রভৃতি সূক্ষ্মকাল ও বৎসরাদি স্থূল কালের প্রবৃত্তি কিভাবে অবগত হওয়া যায় ? সত্ত্বাদিগুণের উৎকর্ষ অভিলাষী জীবসমূহের মধ্যে শুভাশুভ কর্মজনিত যোগ, জ্ঞান ও ভক্তির অভ্যুদয় কি পরিমাণে কিসের দ্বারা লাভ হতে পারে ? পৃথিবী, পাতাল, দিক, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্বত, নদী, সমুদ্র. দ্বীপসমূহ তথা তৎ-তৎ স্থলবাসী জীবসমূহের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হয়েছে ? মানুষের সাধারণ ধর্ম কি ? বর্ণাশ্রম নিবন্ধন বিশেষ ধর্ম কি প্রকার ? প্রজাপালনে অধিকারী রাজর্ষিদিগের ধর্ম কি, এবং মানুষের বিপদকালীন ধর্মই বা কি ? প্রকৃতি প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা কত ? তাদের স্বরূপ বা লক্ষণ কি ? দেবপূজা অর্থাৎ—শ্রীগোবিন্দ-আরাধনের প্রণালীই বা কি ? আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সাধন অষ্টাঙ্গযোগের বিধি কিরূপ ? যোগসিদ্ধদের অনিমা-লঘিমাদি ঐশ্বর্য এবং তাঁদের অর্চিরাদি গতি কিরূপ ? যোগীদের লিঙ্গ-শরীরের নাশ ঘটে কিভাবে ? সর্বজীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কিরূপে হয় ; বৈদিক কর্ম এবং স্মার্ত কর্ম, পুত্রেষ্টি প্রভৃতি কাম্য কর্ম এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের স্বরূপ কি ? জীবাত্মার বন্ধন ও মুক্তি এবং তাব স্বরূপে অবস্থান কি প্রকারে হয় ? শ্রীভগবান স্বীয় যোগমায়া প্রভাবে কিরূপে নানাবিধ লীলা করেন এবং মায়াসম্পর্ক ত্যাগ করে প্রলয়কালে কিরূপে দর্শকসদৃশ্য উদাসীনভাবে থাকতে পারেন ?

এই সুবিস্তৃত ও সর্বব্যাপী তত্ত্বজিজ্ঞাসার দ্বারা শ্রীগোবিন্দলীলাকথা শ্রবণে উৎসুক মৃত্যুপথযাত্রী মহারাজ পরীক্ষিৎ ভবভয় হতে পরিত্রাণ পেতে চাইলেন।—

ন মেহসবঃ পরায়ন্তি ব্রহ্মন্ননশনাদিভিঃ।
পিবতোহচ্যুতপীযূষং তদ্বাক্যাব্ধি বিনিঃসৃতম্ ॥ ২৫

প্রীত হয়ে শ্রীশুকদেব মহারাজকে সর্ববেদতুল্য ভাগবত শোনাতে আরম্ভ করলেন।—

প্রাহ ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতং।
ব্রহ্মণে ভগবৎ প্রোক্তং ব্রহ্মকল্প উপাগতে ॥ ২৭

শ্রীশুকদেব তত্ত্বজ্ঞপুরুষ ও সর্ববেদবেত্তা, আর মহারাজ পরীক্ষিৎ তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু ও শরণাগত। করুণার্দ্রচিত্ত শুকদেব তাঁর প্রশ্নাবলীর ক্রম-অনুসারে যথাযথ উত্তর না দিয়ে বিষয় বা প্রস্তাব অনুযায়ী যাবতীয় প্রশ্নের সমাধানে উদ্যোগী হলেন। দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে সেই বর্ণনাই নানা শ্লোকে বিধৃত।

বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া।
রমমাণো গুণেষস্যা মমাহমিতি মন্যতে ॥ ২
যর্হিবাব মহিম্নি স্বে পরস্মিন্ কালমায়য়োঃ।
রমেতগতসম্মোহস্ত্যক্তোদাস্তে তদোভয়ম্ ॥ ৩

অর্থাৎ—'এই সংসার মায়ার দ্বারা উৎপন্ন। বহু বৈচিত্র্যসম্পন্ন মায়ারচিত এই দেহাদিতে আসক্ত জীব বাল্য, যৌবন, দেব ও মনুষ্যরূপে প্রকাশিত হয় এবং তৎ-তৎ দেহে

'আমি', 'আমার' ইত্যাদি বলে অভিমান করে। যখন মায়াবিকার মুক্ত হয়ে জীব কাল ও মায়ার অতীত স্বীয় মহিমামণ্ডিত শ্রীভগবানের চরণসেবায় নিযুক্ত হয়, তখন কাল ও মায়া অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি সম্বন্ধ ছেড়ে অনাসক্তভাবে অবস্থান করে। চৈতন্য-রূপী জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে মায়াকৃত ভেদ ছাড়া কোনো তাত্ত্বিক ভেদ নেই। জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ একই, ব্রহ্মের মায়াবদ্ধ অবস্থার নামই জীব। জীবের দেহ মায়িক, সুতরাং অবিদ্যার কুহকে পূর্ণ; কিন্তু ঈশ্বর-দেহ সচ্চিদানন্দঘন লীলাবিগ্রহ। জীব স্বীয় কর্মবশে মায়িক দেহে কর্মফল ভোগ করে দুঃখ পায়, কিন্তু শ্রীভগবান লীলাকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করবার জন্যে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে লীলারসাস্বাদনের মানসে বিভিন্নভাবে ক্রীড়া করেন।

শ্রুতি উল্লেখ করেছেন: ব্রহ্মাই জগতের আদিপুরুষ। তিনি ভক্তিতত্ত্বের উপদেষ্টা: একমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই যে শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করা যায়, তা তিনিই স্বীয় জীবনে আচরণ ক'রে প্রতিপন্ন ক'রে গিয়েছেন। তিনি শ্রীভগবানের নাভিপদ্ম হতে জন্মগ্রহণ ক'রে অভিমানবশে বুঝতে পারলেন না যে, তিনি কোথায় অবস্থান কর-ছেন, প্রজাসৃষ্টির অহংও প্রচ্ছন্নভাবে তাঁকে আবিষ্ট করছিল, এমনি সময় অনন্ত সমুদ্র-তরঙ্গে তিনি 'তপ' 'তপ' ধ্বনি শুনতে পেলেন। এই 'তপ'ই তপস্যা। অন্তরে তিনি তপস্যায় রত হবার আদেশ পেয়ে 'তপশ্চর্যায় মনঃসংযোগ করলেন।—

স্বধিষ্ণ্যমাস্থায় বিমৃশ্য তদ্ধিতং
তপস্যুপাদিষ্ট ইবাদধে মনঃ ॥ ৭

এক হাজার বছর কঠোর তপশ্চর্যার পর ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যং এই সপ্তলোক তাঁর চিদাকাশে ভেসে ওঠে। ব্রহ্মার এই তপস্যায় পরিতুষ্ট হয়ে শ্রীভগবান তাঁকে স্বীয় বৈকুণ্ঠধাম দেখালেন। এখানে পৌঁছালে অবিদ্যাপূর্ণ এই সংসারে আর পুনরাবর্তন করতে হয় না। সেই বৈকুণ্ঠে রজঃ বা তমোগুণ নেই, সেখানে সবই আনন্দময়।—

প্রবর্ততে যম রজস্তম স্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমূতা পরে হরে—
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ ॥ ১০

বৈকুণ্ঠপতিকে সন্দর্শন ক'রে ব্রহ্মার অন্তঃকরণ আনন্দে মগ্ন হলো, শরীর রোমা-ঞ্চিত হতে লাগলো এবং নয়নযুগল প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ হলো। শ্রীভগবানের চরণ-কমলে তিনি ভক্তিভরে প্রণিপাত করলেন। তুষ্ট হ'য়ে শ্রীভগবান বললেন: 'হে ব্রহ্মণ! তোমার মঙ্গল হোক। আমার নিকট তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা করো। আমিই তপস্যারূপে তোমাকে নির্বিকল্পসমাধিতে নিমগ্ন করেছিলাম।

সৃজামি তপসৈবেদং গ্রসামি তপসা পুনঃ।
বিভর্মি তপসা বিশ্বং বীর্য্যং মে দুশ্চরং তপঃ ॥ ২৪

আমি তপস্যার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করি, তপস্যা দ্বারা পালন করি এবং প্রলয়কালে তপস্যার দ্বারা জগৎ ধ্বংস করি। 'তপসোঽহমাত্মা', আমি তপস্যার আত্মা। তুমি বর প্রার্থনা করলে আমি তা পূরণ করবো।

ব্রহ্মা বললেনঃ 'হে ভগবন! আপনি সর্বভূতের অধিষ্ঠাতা, এবং সকলের বুদ্ধিতে অবস্থিত। অপ্রতিহত নির্মল বুদ্ধি দ্বারা সকলের মনোভাব আপনি অবগত আছেন। তথাপি হে নাথ! আমি প্রার্থনা করি, অরূপী আপনার সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপ তত্ত্বতঃ যাতে অবগত হতে পারি. আমাকে সেই উপদেশ দান করুন। অর্থাৎ—(১) আপনার সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপ কি প্রকার? (২) আপনার মায়া ও যোগমায়া কি প্রকার? (৩) উক্ত উভয়লোকে আপনার লীলা কি প্রকারে সংঘটিত হয়? এবং (৪) আমার অভিষ্ট পূরণার্থ আপনার উপদেশানুসারে কি কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে—যাতে আমি মায়াধীন হয়ে না পড়ি?

এই প্রশ্ন চতুষ্টয় শ্রবণ ক'রে শ্রীহরি (শ্রীভগবান) চারটি শ্লোকে তার উত্তর প্রদান করেন। এই হেতু তা চতুঃশ্লোকী ভাগবত ব'লে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

শ্রীভগবান বললেন—

'যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ গুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥' ৩১

'আমার স্বরূপ, লক্ষণ, রূপ, গুণ এবং লীলাতত্ত্ব আমার কৃপায় তোমার যথার্থরূপে অনুভব হোক।'

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জীব যখন ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করে, তখন জীব ও ব্রহ্ম একই হয়ে যায়; জীবাত্মা পরমাত্মা অভিন্ন বোধ হয়। একেই পরাজ্ঞান বলে।

শ্রীভগবান বললেন—

'অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং॥' ৩২

'সৃষ্টির পূর্বে আমিই ছিলাম, অন্যকিছুই ছিল না। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের মূল কারণ প্রকৃতিও তখন ছিল না; সৃষ্টির পরেও আমিই আছি, এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ—এও আমি, এবং প্রলয়ান্তে যা অবশিষ্ট থাকবে, সেও আমি। আমিই অনাদি, অনন্ত ও অদ্বিতীয়।'

'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥' ৩৩

'প্রতিবিম্বের যেমন নিজস্ব কোনো সত্তা নেই, প্রকৃত বস্তুর সত্তাতেই তার সত্তার প্রতীতি হয়, অন্ধকার যেমন প্রকৃত বস্তুর আবরক এবং দীপের সাহায্যে তার প্রকাশক, তদ্রূপ আমার আশ্রয় ভিন্ন যে বস্তুর স্বতঃই প্রতীতি বা জ্ঞান হয় না, তাকেই আমার বহিরঙ্গ শক্তি 'মায়া' বলে জানবে।

দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম চ কারকঃ
শ্রদ্ধাবস্থা কৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব এব হি।
যেনেমে নির্জিতাঃ সৌম্যগুণা জীবেন চিত্তজাঃ
ভক্তিযোগেন সন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে।

'দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম, কারক, শ্রদ্ধাবস্থা, কর্তব্যকর্মে নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও ত্রিগুণ—সত্ব রজঃ, তমঃ—যিনি সকল মানস সৌম্যগুণ জয় করেছেন এবং ভক্তি সহকারে আমাগত প্রাণ হয়ে অবস্থান করেন, তিনিই আমাকে লাভ করেন।'

গীতায়ও শ্রীভগবানের অনুরূপ উক্তি—

'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥'

অর্থাৎ—ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি সর্বদা প্রসন্ন থাকেন, কিছুতেই শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্বভূতে তাঁর সমদৃষ্টি, ভগবানের প্রতি পরাভক্তি তিনি লাভ ক'রে থাকেন।

(১) প্রাধানিকাঃ স্যু র্দেহাস্তদ্ধর্মা আবিদ্যকঃ পুনঃ।
জীবেষু তত্তৎ সম্বন্ধো ভক্তিশ্চেৎ নির্গুণাশ্চতে ॥
(২) চিজ্জীবমায়া নিত্যাঃ স্যুস্তিস্রঃ কৃষ্ণস্য শক্তয়ঃ।
তদ্বৃত্তয়শ্চ তাভিঃ স ভাত্যেকঃ পরমেশ্বরঃ ॥
(৩) কার্যকারণয়োরৈক্যাৎ শক্তি শক্তিমতোরপি।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥
(৪) ভক্তানামেব সিদ্ধান্তঃ চতুঃশ্লোকীয় মীলিতা।
শীলিতা ভবতাদ্ভক্তৈস্বৈরেব ন কিলাপরৈঃ ইতি ॥

কোনো বস্তুর সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে তদ্বিপরীত বস্তুরও জ্ঞান থাকা অতীব প্রয়োজন, নতুবা বস্তুজ্ঞানে ভ্রান্তি আসতে পারে। মায়ার স্বরূপ বুঝতে হলে যেমন পরিদৃশ্যমান জগতের অবাস্তবতা, নশ্বরতা ও এর আশ্রয়ে দুঃখানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে ইত্যাদি বুঝতে হয়, তদ্রূপ মায়াতীত জগতের উপলব্ধি দ্বারা এর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারলে জীবের দুঃখনিবৃত্তি হয়, এও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। জীব মায়াধীন হ'য়ে রজ্জুতে সর্পভ্রম করে, অসত্যকে সত্য মনে করে, তাই মরনের কুলালচক্রে নিষ্পেষিত হচ্ছে। শ্রীহরি জীবকে ভাবী সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্য মায়ার স্বরূপ নির্ণয় ক'রে তাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন। পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হ'লে যোগমায়াই তখন জীবকে অধিকার ক'রে বসে, তা তার সিদ্ধির অনুকূল হয়ে দাঁড়ায়। মায়া এবং যোগ-মায়া অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ; সুতরাং একটিকে জানতে হ'লে অপরটিকে জানাও অপরিহার্য। এই মায়া বিদ্যা ও অবিদ্যাভেদে দ্বিবিধ। বিদ্যার দৃষ্টান্ত—'যথা ভাসঃ', যেমন প্রদীপের আলোকে সবকিছুই দৃষ্ট হয় ; অবিদ্যার দৃষ্টান্ত—'যথা তমঃ', যেমন অন্ধকারে সবই আচ্ছন্ন থাকে। ভগবান তাই বলছেন—'ভক্ত্যা অহমেকয়া গ্রাহ্যঃ', 'ভক্ত একমাত্র বিদ্যার আশ্রয়ে অনন্যা ভক্তি দ্বারাই আমাকে লাভ করতে পারে।' কারণ—

কার্য্যং প্রাধানিকং সত্যং কার্যং অবিদ্যকং মৃষা ।
নিত্যং তদ্ভক্তিসম্বন্ধমিদং তন্নিত্যাত্মকম্ ॥

অর্থাৎ—প্রধানের বা প্রকৃতির কার্য সত্য, অবিদ্যার কার্য মিথ্যা, এবং বিদ্যার কার্য বা ফল নিত্য ও ভক্তিযুক্ত।

যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে ।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥

কর্ম, জ্ঞান, যোগ এবং সাংখ্য—এই হচ্ছে পুরুষার্থ ; এই চারটি সাধনপথের পাথেয়। শ্রীহরির শরণাগত ভক্ত পুরুষার্থচতুষ্টয় ব্যতীতও ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ করে।

ব্রহ্মার প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান পুনরায় বললেন—

'যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু ।
প্রবিষ্টান্য প্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্ ॥' ৩৪

'দেবমনুষ্যতির্য্যগাদি জীবদেহ আকাশাদি পঞ্চমহাভূত দ্বারা নির্মিত, অতএব পঞ্চমহাভূত সৃষ্টির পরে জীবদেহে প্রবেশ করে। জীবদেহ ব্যতীত পৃথকভাবেও আকাশাদি পঞ্চমহাভূত তার কারণরূপে বিদ্যমান থাকায় তাতে অনুপ্রবিষ্টও থাকে। তদ্রূপ আমিও ভূতভৌতিক পদার্থসমূহে প্রবিষ্ট ও অপ্রবিষ্ট থাকি, বিশেষতঃ আমার ভক্তজনের হৃদয়-স্বরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকি।'

মহারাজ পরীক্ষিৎ যেখানে শ্রীভগবানসৃষ্ট চতুর্বর্ণ সম্পর্কে প্রশ্নাতুর, সেখানে বলা হয়েছে—

'মুখবাহুরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং ।
ন ভজন্তি অবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ইতি ॥

অর্থাৎ—সৃষ্টির মূল চৈতন্যময় ঈশ্বরের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, ঊরু থেকে বৈশ্য এবং পদ থেকে শূদ্র গুণানুসারে পৃথক পৃথক চতুর্বর্ণ চতুরাশ্রম সমেত উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে যারা পরমাত্মরূপ বরণীয় পুরুষকে ভজনা না ক'রে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তারা স্বস্থান ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।

'রসো বৈ সঃ'—তিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, ব্রহ্মসূত্রে এই কথা প্রতিপাদিত। তেমনি তিনি 'রস্যতে ইতি রসঃ, রসয়তি ইতি রসঃ', তাঁর অনুপম সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি যেমন রসময়ভাবে প্রকাশিত, তেমনি রস আস্বাদনও করছেন তিনি। কিভাবে রস আস্বাদন করছেন ? তিনি 'রূপং রূপং শতরূপং বভুবঃ', রূপে রূপে শতরূপে বিরাজ ক'রে তিনি শান্তরসে, দাস্যরসে, সখ্যরসে, বাৎসল্যরসে ও শৃঙ্গাররসে নিজেকে আস্বাদন করছেন। ব্রহ্মা এইরূপ প্রেমভক্তির প্রভাবেই শ্রীহরির রূপগুণাদি মাধুর্যরস অনুভব করেছিলেন।

তাঁকে পাওয়া যায় কি ক'রে ? এখানে উপনিষদের উক্তি স্মর্তব্য, যথা—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তঞ্ং স্বাম্ ইতি।'

অর্থাৎ—এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন দ্বারা পাওয়া যায় না, মেধা বা বহুবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারাও পাওয়া যায় না ; যিনি তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁকে বরণ করেন, তিনিই পরমাত্মাকে লাভ করেন, পরমাত্মাও তখন স্বীয় রূপ ভক্তের নিকট প্রকট করেন। ভক্তির অনুশীলন করতে করতে সাধক এমন এক স্তরে এসে পৌঁছান, যেখানে বহির্জগতের বস্তুর প্রতি মোহ পরিহার করে কেবল শ্রীহরির পাদপদ্মের প্রতি মমত্ব আরোপ করেন ; এরই নাম প্রেম—যাকে ভক্তির শেষ স্তর বলা যায়। ব্রহ্মা এতাদৃশ শুদ্ধ-সাধন-ভক্তিলভ্য প্রেমভক্তির প্রভাবেই শ্রীহরির রূপগুণাদি মাধুর্যরস অনুভব করেন। ভক্তির চারটি রূপ, যথা—(ক) কামনাশূন্য ভক্তি শুদ্ধাভক্তি, (খ) স্বর্গাপবর্গাদি বাসনাযুক্ত ভক্তি কর্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, (গ) মুক্তিবাসনাযুক্ত ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, এবং (ঘ) সিদ্ধিবাসনাযুক্ত ভক্তি যোগমিশ্রা ভক্তি। কিন্তু একমাত্র নিষ্কাম ভক্তিই জীবের সর্বাবস্থায় ও সর্বকালে অনাবিল শান্তির পরিপোষক।

ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান বললেন—

'এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভজন কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥" ৩৬

'হে ব্রহ্মণ! তুমি একাগ্রচিত্তে মৎ-কথিত ভক্তিযোগের সম্যক অনুষ্ঠান করো, তাহলেই কল্পে কল্পে বিবিধ সৃষ্টি করেও কখনো মুগ্ধ হবে না, অর্থাৎ—'আমিই কর্তা' —এই অভিমান বা মোহের বশীভূত হবে না।'

শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন : 'মহারাজ! ভগবান শ্রীহরি লোকস্রষ্টা ব্রহ্মাকে এই উপদেশ দিয়ে তাঁর দৃষ্টিপথ হতে স্বীয় চতুর্ভুজরূপ অন্তর্হিত করলেন। শ্রীহরির অপার করুণায় ব্রহ্মার মোহ চিরতরে বিদূরিত হলো এবং তিনি পূর্ববৎ জগৎ-সৃষ্টিকার্যে আত্মনিয়োগ করলেন। অনন্তর তদীয় পুত্র ভক্তচূড়ামণি নারদ মায়েশ শ্রীহরির কৃপাশক্তি অবগত হবার জন্য পিতা ব্রহ্মাকে নানারূপে পরিচর্যা করে তুষ্ট করতে লাগলেন। হে রাজন! ব্রহ্মার মানসপুত্র দেবর্ষি নারদ তাঁর পিতাকে শ্রীভগবানের মায়া-বিভূতি সম্পর্কে পরম তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মতো সেই সমুদয় বিষয়ই জানতে চাইলেন—যে-যে বিষয়ে তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছ। এইরূপে শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা তাঁর মানসপুত্র দেবর্ষি নারদকে, নারদ মহামুনি বেদব্যাসকে, পিতা বেদব্যাস আমাকে এবং আমি তোমাকে এই ষট্সংবাদসমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করতে প্রবৃত্ত হলাম।

'যদুতাহং ত্বয়া পৃষ্টো বৈরাজাৎ পুরুষাদিদং।
যথাসীত্তদুমাখ্যাস্যে প্রশ্নানন্যাংশ্চ কৃৎস্নশঃ॥' ৪৫

'তুমি জিজ্ঞেস করেছ, এই বিরাট পুরুষ হতে কিরূপে এই জগতের উৎপত্তি হলো ? শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা দ্বারা আমি এই সমুদয় প্রশ্ন এবং এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রশ্নের সবিস্তার উত্তর প্রদান করছি।'

পরম ভাগবতপ্রাণ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীহরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য-কৃত চতুঃশ্লোকী ভাগবতভাষ্য উদ্ধার করে সর্বজনবোধ্যভাবে সংক্ষিপ্তাকারে এখানে উপস্থিত করার অবকাশ পাওয়া গেল। তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানবমাত্রের যে চিরন্তন কৌতূহলী প্রশ্ন, তারই সমাধানের আকর-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত। বেদ ও উপনিষদের সারাংশ হতে ভাগবত সৃষ্টি ঃ 'বেদোপনিষদাং সারাজ্জাতা ভাগবতী কথা।' ভাগবতকে ভগবানের সাক্ষাৎ বাঙ্ময়ী মূর্তি বলা হয় ঃ 'তেনেয়ং বাঙ্ময়ী মূর্তিঃ প্রত্যক্ষা বর্ততে হরেঃ।' দেবর্ষি নারদ মহামুনি ব্যাসদেবকে ভগবানের যশলীলা কীর্তন করতে বলায় ব্যাসদেব মদ্ভাগবত রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাতে রয়েছে ১২ স্কন্ধ, ১৮ হাজার শ্লোক। চতুঃশ্লোকী ভাগবত তারই দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম ও নবম অধ্যায় —যা মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক পরমতত্ত্ব জিজ্ঞাসার উদ্ভাবন ও শ্রীশুকদেব কর্তৃক তার নিরসন। পূর্ণাঙ্গ ভাগবতই তিনি মহারাজকে শ্রবণ করান। এখানে মহারাজ পরীক্ষিৎ পরমতত্ত্বজিজ্ঞাসু মানবমাত্রেরই প্রতীকরূপে গ্রহণীয়। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশুকদেব-কথিত চতুর্বর্গপ্রমুখ নানা উদাহরণসহ পরম ভাগবততত্ত্ব আমাদের চিরন্তন তপস্যাসূচক ঔৎসুক্যেরই অনন্য অবদান। এই বিশ্বোৎপত্তিকারিণী মায়া বাহ্যতঃ অতি রমনীয়া হলেও অন্তর্চক্ষুদ্বারা বিচার ক'রে দেখলে স্পষ্টতঃ অসার প্রতিপন্ন হবে। সুতারাং শ্রীগোবিন্দচরণই একমাত্র সারবস্তু, আর যাকিছু সবই অসার। ভবভয়বন্ধন থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথই হচ্ছে একাগ্র ভগবৎভক্তি। এই ভক্তিই প্রেমের পুষ্পে পুষ্পিত হ'য়ে চিরবাঞ্ছিত চির আশ্রয় পরমাত্মার শ্রীচরণ স্পর্শ করে নির্বাণ লাভ করে।

'কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌবিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে।।' (ভাঃ ১০।২৯।১৫)

ভক্তিশাস্ত্রের এতবড় উপাদান ভারত ভিন্ন আর কোথায় সম্ভব ?

সপ্তশ্লোকী চণ্ডী

মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা 'বাক' পরমাশক্তি মরমাত্মার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন উপলব্ধি ক'রে যে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, তাকেই 'দেবীসূক্ত' বলা হয়। অষ্ট মন্ত্র বিশিষ্ট এই দেবীসূক্ত চণ্ডীর মৌলিক উপাদান। পরমাত্মাই দেবীসূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনিই চণ্ডীতে উপাখ্যানাকারে মহামায়ারূপে বর্ণিত হয়েছেন।

সেই উপাখ্যান রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির বিষাদযোগ ও আত্মমুক্তির জন্য মেধস মুনির আশ্রমে সমুপস্থিত হয়ে আত্মনিবেদন ও অভীষ্টলাভের নির্দেশ প্রার্থনা। যে-প্রজাবৃন্দের প্রতিপালনে রাজা সুরথ যত্নবান ছিলেন, সেই প্রজাবৃন্দই একদা বিদ্রোহী হয়ে সুরথকে রাজ্যচ্যুত করলো। অপরদিকে ধনলোলুপ ও অসৎবৃত্তি-সম্পন্ন পুত্র ও ভার্যা-কর্তৃক সমাধি বিতাড়িত। তাঁরা উভয়েই সত্ত্বগুণান্বিত। জ্ঞানগুরু ঋষি মেধস তাঁদের কাছে বৈষয়িক জ্ঞানের অসারত্ব প্রতিপাদন ক'রে জগৎ-রহস্য বা মহামায়াতত্ত্ব কীর্তন করেন। মহামায়াতত্ত্বের প্রথমেই তিনি মায়ের বন্ধনলীলার আলোচনা করেন। কুলালতন্ত্রেও এই বন্ধন বা অষ্টপাশের উল্লেখ আছে। যথা— ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্কা, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও জাতি। এই বন্ধন বা পাশ থেকে মুক্ত হলেই জীব শিবত্বপ্রাপ্ত হয়। জীবত্বের মালিন্যই গ্রন্থি বা বন্ধন। এই বন্ধন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণভেদে ত্রিবিধ। মা তাঁর সন্তানদের ভববন্ধন কাটিয়ে অমৃতময় সচ্চিদানন্দ আস্বাদন করাতে চান। এই পরিদৃশ্যমাণ জীবজগৎ তাঁরই অনন্ত প্রবাহ মাত্র। সদসৎ, ধর্মাধর্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, বিকাশ-অবিকাশ, আলো-অন্ধকার সমস্তই সেই মহাশক্তিতে লীলায়িত। এজন্য তিনি মহাবিদ্যা হয়েও মহামায়া, মহামেধা হয়েও মহামোহ এবং মহাদেবী হয়েও মহাসুরী। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ সেই পরমাশক্তির উদ্দেশ্যে বলেছেন—

'ত্বমেব সর্বজননী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
ত্বমেবাদ্যা সৃষ্টিবিধৌ স্বেচ্ছায়া ত্রিগুণাত্মিকা॥
কার্যার্থে সগুণা ত্বং চ বস্তুতঃ নির্গুণা স্বয়ম্।
পরব্রহ্মস্বরূপা ত্বং সত্যা নিত্যা সনাতনী॥'

'দেবীসূক্ত'-মতে পরব্রহ্মই দেবী। তিনি নিজেই বলেছেন—

'ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ
অহং মিত্রাবরুণোভাবিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥'

—'আমি একাদশ রুদ্ররূপে পরিভ্রমণ করি, আমিই নিখিল বসুরূপে অধিষ্ঠান করি, আমিই দ্বাদশ আদিত্যরূপে বিচরণ করি, আমিই অখিল সুরবৃন্দরূপে অধিষ্ঠান ক'রে থাকি, এবং আত্মারূপে অধিষ্ঠানপূর্বক মিত্র-বরুণকে, ইন্দ্র-বহ্নিকে এবং অশ্বিনীকুমার-

দ্বয়কে ধারণ করি। আমাতেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অধিষ্ঠিত এবং আমার সত্তাতেই ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা। বহ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-কর্ত্রী মায়া আমাতেই অধিষ্ঠিত'।

এই অনন্তশক্তি মহামায়ার স্বরূপ বর্ণনা ক'রে মেধস মুনি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধীকে মধুকৈটভ-চরিত্রের সত্য বিবরণ প্রদান করলেন। অহমিকারূপী মদ ও মাৎসর্যই মধুকৈটভ নামে রূপকায়িত। এইভাবে তিনি মহিষাসুর, ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ ও শুম্ভ বধের ধারাবাহিক কাহিনী বর্ণনা ক'রে দেবী ভগবতী বা মহামায়ার অনন্য অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়ে তাঁকে ধ্যান করতে নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধী দেবীর কৃপার উদ্দেশ্যে ধ্যানমগ্ন হন এবং অভিপ্সীত ধন লাভ ক'রে কৃতার্থ হন।

করুণাময়ী মহাশক্তি মহামায়ার একান্ত ইচ্ছা ও নিয়মানুবর্তিতায় জন্মজন্মান্তরীণ কর্মভোগের কৌশলরূপ কৃপা দ্বারা যখন জীবের আত্মচৈতন্য উদ্বুদ্ধ হয়, যখন জীব গীতার অমৃতময় উপদেশাবলীতে আকৃষ্ট হ'য়ে তা প্রতিপালন করবার জন্য ব্যাগ্র হয়ে ওঠে, তখনই তার চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশের সুযোগ ঘটে। গীতার দ্বারা মানবজীবন গঠনের সুদৃঢ় ভিত্তি গঠিত হয়, আর চণ্ডীর সাহায্যে সেই ভিত্তির উপর সুদৃশ্য মন্দির গঠনান্তে আত্মময় ও মাতৃময় ভগবৎ পূজার দ্বারা সর্বার্থ সিদ্ধিলাভ হয়ে থাকে। গীতাতে কুরুক্ষেত্ররূপী জীবনযুদ্ধের সূচনা বা উদ্যোগ, আর চণ্ডীতে সেই যুদ্ধেব আরম্ভ, ক্রিয়াশীলতা, পরিণতি ও সিদ্ধি। গীতায় যোগ, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ কীর্তন, আর চণ্ডীতে তার প্রয়োগ-কৌশলাদি আচরণ দ্বারা চতুর্বর্গ ও সচ্চিদানন্দত্ব লাভ। গীতাতে যা শিক্ষা ও শ্রবণ, চণ্ডীতে তারই অভ্যাস-দ্বারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধিপূর্বক আনন্দপ্রাপ্তি। গীতাতে আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী—এই চতুর্বিধ ভগবৎ-উপাসকের পর্যায় উল্লিখিত, আর চণ্ডীতে তাদের বিস্তারিত ভাববিশিষ্ট উদাহরণসহ সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত। গীতাতে শরণাগতির যে অপূর্ব মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে, তা চণ্ডীতে কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত।

প্রথম, মধ্যম ও উত্তম—এই তিনটি চরিত্রে বিস্তারিত হয়েছে চণ্ডী। প্রথম চরিত্রে দেখানো হয়েছে—সাধক তেজস্তত্ত্বের কেন্দ্রস্বরূপ মণিপুরচক্রে আরোহণ ক'রে রিপুজয়ী তেজস্বিরূপে প্রতিভাত হন; মধ্যম চরিত্রে দেখানো হয়েছে—সাধক স্বীয় প্রাণকে উদ্বুদ্ধ ও বিশুদ্ধ ক'রে মহাপ্রাণরূপে পরিণত করেন এবং রজোগুণের সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য বিলয়পূর্বক বিশুদ্ধ হয়ে বিশুদ্ধপদ্মে আরোহণ করেন। প্রথমটি ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ ও মধ্যমটি বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ। উত্তর-চরিত্রে পাই রুদ্রগ্রন্থিভেদ। এখানে কারণাত্মক তমোগুণের সর্ববিধ চাঞ্চল্য ও বীজসমূহ বিনাশ ক'রে সাধক পরমানন্দময় পরমাত্মধাম সহস্রারে গমন করেন—যাকে বলা হয় যোগের ষট্‌চক্রভেদ বা তমোগুণময় রুদ্রগ্রন্থিভেদ, এতে জীবাত্মার বিজাতীয় ভেদ বিলয় হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে একান্তভাবে মিলন হয়। সাধক এখানে ব্রহ্মবিদবর, ব্রহ্মবিদবরীয়ান ও ব্রহ্মবিদবরিষ্ঠ অবস্থা লাভ ক'রে ধন্য হন।—চণ্ডীতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ উল্লেখ করেছেন ঃ চণ্ডীর

প্রথম চরিত্রে কর্মভাব, মধ্যম চরিত্রে জ্ঞানভাব ও উত্তর চরিত্রে ভক্তিভাব অভিব্যক্ত হয়েছে। পরিশেষে মোক্ষ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জীবজগৎ সমস্তই সেই অরূপের রূপ, সেই অসীমের সসীম ভাব—এই প্রকারে ভগবৎতত্ত্ব, লীলা এবং শক্তিরহস্য প্রভৃতি আস্বাদন করাই জীবন্মুক্তি ; আর এই চরমতত্ত্ব অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করাই মোক্ষ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহামুনি মার্কণ্ডেয়র সঙ্গে ব্রাহ্মণকুমার ক্রৌষ্টুকের সংবাদ উল্লিখিত হয়েছে ; এই কারণে এই পুরাণের নাম মার্কণ্ডেয় পুরাণ। অষ্টাদশ পুরাণের গণনায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের স্থান সপ্তম, যথা—(১) ব্রহ্মপুরাণ, (২) পদ্মপুরাণ, (৩) বিষ্ণুপুরাণ, (৪) শিবপুরাণ, (৫) শ্রীমদ্ভাগবত, (৬) নারদীয়পুরাণ, (৭) মার্কণ্ডেয়পুরাণ, (৮) অগ্নিপুরাণ, (৯) ভবিষ্যপুরাণ, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, (১১) নৃসিংহপুরাণ, (১২) বরাহপুরাণ, (১৩) স্কন্দপুরাণ, (১৪) বামনপুরাণ, (১৫) কূর্মপুরাণ, (১৬) মৎস্য-পুরাণ, (১৭) গরুড়পুরাণ, এবং (১৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে অষ্টম মনু সাবর্ণির উৎপত্তিপ্রসঙ্গে দেবীমাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। এই দেবীমাহাত্ম্যই 'দুর্গাসপ্তসতী' বা 'চণ্ডী' নামে প্রসিদ্ধ।

ভাগবতে গোপীগণকে জীবস্বরূপ ও শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দস্বরূপ বলা হয়েছে। গোপী-রূপী জীবের সঙ্গে আনন্দরূপী শ্রীকৃষ্ণের মিলনের দ্বারা মনব-জীবনের পরম লক্ষ্য ব্যক্ত করাই ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। ব্রজলীলায় গোপীগণ ভাগবতলীলাদর্শনে ও আস্বাদনে সত্ত্বগুণান্বিত, সংসারে বাস ক'রেও তাঁরা বিষয়ে অনাসক্ত ও বৈরাগ্যযুক্ত এবং শ্রীভগবানের শরণাগত। চণ্ডীতত্ত্বেও সুরথ ও সমাধি সত্ত্বগুণান্বিত, তীব্র বৈরাগ্যযুক্ত এবং মেধস মুনির শরণাগত। রাসলীলায় শ্রীভগবানের বংশীধ্বনি ও রাসমত্ত-গোপীস্তব চণ্ডীতে ব্রহ্মার স্তবস্বরূপ। ভাগবতের শ্রীরাসে গোপীগণের কৃষ্ণরূপ দর্শন, আর চণ্ডীতে দেবগণের জ্যোতির্ময়ী ভগবতীর রূপদর্শন—এই উভয় দর্শনের সাদৃশ্য একই। 'চণ্ডী'র দেবী মহামায়াই 'ভাগবত'-এর যোগমায়া। দেবী বলেছেন—বৈবস্বত মন্বন্তরে তিনি যশোদার গৃহে অবতরণ করবেন। ভাগবতে তারই স্পষ্ট উক্তি—

'অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥'

দেবতাগণ একসময়ে ভগবতীকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'কাসি ত্বং মহাদেবি !—মহা-দেবি, আপনি কে'? উত্তরে ভগবতী বলেনঃ 'অহং ব্রহ্মরূপিণী মত্তঃপ্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগদুৎপন্নম্। —আমি ব্রহ্মরূপিণী, প্রকৃতি-পুরুষাত্মক জগৎ আমা হতেই উৎপন্ন হয়েছে। বিষ্ণু, শিব ও শক্তি একই পরম তত্ত্বের বিভিন্ন নাম। মুণ্ডমালা-তন্ত্রে বলা হয়েছে—

'যথা শিব স্তথা দুর্গা যা দুর্গা বিষ্ণুরেব সঃ।
অত্র যঃ কুরুতে ভেদং সা নরো মূঢ়দুর্মতিঃ ॥'

অর্থাৎ—যিনি শিব, তিনিই দুর্গা, এবং যিনি দুর্গা, তিনিই বিষ্ণু। এতে যে ভেদ রাখে, সেই দুর্বুদ্ধিজাত মানুষ নিতান্তই মূর্খ।

তেমনি শ্রীদেবীভাগবত গ্রন্থে বলা হয়েছে—

'সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্বদৈব মমাস্য চ।
যোঽসৌ সাঽহমহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ'॥

অর্থাৎ—'আমি ও ব্রহ্ম উভয়েএকাত্ম। যিনি ব্রহ্মা তিনিই আমি, যিনি আমি—তিনিই ব্রহ্ম। যা ভেদ ব'লে মনে হয়, তা ভ্রান্তি দ্বারা কল্পিত'।

ভগবতীর রূপ অসংখ্য। তন্মধ্যে নবদুর্গা ও দশমহাবিদ্যা প্রসিদ্ধ। নব দুর্গা যথা—শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাত্রী। দশমহাবিদ্যা, যথা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ভৈরবী, ধুমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। তন্ত্রশাস্ত্রের সারস্বরূপিনী 'চণ্ডী'র প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে মহামায়াতত্ত্ব। গীতা যেমন মহাভারতের অংশ, চণ্ডীও তেমনি মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ। সম্ভবতঃ তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে চণ্ডী রচিত হয়ে থাকবে। মহামায়া কাত্যায়নাশ্রমে আবির্ভূতা হওয়ায় চণ্ডীতে তিনি কাত্যায়নী নামেও অভিহিতা। এই কাত্যায়নীই ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ভাগবতে কাত্যায়নী দেবীকে চণ্ডীকা, ভদ্রকালী, নারায়নী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। তন্ত্রে এই দেবীর উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে—

'ত্বমাদ্যা পরমাশক্তিঃ সর্বশক্তি-স্বরূপিণী।
তব শক্ত্যা বয়ং শক্ত্যাঃ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদিষু'॥

আবার তাঁরই উদ্দেশ্যে চণ্ডীতে বলা হয়েছে—

'যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদবস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তুয়সে তদা'॥

—'হে দেবি! সর্বত্র জড়-চেতন জগতে যা কিছু আত্মস্থ শক্তি, তা একমাত্র তুমিই।'

এ বিশ্ব হচ্ছে ব্রহ্মরূপা ভগবতী মহাকালীর আবরণ বা বস্ত্রস্বরূপ। শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব পর্যালোচনায় দেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন—প্রলয়কালে বিশ্ব লীন হলে এই দেবীই দিগম্বরা হন। আবার প্রলয়কালে সারা বিশ্ব শ্মশানে পরিণত হ'লে তমোময়ী কালীর বিকাশ হয়। দশবিধ প্রকৃতিশক্তিই দশমহাবিদ্যা, আর দশমহাবিদ্যার সমষ্টিরূপই দশদিকব্যাপিনী দশভূজা চণ্ডিকা। ইনিই সর্বদেবময়ী ও সর্বশক্তিস্বরূপিনী শ্রীশ্রীভগবতী দুর্গা।

সংক্ষিপ্ত সপ্তশ্লোকী চণ্ডী জনসাধারণের ধ্যান ও পাঠের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সাতশত মন্ত্রসমন্বিত পূর্ণাঙ্গ চণ্ডী পাঠ করা অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই দুঃসাধ্য। ক'জন হিন্দুই বা চণ্ডীর গভীরে প্রবেশের আত্মিক প্রেরণা পেয়েছেন? চণ্ডী হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ হয়েও সকল ধর্মাবলম্বীরই উপযোগী গ্রন্থ। বলা হয়েছে—সপ্তশ্লোকী চণ্ডীর যে-কোনো শ্লোক মূল চণ্ডীর প্রতিটি মন্ত্রের আদ্যন্তে উচ্চারণ করা বিধেয়। তাকে পুটিত চণ্ডীপাঠ বলে। মাত্র সাতটি শ্লোকসমন্বিত সপ্তশ্লোকী চণ্ডী। ভাবানুবাদসহ সেই সাতটি শ্লোক প্রসঙ্গতঃ এখানে আমরা প্রণামের দ্বারা ধ্যানে ধারণ করতে পারি। যথা—

'জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি' ॥

—সেই দেবী মহামায়া ভগবতীর এমনই দ্যোতনশীল ও ক্রীড়াশীল শক্তি যে জ্ঞানী-গণেরও চিত্তসমূহ তিনি বলপূর্বক আকর্ষণ ক'রে মোহাবৃত করেন। বিষয়-চিন্তা তখন জ্ঞানীচিত্তকেও বিষয়মুখী ক'রে তোলে। তা থেকে নিবৃত্তি পেতেই মনকে চিৎমুখি ক'রে ঈশ্বরে নিবদ্ধ করতে হয়।

'দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতি মতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়-হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা' ॥

—'হে দেবি! দুঃসময়ে তোমাকে স্মরণ করলে তুমি সকলের ভয় হরণ ক'রে থাকো। সুসময়ে বিবেকিগণ তোমার চিন্তা করলে তুমি শুভ মতি প্রদান করো। হে দারিদ্র্য-হারিণি, হে দুঃখবিনাশিনি, হে ভয়নাশিনি! সর্বজীবের এমন কল্যাণকারিণী, সর্বদা দয়ার্দ্রচিত্তা একমাত্র তুমি ভিন্ন আর কে আছে!'

'সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে' ॥

—'তুমি সর্বমঙ্গলস্বরূপা, মঙ্গলময়ী, তুমি সর্বাভীষ্টসাধিকা, একমাত্র শরণযোগ্যা, ত্রিনয়নী, গৌরী নারায়ণী; তোমাকে প্রণাম'।

'শরণাগত-দীনার্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে' ॥

—'হে দেবি নারায়ণি! তুমি শরণাগত, দীন ও আর্তজনের পরিত্রাণ-পরায়ণা, সর্ব-আপৎনাশিনী, এবং সকলের জন্ম-মরণাদি দুঃখ-হরণকারিণী। তোমাকে প্রণাম'।

'সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে।'

—'হে দেবি। তুমি সর্বস্বরূপা, সর্বেশ্বরী, সর্বশক্তিময়ী, তুমি আমাদের সকল প্রকার ভয় থেকে পরিত্রাণ করো। হে দেবি দুর্গে হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম।'

'রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বমাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বমাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥'

—'হে দেবি। তুমি সন্তুষ্টা হলে সকল প্রকার রোগ ব্যাধি বিনাশ করো, আবার রুষ্টা হলে সকল অভীষ্ট বিনাশ করো। তোমাকে আশ্রয় করলে লোকের কোনো বিপদ থাকে না। যারা তোমার আশ্রিত, তারা অপরেরও আশ্রয়নীয় হয়। কি অনন্য মহিমা তোমার!'

'সর্ববাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্যমস্মদ্‌বৈরি-বিনাশনম্‌ ॥'

—দেবগণ প্রার্থনা করলেন ঃ 'হে অখিলেশ্বরি! আপনি এখন যেমন আমাদের শত্রুর বিনাশ দ্বারা ত্রিভুবনের সকল বাধার প্রশমন করলেন, তেমনি ভবিষ্যতেও করবেন। অথবা, আপনি এখন যেমন আমাদের বৈরিকুল বিনাশ করলেন, তেমনি ত্রিলোকের সর্ববাধা প্রশমিত করুন।'

—'সর্বরূপে মা তুমিই যে বিরাজিতা! এই সত্য সকলকে উপলব্ধি করাও। তোমাকে উপলব্ধি করলেই তোমার সর্ব-জীব-সন্তানের মুক্তি। হে চিরপ্রত্যাশিত মুক্তি, তুমি আমাকেও সর্বগ্লানি থেকে মুক্তি দাও। তোমাকে প্রণাম, তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম।' তোমার অপার মহিমার উদ্দেশ্যে শতকোটি প্রণাম।'

প্রসঙ্গতঃ পরমাণু বিশ্লেষণে যে প্রোটন্‌ ও ইলেকট্রনের সমাহারে এই চৈতন্যময় বিশ্ব আমাদের কাছে প্রকাশিত এবং যাকে আশ্রয় ক'রে পজিটিভ ও নিগেটিভ-এর খেলা চলেছে, বিজ্ঞানসিদ্ধ প্রমাণেও তাকে শিবময় ও শক্তিময় দ্যোতনারূপে গৃহীত হতে বাধা থাকেনি। তন্ত্রমতে একেই বলা হয় 'শিবশক্ত্যাত্মকং জগৎ।' শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ চণ্ডীতত্ত্বের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন—কালের গতিতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান—এই ত্রিবিধ ভাব বিদ্যমান। দেশ ও কাল অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বিজড়িত। পৃথিবী আহ্নিকগতিতে নিজে নিজে একবার ঘুরে আসে ; তার দ্বারাই অহোরাত্র নির্ধারিত হয়। আবার সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে বার্ষিক-গতিতে পৃথিবীর আপন কক্ষে একবার ঘুরে আসার পরিমাণ-কালকেই সম্বৎসররূপে গণনা করা হয়। এতদ্ভিন্ন দেশরূপী পৃথিবীর আহ্নিকগতি দ্বারা লব্ধ অহোরাত্রকে বিভিন্নভাগে বা অনুভাগে বিভক্ত করেই দণ্ড, পল, বিপলাদির উৎপত্তি। সুতরাং দেশ ও কাল একাত্মসম্বন্ধে বিজড়িত। আর পাত্র বা বস্তুসত্তামাত্রই সর্বতোভাবে দেশ-কালের অন্তর্ভুক্ত। এই দেশ-কাল-পাত্রই জগন্মূর্তি ; তা শান্তিময়, মাতৃময় ও ব্রহ্মময়। অতএব—

'প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে।
প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে।

তন্ত্র

মানবজীবনে তন্ত্র এক অনন্য সাধনা। এই সাধনার মধ্যেই মানবজীবনের সর্বাঙ্গীনতা নিহিত। এতে একদিকে সূক্ষ্ম ভোগ ও যোগৈশ্বর্য এবং ইচ্ছাশক্তির বিকাশ, অন্যদিকে সাধকের ব্রহ্মভূমিকায় প্রতিষ্ঠা। তন্ত্রের শিবই একেশ্বরবাদীর ব্রহ্ম। এই শিবের সঙ্গেই শক্তি যুক্ত। শিব ও শক্তি যেখানে অভিন্ন, সেখানেই অদ্বৈতবাদ। সর্বদিক থেকে জীবনকে পূর্ণভাবে পাওয়া এবং এই অনন্ত বিশ্বে জীবনের পূর্ণ স্বীকৃতি ও উদ্বোধনই হচ্ছে তন্ত্র-সাধনার বিশেষত্ব। শক্তিতে জীবন পুষ্ট এবং শিবে জীবনের মুক্তি বা সমাধি, তাই তন্ত্রের মূল উপাস্যই হচ্ছেন শক্তি ও শিব। মানুষের জীবনে যে অনন্ত সম্ভাবনা বীজের আকারে সুপ্ত থাকে, তাকে শাখা-পল্লবে মহীরূহ হ'য়ে উঠতে সাহায্য করে যে বিজ্ঞান-ময় ও প্রাণময় প্রবাহ, তাকেই অনুভূতিতে স্পষ্ট ক'রে তোলে তন্ত্র। তন্ত্রসাধনা তাই জীবনসাধনা। এখানে ধর্মের বিকৃতি বা ভ্রষ্টাচারের কোনো স্থান নেই। যিনি তন্ত্রসাধক বা তান্ত্রিক, তিনি নিঃসন্দেহে এক বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী। সেই বিজ্ঞান মহাপ্রাণকে প্রাণের স্তরে বিধৃত ক'রে লোক ও লোকাতীত সত্তার বিচিত্র রহস্যকে বুদ্ধিতে জাগ্রত করে। সেই জাগরণই কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ, আর তাকে জ্ঞান ও বুদ্ধিতে ধারণাই তন্ত্রের সাধনা। কাম বা কামনা, মোক্ষ বা মুক্তি, যাবতীয় ধর্মোপাসনা, কর্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিমার্গ—সবকিছুরই সমন্বয়-ক্ষেত্র হচ্ছে তন্ত্র। এখানে দেবতাবাদ স্বীকৃত। দেবতা এখানে মন্ত্ররূপী, আর মন্ত্র হচ্ছে ছন্দরূপী; ছন্দই অব্যক্ত শক্তির প্রকাশক ও দেবতারূপে মূর্ত। উপাসনার নানা স্তর ভেদ ক'রে সাধকচিত্ত প্রজ্ঞার শেষ-স্তরে গিয়ে পৌঁছালেই ছন্দময় দেবক্ষেত্রের সন্ধান লাভ করে। এই দেবক্ষেত্রই ব্রহ্মক্ষেত্র বা বৈকুণ্ঠ। সেখানে গিয়ে সিদ্ধিযোগ ঘটলেও উপাসনার বিরতি নেই; এই কারণে তন্ত্রসাধনাকে জীবনের কঠিনতম কৃচ্ছ্রসাধনা বলা চলে। কারণ চিৎশক্তির পূর্ণ বিকাশ না হ'লে স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, আর স্বরূপ উপলব্ধি ভিন্ন শিব ও শক্তিসম্ভূত দেববিভা উপলব্ধি করা যায় না। এই দেববিভাই জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম বোধ। এ সাধনায় যিনি সিদ্ধ, তিনি শুধু নিজেরই মঙ্গল করতে পারেন না, জাগতিক মানবসমাজেরই তিনি মঙ্গলকারক। এখানে শক্তিসঞ্চারে অতিমানসের যেমন বিকাশ ঘটে, তেমনি ধর্মচক্রের ভিত্তিতে হয় অধ্যাত্মশক্তির জাগরণ। তান্ত্রিক-যোগেই মানুষের এই অধিকার জন্মে; সেই অধিকারেই জীবাত্মা ও পরমাত্মায় মিলন।

তন্ত্রশাস্ত্রে নিগম ও আগম উভয়ের কথাই আছে। তত্ত্ববেত্তা পুরুষ এখানে আরোহ ও অবরোহ ক্রমে চেতনার স্তরে সর্ববিষয় উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হন। নানা স্তরের ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধিতে কখনো দ্বৈত, কখনো অদ্বৈত, কখনো বা দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্বের বোধ তন্ত্রশাস্ত্রে উপলব্ধি হয়। এখানে বেদান্তের পথ থেকে তন্ত্রের পথ দূরে নয়, কেবল

দিকচিহ্নের পার্থক্য। বেদান্ত অদ্বৈতজ্ঞানের আকর। অদ্বৈতই তত্ত্ব, দ্বৈত ভ্রান্তি। ভ্রান্তি অজ্ঞানতাপ্রসূত, তার নিরসনেই জ্ঞানসূর্যের প্রকাশ। জ্ঞানগত সংসারনিবৃত্তিই অদ্বৈতবাদের সোপান। যতক্ষণ অজ্ঞান ও অবিদ্যা—ততক্ষণই দ্বৈতাদ্বৈত বোধ, জ্ঞানোন্মেষেই সত্যস্বরূপ একের প্রকাশ। তন্ত্রে শক্তিই প্রধান, সেই শক্তিই সত্যস্বরূপ। শক্তিকে অবলম্বন ক'রে সাধনা করলে সনাতন সত্যে আরূঢ় হওয়া যায়। এই সনাতন সত্যই একমেবাদ্বিতীয়ম। অদ্বৈত-বেদান্ত শক্তিকে অনির্বচনীয়রূপে প্রতিপন্ন করেছে। উভয় ক্ষেত্রেই যোগের সাধনা রয়েছে। তার পথ ভিন্ন হলেও মূলে এক। তন্ত্র প্রধানতঃই যোগ ও উপাসনা-শাস্ত্র। তার লক্ষ্যই হচ্ছে শিবত্বপ্রাপ্তি, শক্তিকে অবলম্বন ক'রেই সেই শিবত্বে গিয়ে পৌঁছানো। এ যেন রক্তচন্দনের গতিশীল বিন্দুর উপর প্রশান্ত শ্বেতচন্দনের বিন্দুকে প্রতিষ্ঠিত করা। সেখানেই প্রকৃতি ও পুরুষের একাত্ম ভাবসম্মেলন; শক্তি ও শিব সেখানে পৃথক ন'ন, একাত্ম, কার্য ও কারণ সেখানে যোগের দ্বারা বিধৃত। সাধক তার সাধনার স্তরে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে যে অনির্বচনীয় জ্যোতিচ্ছন্দের অবিকল্প স্থিতিস্বরূপতায় আচ্ছন্ন হয়, সেইটেই অহংশূন্য আত্মোপলব্ধি। 'বিশ্বসিসৃক্ষায় প্রকাশরূপং ব্রহ্ম স্বকীয়ং শক্তিমবলোকয়িতুং তদভিমুখীভূয় তদন্তস্তেজোরূপেণ প্রবিশ্য শুক্লবিন্দুজাময়তে।'—(বারিবস্যরহস্য)।

তন্ত্রে সদ্বিদ্যা একটি বিজ্ঞান। এই সদ্বিদ্যা হচ্ছে বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত অতিমানস ও অধিমানস জ্ঞানের সমন্বয়। অতিমানস জ্যোতির্লোকে ও অধিমানস প্রসুপ্তিলোকে বিচরণ করে। বলা হয়েছে—পরম রহস্য গুহায় নিহিত ; জ্ঞানালোক সেই চেতনাগুহায় প্রবিষ্ট হলে সকল সৃষ্টিরহস্য অরুণোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় দূরীভূত হয়ে যায়। প্রকৃতি বা জড়বিজ্ঞান, অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও পারমার্থিক বিজ্ঞান এই সদ্বিদ্যার আলোকে বিবেচ্য। ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার বলেন ঃ প্রকৃতিজগতে শক্তির ক্রিয়া বিজ্ঞানের বিষয়। সাংখ্য এই বিজ্ঞানের পূর্ণরূপ দিয়েছে, কিন্তু সাংখ্যের দৃষ্টিতে পরাশক্তির ক্রিয়া পরিস্ফুট নয় ব'লে সাংখ্য-সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানের দৃষ্টি ও দর্শনের দৃষ্টির সমন্বয় হয়নি। তন্ত্রে বিজ্ঞানের দৃষ্টি কিন্তু প্রকৃতিতেই আবদ্ধ হয়নি. প্রকৃতি ও পরাপ্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধহেতু পরাপ্রকৃতির পরিচয় প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এই পরিচয় সদ্বিদ্যায় পরিস্ফুট। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরেই পরাশক্তির জ্ঞানের ও আনন্দের সম্যক পরিচয়। এইভাবে বিজ্ঞান-দৃষ্টির ভিতর দিয়েই অধ্যাত্মদৃষ্টির বিকাশ। এই জ্ঞান ও আনন্দের সূত্র নিয়ে ক্রমশঃ অন্তর্দৃষ্টিতে সদ্বিদ্যার পূর্ণ উন্মেষ তথা অধ্যাত্মজ্ঞানের উদ্বোধন। তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'বৃহৎ তন্ত্রসার' গ্রন্থে যে আগম, যামল ও তন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে, এই ত্রিধারার মধ্যেই সমস্ত বিষয় আবর্তিত। গবেষকদের মতে বেদের কর্মকাণ্ড থেকে নিঃসৃত হয়েছে তন্ত্র। বৌদ্ধযুগে তন্ত্রের মাত্রাধিক বিকাশ ঘটে। বৌদ্ধতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে, তার প্রধান উৎস হিন্দুতন্ত্রনিচয়। তন্ত্রে এমন অনেক পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, গণিত, সংখ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, শারীরবিদ্যা ও শব্দবিজ্ঞান আছে—যা অদ্যাবধি সম্যকভাবে আবিষ্কৃত ও

লিপিবদ্ধ হয়নি। তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ লক্ষণীয় হচ্ছে জপবিজ্ঞান, মন্ত্রবিজ্ঞান ও শব্দ-বিজ্ঞান ; যন্ত্র ও যন্ত্রবিজ্ঞান সেই সঙ্গে যুক্ত। জন উড্রোফের গবেষণাতেও এই সমুদয় বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত। কোথাও বিস্মৃত নয় যে, মহাদেব মহেশ্বরই আদিতন্ত্র-গুরু। মহানির্বাণতন্ত্রেও তার ব্যাখ্যা অপ্রচুর নয়।

তেমনি মহাশক্তির সম্ভূতিই প্রকৃতিজগতে জ্ঞানের, ঐশ্বর্যের, বীর্যের, সামঞ্জস্যের, সৌন্দর্যের ও নিপুণতার বিশালতা প্রতিপন্ন করে। এই সম্ভূতি অনন্তরূপে ক্রিয়াশীল। প্রকৃতির ঊর্ধ্বে এর গতি, প্রকৃতির উপরে মহাশক্তির কর্তৃত্ব এই সম্ভূতির দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। বিশ্বে বিরাট পরিবর্তন, সৌন্দর্যময় সৃষ্টি, কোনো আকস্মিক আবির্ভাব সবই এই সম্ভূতির দ্বারা সম্ভব। সম্ভূতির আধিভৌতিক বিকাশ হয় সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতির ভিতর দিয়ে, আধিদৈবিক বিকাশ সম্ভব হয় দিব্যশক্তির ভিতর দিয়ে এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ হয় অন্তরে দিব্যপ্রেরণা ও দিব্যবিভূতির দ্বারা। এই সম্ভূতির অনন্য রূপই হচ্ছেন মহাশক্তি, মহাকালী। তাঁর কাজই হচ্ছে তমসা বিদীর্ণ ক'রে প্রাণের শক্তি ও গতি সঞ্চার করা ; এই গতিই আলোর গতি, দিব্যভাবের গতি। তিনি মোহ ও স্নেহগ্রন্থি ছেদন ক'রে সাধককে প্রতিষ্ঠিত করেন শিবস্বরূপে। মৃত্যুর ভিতর যে অমৃতের বীজ নিহিত, তা উদ্ঘাটিত হয় মৃত্যুরূপা কালীসাধকের কাছে। এই মৃত্যুরূপা মহাকালীই আবার সঙ্গতি সৌন্দর্য ও সুষমাময়ী মহালক্ষ্মী এবং মহিমান্বিতা প্রজ্ঞাময়ী মহাসরস্বতী। মানবজীবন ও বিশ্বচিত্তের পরিপূরক মহেশ্বরী তিনি। বিজ্ঞানস্তরে তাঁরই সম্ভূতি নিয়ন্ত্রণ করছে জীবজগৎকে। তন্ত্রের মতে জীবত্বের ভিতরেই রয়েছে ঈশ্বরত্বের বীজ। জীবত্বই সঙ্কুচিত ঈশ্বরত্ব। এইজন্য জীবত্বের স্বাভাবিক সম্প্রসারণ ঈশ্বরে। যেমন শক্তির দিক দিয়ে, তেমনি সত্তার দিক দিয়ে এই সম্প্রসারণ ঘ'টে থাকে। তার সাধনাই তন্ত্রসাধনা। তাত্ত্বিক জ্ঞান থেকে প্রতি-ভাসিত জ্ঞানে তার গতি। একদিকে তার পরাজ্যোতি, আর-একদিকে পরাসম্বিৎ। জ্ঞানরাজ্যে এই উভয় অবস্থাই ছন্দিত ও স্পন্দিত। এখানে কালচেতনাও বিশেষভাবে গ্রাহ্য। কালকে অতিক্রম ক'রেই মহাকালে উত্তরণ। এখানে কালই কালী বা শক্তি এবং মহাকালই শিব বা মহেশ্বর। ফিরে ফিরে তন্ত্র তাই শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বই প্রমাণ করে।

আবার ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় অনুভবের সমন্বয় যে দর্শন, সে-দর্শন তন্ত্রনিরপেক্ষ নয়, তন্ত্রযুক্ত। এই দুইয়ের সন্ধিস্থলে রয়েছে রহস্যবাদ। এই রহস্যবাদ ভেদ করাই তন্ত্রের কাজ। স্থূলবুদ্ধিতে তাই বামাচারের ভেলায় ভেসে দৈবাচারের তীরে পৌঁছাবার প্রয়াস। এখানে রতি শক্তিস্বরূপা এবং বিরতি শৈব-প্রশান্তি। সত্তার সর্বস্তরে অলৌ-কিক জ্ঞান-সঞ্চয়ই এর প্রধান উদ্দেশ্য। তার লক্ষ্য হচ্ছে—অন্তরের সকল স্তরের শক্তি ও স্বরূপের জ্ঞান, অধিমানস ও অতিমানস শক্তির বিজ্ঞান এবং এই শক্তির এমন সমাবেশ করা—যাতে বিশ্ববিজ্ঞান ও শিবশক্তি ক্রিয়াশীল হয়। একেই প্রজ্ঞা বা দিব্যজ্ঞান বলে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সঙ্গে তাই রহস্যবাদের নিগূঢ় সম্বন্ধ। অধ্যাত্মবিজ্ঞান

ঈশ্বরের দিকে অন্তর্মুখী আকর্ষণ আর রহস্যবিজ্ঞান তাঁর স্বাভাবিক পরিণতি। অন্যদিকে রহস্যবাদ সৃজনসংবেগে সাধক-শিল্পীকে আনন্দে অভিষিক্ত করে।

সকল সাধনায় যেমন স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের আবরণ উন্মোচনের কথা আছে, তেমনি তন্ত্রে দেহ থেকে বিদেহ এবং বিদেহ থেকে জ্যোতির্দেহ ধারণের কথা রয়েছে। এখানে সাধনার তাই নানা স্তর দেখা যায়। প্রথাগত সেই বিভিন্ন স্তর পেরিয়েই তবে সাধনায় মুক্তি। তন্ত্র তাই জ্ঞানের সকল পরিচ্ছেদ অনুভূতির দ্বারা অধিকৃত করেছে। তাতে জীবন প্রতিস্তরে ও প্রতিদলে জ্যোতিচ্ছন্দে আলোকিত হয়, এক নির্মল জ্যোতিধারায় সত্তার বিভিন্ন স্তরসমূহ অভিষিক্ত হয়। এই সত্তাকে উদ্বুদ্ধ ও উন্মুক্ত করে ছন্দ। যদিও বিভিন্ন স্তরের ছন্দ বিভিন্ন, কিন্তু সকল ছন্দ এক বিরাট ছন্দের আংশিক প্রকাশ। সেই বিরাট ছন্দ হচ্ছে জ্যোতির্ময়স্বরূপ। তন্ত্রসাধনা তাই বিশ্লেষণের সাধনা নয়, ছন্দের সাধনা। তন্ত্র সত্যকে জীবনের ভিতর দিয়ে পেতে চেয়েছে ব'লে এর সাধনা জীবনের সকল স্তরের ভিতর দিয়ে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। একদিকে শব্দছন্দ, আর একদিকে জ্যোতিচ্ছন্দ ; শব্দছন্দ দেয় গতি, আর জ্যোতিচ্ছন্দে সর্বত্র আবরণের উন্মোচন। শব্দছন্দের রূপ আহত ও অনাহত। আহত ছন্দের প্রকাশ মূর্ত, অনাহতের প্রকাশ অমূর্ত। মূর্ত ও অমূর্ত প্রকাশ নিয়েই শব্দসমষ্টি। অনাহত শব্দ ইচ্ছা ও ক্রিয়ারূপী ; কুণ্ডলিনী হতে এই অনাহত শব্দ উৎপন্ন হয়, এবং কুণ্ডলিনী ক্রিয়াশীল হলেই অনাহত নাদের উপলব্ধি হয়। সাধক তখন প্রকৃতির স্থূল গ্রন্থিকে অতিক্রম ক'রে সূক্ষ্মকেও অতিক্রম ক'রে মহাপ্রকৃতির শক্তির ছন্দে আপ্লুত হয়। এই ছন্দসাধনার লক্ষ্য হচ্ছে সাধককে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে রূপান্তরিত করা, তার সত্তাকে শক্তিময় ও জ্যোতির্ময় ক'রে তোলা। সাধক এইরূপে শব্দ ও জ্যোতিচ্ছন্দে মগ্ন হয়ে আপন জীবত্বের ঊর্ধ্বে শিবত্ব অনুভব করে। তার অন্তরের ক্রিয়াশীল অধ্যাত্মবহ্নিতে দেহ-কোষের প্রতিটি রন্ধ্রই জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। অগ্নি, সূর্য ও সোমই হচ্ছে এই অধ্যাত্মবহ্নি। অগ্নি গুহ্য হতে নাভিতে, সূর্য নাভি হতে বিশুদ্ধচক্রে বা কণ্ঠে, সোম বা চন্দ্র কণ্ঠ হতে ঊর্ধ্বে প্রসারিত। এগুলির উত্থানে শুধু সাত্ত্বিকী প্রভা নয়, সত্তার ব্যাপকতার বৃদ্ধি, জ্ঞানের প্রসার। তাকে সাধন দ্বারা স্বরূপে ধরাই তন্ত্রসাধকের লক্ষ্য। তেমনি রূপজগতে বস্তুর ভিতর শক্তির ছন্দ ধীরে ধীরে অরূপকে রূপায়িত ক'রে তোলে। একটিতে শক্তির সাবলীল ক্রিয়া ও ছন্দ, অন্যটিতে শক্তির মহিমময় বিকাশ। শক্তিসাধক রূপচ্ছন্দের ভিতর দিয়ে অরূপে সমাহিত হন। তখন আর সাধকের 'আমি' বা 'অস্মিতা' বোধ থাকে না, সেই বোধ তখন পূর্ণ সমাধিযোগে 'তুঁহু' বা 'অরূপ' হয়ে ওঠে।

মহাশক্তি ভিন্নও তন্ত্রে বিভিন্ন শক্তি ও কলার ব্যবহার আছে। কলা অর্থে অংশ। প্রাথমিক বিন্দুরূপে তার ব্যবহার। কামকলাবিলাসে এই বিন্দুকে নবধা শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যথা—বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, অম্বিকা, পরা, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ও শান্তা। এসব শক্তিবিন্দুর সক্রিয় সাকার প্রকাশ। ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার তন্ত্রালোচনা-

সূত্রে উল্লেখ করেছেন—বামকেশ্বর তন্ত্রে আছে ঃ যখন পরম কলা পরমেশ্বরের সৃজন-স্ফূর্তি দেখতে পান, তখন তিনি পরা-বাক্। যখন তিনি সৃষ্টিবিকাশে মগ্ন, তখন তাঁকে বলা হয় বামা। ক্ষেমরাজ স্বচ্ছন্দতন্ত্রে শক্তির প্রকাশ-বিশেষকে কলা বলেছেন, যথা—সিদ্ধি, দ্যুতি, লক্ষ্মী ও কান্তি ; কিন্তু ষট্চক্রের বিভিন্ন কেন্দ্রনিহিত শক্তিকেও কলা বলা হয়। কুণ্ডলিনীর জাগরণে এসব শক্তি ক্রিয়াশীল হয়, এরা বিভিন্ন স্তরে জ্ঞান দেয়। ষট্চক্রনিরূপণে বিভিন্ন শক্তির কথা বিশদরূপে বর্ণিত আছে। অধ্যাত্ম-শক্তিগুলি আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকের সঙ্গে সমন্বিত। একের উন্মেষে অপরের উন্মেষ। এইজন্য সিদ্ধ-সাধকেরা অতিমানবীয় শক্তির অধিকারী হন। কুণ্ডলিনীর জাগরণ শুধু আরোহ-অবরোহের মানসিক ভাবনার দ্বারাই সম্ভব নয়। মানুষের অধ্যাত্ম-নিয়তির উপর পূর্ণ বিশ্বাস, অধ্যাত্ম-শক্তির উপর পরমশ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণ এবং একে আনন্দ-সহকারে গ্রহণই এ-পথে সিদ্ধির সোপান। অন্তর-বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশ্ববিজ্ঞানের সম্বন্ধেরও স্ফূর্তি হয় কুণ্ডলিনীর জাগরণে। মূলাধার হতে নাভিচক্র, নাভিচক্র হতে কণ্ঠচক্র, কণ্ঠচক্র হতে সহস্রার ঃ প্রথমাংশে প্রাণশক্তি ক্রিয়াশীল, দ্বিতীয়াংশে প্রাণ ও মন ক্রিয়াশীল এবং তৃতীয়াংশে ঊর্ধ্বতর মন ও বুদ্ধি ক্রিয়াশীল। পর্যায়ক্রমিক চেতনার এই উন্মেষই সাধককে তাঁর অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। তন্ত্রে নারীসঙ্গ রয়েছে, কিন্তু নারী এখানে মহাশক্তির চিন্ময় বিগ্রহরূপে উপাস্যা। জীবনবাদ ও মোক্ষবাদ—দুইই তন্ত্রে স্থান পেয়েছে ; দু'য়ের সমন্বয়—জীবন্মুক্তি। বিজ্ঞানালোককে প্রাণকেন্দ্রে নামিয়ে এনে প্রাণের পরিশুদ্ধির দ্বারা প্রাণকে স্বচ্ছ ক'রে সমষ্টির ভিতর একপ্রাণতা প্রতিষ্ঠা করাই তন্ত্রসাধনার লক্ষ্য।

যোগদর্শন

গীতায় পুরুষোত্তম বলেছেন ঃ 'মন সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপর।' অর্থাৎ— 'মনোসংযমপূর্বক মৎপরায়ণ ও মৎগতচিত্ত হও।' তাঁর সঙ্গে যুক্ত হবার সাধনাই যোগ-সাধনা। এই কথাটিই গানের ভাষায় বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঃ 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।' অঙ্কশাস্ত্রের যোগ এবং দর্শনশাস্ত্রের যোগ এখানে একাত্ম। কি ভাবে এই যোগ সহজ হয়? সহজ হয় সংযত চিত্ত, সংযত দেহ, আকাঙ্ক্ষাশূন্য ও পরিগ্রহশূন্য হয়ে চিত্তকে সতত সমাধি অভ্যাসে অভ্যস্ত করে তোলায়। তার জন্য নির্জনতা প্রয়োজন ঃ পারিপার্শ্বিক এবং মানসিক উভয়বিধ নির্জনতা। মনঃসংযোগের জন্য যে আসন আবশ্যক, যোগীর কাছে তাই হচ্ছে যোগাসন। সেখানে 'উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে', সেই আসনে উপবেশন করে মনের একাগ্রতায় আত্মশুদ্ধির দ্বারা যোগাভ্যাস করা কর্তব্য। যোগ হচ্ছে এখানে উপায়, কৌশল বা সাধন। নানা আসনের অনুশীলন শরীরকে ঋজু রাখে। এই অনুশীলন হটযোগেরও এক বিশেষ অঙ্গ। যোগ-ব্যায়ামে এই আসনই নানা ভাগে বিশ্লিষ্ট।

গীতার প্রথম অধ্যায় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত সমস্তটাই যোগ। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনের সেতু হচ্ছে এই যোগ। তখন 'আত্মনা আত্মানং আত্মনি পশ্যন্,' আত্মার দ্বারা আত্মাতে আত্মাকে দেখা সার্থক হয়। এখানে আত্মাই দ্রষ্টা, আত্মাই দৃশ্য; এই দৃশ্যআত্মা আর পরমাত্মা অভেদ। তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়াই যোগীর সাধনা। এই যোগকে সমাধিযোগ বলা হয়। এর আটটি অঙ্গ, যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। যম, যথা—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় বা অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ; অপরিগ্রহ অর্থে দান প্রভৃতি গ্রহণ না করা। নিয়ম, যথা—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় বা শাস্ত্রাদি পাঠ ও ঈশ্বরপ্রণিধান। স্বাধ্যায়ের অপর অর্থ ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ। আসন, যথা—স্বাচ্ছন্দ্যময় ও স্থির সুখাসন। প্রাণায়াম, যথা—রেচক (শ্বাসত্যাগ), পূরক (শ্বাসগ্রহণ) ও কুম্ভক (বায়ু শরীরাভ্যন্তরে ও বাইরে নিরুদ্ধ করা)। প্রত্যাহার, যথা—বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সমূহের বলপূর্বক প্রত্যাকর্ষণ। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, যথা—হৃৎপদ্মে, ভ্রূমধ্যে, নাসাগ্রে বা কোনো দিব্য মূর্তিতে চিত্ত আবদ্ধ রাখা। ধারণার মধ্য দিয়েই ধ্যান ও সমাধি ঘটে। এই সমাধিই যোগের পূর্ণাবস্থা। তখন ব্রাহ্মীস্থিতি। যোগী তখন যোগবলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্তই অন্তরে প্রত্যক্ষ করেন। তখন সর্বত্রই সমদর্শন এবং সর্বভূতে ভগবদ্ভাব ঃ 'ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।' গীতায় পুরুষোত্তমের তাই নির্দেশ ঃ কর্মের মধ্য দিয়ে জীবনযুদ্ধ সংসাধন করো, সেই সঙ্গে জ্ঞানী হও, যোগী হও ও ভক্ত হও। গীতায় তাই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগেরই

প্রাধান্য। এই চতুরঙ্গ যোগের দ্বারাই আত্মমুক্তি বা পরমপদলাভ সম্ভব।

যোগমতে চিত্তবৃত্তির দ্বারা জ্ঞানের প্রণালী এবং চিত্তের উপর প্রতিবিম্ব দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি প্রতিপাদিত হয়। সাংখ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও বেদান্তে অন্তঃকরণবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও যোগের নির্দেশ রয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তির উপর আত্মার প্রতিবিম্বন হ'লে তবেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রতিবিম্বিত আত্মাই বৃত্তি-জ্ঞানের জ্ঞাতা। পাতঞ্জল মতে—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ', অর্থাৎ চিত্তের উপর যা কিছু আধিপত্য বিস্তার করে ও বৃত্তির স্ফুরণ ঘটে, তার নিরোধ বা শাসন চাই। তবেই আত্মার স্বরূপে অবস্থান ঘটে। যিনি আত্মশাসনের ক্ষমতাবর্জিত, তিনি মানুষ নামের অযোগ্য। বৃত্তিগুলি ক্লিষ্ট বা ক্লেশযুক্ত হতে পারে, আবার অক্লিষ্টও হতে পারে। চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার, যথা—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। বিকল্প হচ্ছে নিছক শব্দাশ্রয়ী জ্ঞান। ক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি হচ্ছে ক্লেশযুক্ত। ক্লেশও পাঁচ প্রকার, যথা—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতাই হচ্ছে অবিদ্যা বা অজ্ঞান। অস্মিতা হচ্ছে আত্মা ও চিত্তের অভিন্নতাবোধ, অহংঅভিমান। রাগ হচ্ছে সুখজনক বিষয়ের প্রতি আসক্তি। দ্বেষ হচ্ছে দুঃখজনক বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা। এবং অভিনিবেশ হচ্ছে মৃত্যুভয়। চিত্তের অবস্থা বা স্তর হলো চিত্তভূমি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমন্বয়ে চিত্ত গঠিত। এই গুণত্রয়ের তারতম্য অনুসারে চিত্তে পাঁচ প্রকার অবস্থা হয়, যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। চিত্তের একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থায় সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ঘটে। লিঙ্গশরীরের এই গুণ, কর্ম ও অবস্থাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপাণ, সমান, উদান, ব্যান), বুদ্ধি ও মন—এই সতেরোটি নিয়ে লিঙ্গশরীর গঠিত। শাঙ্করভাষ্যে বলা হয়েছে—শ্রবণ, ত্বক, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও ঘ্রাণ—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আকাশাদি পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ থেকে যথাক্রমে উৎপন্ন হয়েছে এবং উক্ত পঞ্চভূতের সাত্ত্বিকাংশ পরস্পর মিলিত হয়ে সর্বকারণ 'অন্তঃকরণ' হয়েছে।

'তদন্তঃকরণং বৃত্তিভেদেন স্যাচ্চতুর্বিধম্।
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তঞ্চেতি তদুচ্যতে ॥'

অর্থাৎ—সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে চতুর্বিধ, যথা—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। বিজ্ঞানপ্রাচুর্যহেতু ও আত্মার আচ্ছাদনস্বরূপহেতু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে বুদ্ধিকে 'বিজ্ঞানময়কোশ' বলা হয়। এতে সর্বসংসারের জনয়িতা, কর্তৃত্ব ও অহঙ্কারবৃত্তি যুক্ত থাকে। তার দ্বারা জীবাভিমানী পুরুষের অহংরূপ অভিমান ঘটে। তেমনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন 'মনোময়কোশ' হয়, মনের প্রাধান্যহেতু তাকে মনোময়-কোশ বলা হয়। তার বৃত্তি হচ্ছে চিন্তা, বিষাদ, হর্ষাদি ও কামাদি। মন দ্বারা মনন ও বাহ্যফল কামনা করা হয়। পুরুষের বন্ধন ও মোক্ষ এই মন দ্বারাই হয়। আবার আকাশাদি পঞ্চভূতের রজঃ অংশ থেকে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ

—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং ক্রিয়াত্মক প্রাণাদি পঞ্চবায়ু যথা—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান উৎপন্ন হয়েছে। দেহ এই প্রাণেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা নানা প্রকার বিহিত ও অবিহিত কার্যে প্রবৃত্ত হয়। যিনি যত্ন সহকারে 'যম' ও 'নিয়ম'-এ রত থাকেন এবং বিবেকী, তার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে এবং শারীরিক সর্বব্যাধির নিরসন ঘটে। সুতরাং—

'ততো মুমুক্ষুর্ভববন্ধমুক্ত্যৈ
রজস্তমোত্যাঞ্চ তদীয় কার্য্যৈঃ।
বিয়োজ্য চিত্তং পরিশুদ্ধসত্ত্বং
প্রিয়ং প্রযত্নেন সদৈব কুর্য্যাৎ ॥'

মুমুক্ষু পুরুষ সংসারবন্ধন মুক্তির জন্য রজঃ ও তমোগুণাত্মক কার্য থেকে বিরত থেকে নির্মল সত্ত্বসম্পন্ন চিত্তকে যত্নপূর্বক প্রিয়কার্যে নিযুক্ত করবে। জীবাত্মার কাছে পর-মাত্মার কার্যই প্রিয় কার্য। যত্নের সঙ্গে সেই প্রিয়কার্য সাধনই যোগ-সাধনা। জীব-জীবনের নানা ঘাত-সংঘাতে যে গরল ও সংসারবন্ধনহেতু যে রাজসিক ও তামসিক ভাবের সৃষ্টি হয়, তা থেকে মনকে প্রতিহত করে সত্ত্বগুণে চিত্তবৃত্তিকে সংহত করতে হবে।

চিত্তবৃত্তিনিরোধে অভ্যাসের দ্বারা মনঃসংযোগ ও বৈরাগ্য চাই। তজ্জন্য দীর্ঘকালীন সাধনা প্রয়োজন। ক্রমে স্বভাবতঃই মনে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা জন্মাবে। তখন অন্তরের সাধনা বাইরেও অনিবার্য ভাবে অভিব্যক্ত হবে। মানসিক সংবেগ দ্বারা যার যেমন সাধনার যত্ন ও শক্তিপ্রয়োগ, সে সেই প্রকার সিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম হয়। মূলতঃ চাই ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত, তিনি গুরুর গুরু, *পরম গুরু। 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ', তাঁর শ্রেষ্ঠ নামই হচ্ছে 'ওঁ'। তাঁর পরিপূর্ণ স্বরূপ* এই ওঙ্কারের মধ্য দিয়েই সৃষ্টিরূপে বিকশিত হয়। 'ওমিতি ব্রহ্ম'। নামরূপ ধরেই তাঁর স্বরূপতত্ত্বে পৌঁছাবার বিধি আছে। 'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।' প্রশ্নোপনিষদে গুরু পিপ্পলাদ শিষ্য সত্যকামকে বলেন: 'এই যে ওঙ্কার, ইনি পর ও অপর, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম। যিনি ওঙ্কারকে ব্রহ্ম বলে জানেন, তিনি এই আয়তনের বা প্রণবের দ্বারা একতর ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। 'পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম, যদোঙ্কার তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায় তনেনৈকতরমন্বেতি— ।'

কিন্তু নানাবিধ দোষ চিত্তবিক্ষেপ ঘটিয়ে যোগপথের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই দোষসমূহ যথা—ব্যাধি, স্ত্যান বা চিত্তের অকর্মণ্যতা, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য। অবিরতি বা চিত্তের বিষয়তৃষ্ণা, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধ ভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্বানি বা যোগে চিত্ত স্থির ও সন্তুষ্ট না থাকা এবং চিত্তবিক্ষেপাঃ। তদুপরি আছে দুঃখ, দৌর্মনস্য বা ইচ্ছার ব্যাঘাতবশতঃ ক্ষোভ, অঙ্গমেজয়ত্ব বা অঙ্গকম্পন, শ্বাসপ্রশ্বাসাঃ ও বিক্ষেপ-সহভবঃ বা বিক্ষেপের সহচর। এই যাবতীয় চিত্তবিক্ষেপ বা দোষসমূহই 'একতত্ত্বাভ্যাস' বা তন্মনাঃ, তদ্ভক্ত ও তদ্‌যাজী হওয়ায়, অর্থাৎ—ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে কেটে

যায়। প্রাণায়ামের দ্বারাও চিত্তবিক্ষেপ দূর হয়। ক্রমে প্রবৃত্তিসমূহ বিশুদ্ধ ও জ্যোতির্ময় স্বভাবে পরিণত হয় এবং মন উর্দ্ধ স্তরে হ্লাদিনীতত্ত্বে উপনীত হয়ে ভাব-সমাধি ও আনন্দ-সমাধিতে মগ্ন হয়। এই সমাধি অবস্থায় অন্তরে শান্তি ও আনন্দের একটা স্বচ্ছ নির্মল প্রবাহ নিরন্তর প্রবাহিত হতে থাকে। 'তত্র ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাঃ' সেখানেই সিদ্ধজ্ঞানশক্তির প্রকাশ ঘটে। এই বিজ্ঞান শ্রুতি বা অনুমানসাপেক্ষ জ্ঞান নয়, তা নির্মল অপরোক্ষানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই মানুষকে মুক্তি দিয়ে নবজন্ম দান করে। সেই জন্মই সর্ব দোষ, সর্ব সংস্কার ও সর্ব বন্ধনমুক্ত দেবজন্ম। এই জন্ম-প্রত্যাশাতেই পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যোগসাধনা। সাধনসিদ্ধ যোগী তখনই মাত্র বলতে পারেন ঃ 'অহং ব্রহ্মাস্মি।'

জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন

প্রাচীন ভারতীয় সাধনা দু'টি বিপরীত ধারায় প্রবাহিত হয়। একটি বৈদিক ধারা, তাব মধ্যে ছয়টি দর্শন প্রধান ; যথা—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত। এবং অপরটি অবৈদিক ধারা, তার মধ্যে তিনটি দর্শন প্রধান ; যথা—জৈন, বৌদ্ধ ও চার্বাক। প্রথম ছয়টি দর্শন আস্তিক্য এবং দ্বিতীয় তিনটি দর্শন নাস্তিক্য দর্শনরূপে খ্যাত। আস্তিক্যে ঈশ্বরবাদ এবং নাস্তিক্যে নিরীশ্বরতা। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে এই নয়টি দর্শনেরই প্রভাব ভারতীয় সমাজে ও চিন্তায় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিই এই দর্শনসমূহে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। এদেব মধ্যে জড়বাদী চার্বাক দর্শনকে ভারতীয় সমাজ অধিকভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। বাকী আটটি দর্শন, তাদের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য ও আপাত-বিরোধ থাকলেও, মূল লক্ষ্যে প্রায় সহযাত্রী। চরম সত্যে উপনীত হওয়া এবং পরমপদ লাভ করাই প্রতিটি দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরম পুরুষার্থলাভে যে যে মত, পথ ও সাধনপ্রণালী ভারতীয় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে সাংখ্য, যোগ, জৈন, বৌদ্ধ ও বেদান্ত মতই প্রধান। যদিও হিন্দুসমাজ প্রধানতঃ বৈদিক প্রথাকেই গ্রহণ করেছে, তথাপি জৈন ও বৌদ্ধ মতের প্রবল প্রভাবকেও কোনোক্রমে অতিক্রম করতে পারেনি। জৈন মত ও ধর্ম এক বিশেষ সাধনাঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঋষভদেব-প্রবর্তিত এই ধর্ম বহু প্রাচীন। আত্মতত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব ও মোক্ষতত্ত্ব যেমন হিন্দুধর্মের সাব কথা, তেমনি কর্মবাদ ও নীতিতত্ত্ব হচ্ছে বৌদ্ধমতের মূল। জৈনদর্শনের সঙ্গে যেমন উদারভাবে হিন্দু-ষড়দর্শনের সারতত্ত্ব মিশে গেছে, তেমনি মিশে গেছে বৌদ্ধধর্মের মূল সাধনা। 'জিন' অর্থে বলা হয়েছে ঃ 'রাগদ্বেষাদি দোষান্‌ বা কর্মশত্রূন্‌জয়তীতি জিনঃ' ; অর্থাৎ—যিনি রাগ দ্বেষ জয় ক'রে অহিংস ও তত্ত্বজ্ঞানী হন, তিনিই প্রকৃত জৈন। বৈদিক ধর্মেও অহিংসাবাদ রয়েছে, কিন্তু তা বহির্মুখে প্রয়োগে সচরাচব সংযত নয়। জৈন ও বৌদ্ধধর্মে এই অহিংসাবাদ অন্তর্মুখে ও মহির্মুখে একইভাবে প্রকটিত। বেদবাদেব সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রেও জৈন ও বৌদ্ধমত ভারতীয় প্রথা ও আদর্শের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা ক'রে চলেছে। জৈনমত মোক্ষত্বে পৌঁছেচে আত্মতত্ত্ব পথে, আর বৌদ্ধমত কেন্দ্রগামী হয়েছে শূন্যবাদে। যোগী ও সহজিয়া-ভাবতন্ত্রে জৈনসাধনার নানা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'জীব' ও 'অজীব' অর্থে চেতন ও জড় বুঝায় ; জৈনদর্শনে এই উভয়ই স্বীকৃত এবং উভয়ই পরিণামী। কিন্তু সাংখ্যে পুরুষকে অপরিণামী ও প্রকৃতিকে কেবল পরিণামী বলা হয়। আবার জৈনদর্শন যেখানে প্রত্যেক আত্মাকে পৃথক ও তাদের সংখ্যাকে অনন্ত বলে, সেখানে সাংখ্য প্রত্যেক পুরুষকে পৃথক সত্তা ও তাদের সংখ্যাকে বহুত্ব স্বীকার করে। কিন্তু এই উভয় দর্শনই আত্মা ব্যতীত অন্য কোনো সর্বব্যাপী ও সর্বনিয়ন্তা সত্তা স্বীকার করে না।

পূরণচাঁদ কর্তৃক জৈনদর্শনের ব্যাখ্যানুসারে সাংখ্যদর্শনে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকেই জড়দ্রব্যের একমাত্র মূল স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু জৈনদর্শনে আকাশাস্তিকায়, ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, পুদ্‌গলাস্তিকায়, বা পরমাণু ও কাল—জড়পদার্থের এই পাঁচ প্রকার পৃথক ও নিত্য সত্তা স্বীকৃত হয়েছে। ধর্ম ও অধর্মাস্তিকায়—এই দু'টি দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার জৈনদর্শনের বৈশিষ্ট্য। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনেও আকাশ ও কালকে নিত্য দ্রব্যরূপে স্বীকার করা হয়েছে ; জৈনদর্শনের দ্রব্যের লক্ষণের সঙ্গে তা সমানার্থক। কর্মবাদ জৈনদর্শনে এক বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। কর্ম কিভাবে আত্মার সঙ্গে লিপ্ত হয় ও ফল প্রদান করে, জৈনশাস্ত্রে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কর্ম দুই প্রকার ঃ ভাবকর্ম ও দ্রব্যকর্ম। জীব যে কোনো মানসিক, কায়িক বা বাচিক কর্ম করে, তারই ফলস্বরূপ দ্রব্যকর্ম আকৃষ্ট হয়ে আত্মার সঙ্গে বদ্ধ হন ব'লে এই বিশেষ জড়পদার্থকে কর্ম নামে অভিহিত করা হয়। জৈনদর্শনে অমূর্ত আত্মা ও মূর্ত কর্মের পরস্পর সম্বন্ধের প্রবাহকে অনাদি ব'লে স্বীকার করা হয়েছে।

প্রধানতঃ মূল পাঁচটি কাণ্ডে জৈনদর্শন রূপায়িত। যথা—দ্রব্য, নয়বাদ, স্যাদ্বাদ বা অনেকান্তবাদ, কর্মবাদ এবং গুণস্থান ক্রমারোহ। দ্রব্য পাঁচটি সংজ্ঞায় গঠিত, যথা—লোক ও অলোক ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্‌গলাস্তিকায়, জীবাস্তিকায় ও কাল। নয়বাদের চারটি অধ্যায় ; যথা—নৈগম, সংগ্রহ, ব্যবহার, ঋজুসূত্র, শব্দ, সমভিরূঢ়, এবম্ভূত এবং নিশ্চয় ও ব্যবহার। প্রত্যেকটিই নয়যুক্ত। পূরণচাঁদের ব্যাখ্যানুসারে—'নয়' শব্দের সাধারণ অর্থ বিচার। কোনো এক বিষয় বা বস্তুর স্বভাব বা পর্যায় নিরূপণ করবার জন্য বিশেষ বিশেষ অপেক্ষার সঙ্গে বিচার করাকে 'নয়' বলে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা সাপেক্ষ বিচারসমূহে যে আপাত বিরোধ দৃষ্ট হয়, সেই বিরোধের মধ্যে সমন্বয়ের মূল অনুসন্ধান করবার শাস্ত্রকে নয়বাদ নামে অভিহিত করা হয়। স্যাদ্বাদ বা অনেকান্তবাদে রয়েছে সপ্তভঙ্গী। 'স্যাদ্বাদমঞ্জরী'তে বলা হয়েছে ঃ 'একত্র জীবাদৌ বস্তুনি একৈক-সত্ত্বাদি-ধর্ম-বিষয়-প্রশ্নবশাদ-বিরোধেন প্রত্যক্ষাদি-বাধা-পরিহারেণ পৃথগ্‌ভূতয়োঃ সমুদিতয়োশ্চ বিধিনিষেধয়োঃ পর্যালোচনয়া কৃত্বা স্যাচ্ছব্দলাঞ্ছিতো বক্ষ্যমাণৈঃ সপ্তভিঃ প্রকারৈর্বচনবিন্যাসঃ সপ্তভঙ্গীতি গীয়তে।' কোনো পদার্থের সর্বাঙ্গীন জ্ঞানলাভ করতে হলে সপ্তভঙ্গীর দ্বারাই তা সাধিত করতে পারে। স্যাদ্বাদ একই বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টির দ্বারা বিচার ক'রে সেই বস্তুর বিভিন্ন গুণ প্রকট করে এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করে—যাতে তাকে সর্বপ্রকারে বুঝতে পারা যায়। ভারতীয় অদ্বৈতবেদান্তে ব্রহ্মের একত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, বৌদ্ধশাস্ত্রে একত্বকে অগ্রাহ্য ক'রে পরিবর্তনশীলতা স্বীকৃতিলাভ করে। জৈনরা অদ্বৈত বেদান্তকে ব্রহ্ম-একান্তবাদ ও বৌদ্ধমতকে ক্ষণিক-একান্তবাদ ব'লে অভিহিত করেছেন। এই বেদান্ত ও বৌদ্ধমতকে অতিক্রম ক'রে জৈন-অনেকান্তবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কর্মবাদ আটটি সর্গে বিভক্ত ; যথা—কর্ম শব্দের

অর্থ, কর্মবন্ধের কারণ, প্রকৃতিবন্ধ, স্থিতিবন্ধ, রসবন্ধ, প্রদেশবন্ধ, অবস্থা ও করণ এবং বন্ধহেতু। মোট চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণস্থান ক্রমারোহ নিষ্পন্ন হয়েছে। কর্মাবিরণ যখন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়, আত্মা তখন পূর্ণ শুদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়। যে প্রক্রিয়ায় এটা ঘটে, তাকেই প্রধানতঃ গুণস্থান সমারোহ বলা হয়ে থাকে। গুণস্থান শব্দের অর্থ গুণ বা আত্মিক শক্তি ও তার বিকাশের ক্রমিক অবস্থা ; একে আত্মিক বিকাশের ভূমিকা বলা যায়। এই ভূমিকাগুলি যেন মুক্তিরূপ সৌধের সোপানাবলীর ন্যায়—যাতে ক্রমান্বয়ে আরোহন ক'রে মুক্তিসৌধে উপনীত হওয়া যায়। এই কারণে গুণস্থান সমূহকে গুণস্থান-ক্রমারোহ বলা হয়ে থাকে।

জৈনশাস্ত্রে প্রত্যক্ষতঃ ঈশ্বর স্বীকৃত নন্। বৌদ্ধমতেও তাই। জৈনশাস্ত্রে যে পঞ্চ-মহাব্রত ও ত্রিরত্নের উল্লেখ আছে, তা শুধু বেদগ্রাহ্য শাস্ত্রাবলীতেই নয়, বৌদ্ধ এবং বিশ্বশাস্ত্রমাত্রেই তা বর্তমান। যথা—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় বা চৌর্যবৃত্তির নিবৃত্তি, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ বা ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ। তেমনি ত্রিরত্ন হচ্ছে--সম্যগ্ দর্শন, সম্যগ্ জ্ঞান ও সম্যগ্ চারিত্র। বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রেও এগুলি বিশেষভাবে বর্তমান। জৈনশাস্ত্র বলে : পার্থিব জীবনে মোক্ষলাভ অনেকেরই হয় না, কিন্তু সকলের জীবনে পূর্ণত্বের আদর্শ উজ্জ্বল বিভায় জাগ্রত থাকা উচিত। জগতে যাঁরা মুক্তাত্মা পুরুষ, প্রত্যেকের উচিত আলোকবর্তিকাস্বরূপ তাঁদের অনুসরণ করা। জীবনে দুঃখ-কষ্টকে তিতিক্ষা বা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সহ্য ক'রে নিতে হবে ; ভাগ্যের দোহাই দিয়ে স্বীয় প্রযত্নকে অস্বীকার করা মিথ্যে। মনে রাখতে হবে যে, ক্ষুদ্র থেকেই বৃহৎ হয়, মনুষ্যজন্ম পরিগ্রহ ক'রে নিজেকে কখনো ক্ষুদ্র জ্ঞান করা উচিত নয়। আত্মাই সর্বপ্রধান, এই আত্মাই পরমাত্মায় পর্যবসিত হয়। এ থেকে প্রেরণালাভ করাই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা। কারণ পূর্ণতালাভে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে। মুনী না হ'তে পারলেও প্রত্যেকে শ্রাবক শিষ্য হতে পারে। আমি বেশী বুঝি এবং অপরাপেক্ষা আমি বেশী জানি, এ মনোভাব সর্বদা পরিত্যাজ্য।

পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মীয় শাস্ত্রেই এই নীতিসমূহের বিশেষ স্থান আছে। জৈনশাস্ত্র সুপ্রাচীন। এদিক থেকে জৈনপ্রবর্তিত শাস্ত্র ও দর্শনের প্রভাব অপরাপর শাস্ত্রের উপর নিপতিত হওয়া অসম্ভব নয়। আসলে আত্মজয় ক'রে নিজেকে ভূমার সঙ্গে সম্মিলিত করাই মূল কথা। সেখানে ঈশ্বর নামীয় কোনো সত্তার অবস্থিতির কোনো প্রশ্ন নেই। জৈনদর্শনে পদার্থজগতে পরিবর্তন ও গতি এবং জীবজগতে বৃদ্ধি ও অগ্রগতি স্বীকৃত ; জৈনরা তাই কালসত্তার উপর জোর দিয়ে কালের বাস্তব সত্যকে গ্রহণ করেছেন, এবং মনুষ্যজীবনই তাঁদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কারণ মানুষই একমাত্র যোগসাধনে সমর্থ এবং একমাত্র যোগসাধনই বন্ধনশৃঙ্খল ভঙ্গ ক'রে মুক্তি আনতে পারে। তপশ্চর্যার দ্বারা জীবাত্মা বিভিন্ন স্তরে আরূঢ় হয়ে অধিকতর শুদ্ধতা লাভ করে এবং পরিশেষে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য ও পরিপূর্ণতার এমন এক অবস্থায় পৌঁছায়—যেখান থেকে আর তাকে ফিরতে হয় না। হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রও এই

মতবাদের পরিপোষক। তাদের সঙ্গে বহুক্ষেত্রে স্বকীয় নীতির মিল রক্ষা ক'রেও জৈনশাস্ত্র যে-যে ক্ষেত্রে আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে, তা তার অনুশাসনের বিভিন্ন সূত্রগুলির মধ্যে বিস্তৃতভাবে স্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। কোথাও তা পরবর্তীকালের দার্শনিক তত্ত্বসমূহের উপর পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, কোথাও বা তাদের পাশাপাশি চ'লে আপন স্বাতন্ত্র্যে ভারতের মূল প্রাণসত্তার সঙ্গে অত্যন্ত সহজে মিশে গেছে। বেদপুরুষ ঋষভদেব থেকে শুরু ক'রে মহাবীর পর্যন্ত চতুর্বিংশ তীর্থঙ্করের আবির্ভাব ও তিরোভাবের মধ্যে সময়সীমা দীর্ঘব্যাপ্ত। মহাবীর তথাগত বুদ্ধের সমকালীন হয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর আয়ুর সীমা ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৯ থেকে ৫২৭ পর্যন্ত। তাঁর পূর্বাচার্য পার্শ্বনাথ জীবিত ছিলেন তারও ২৫০ বছর পূর্বে। তাহলে জৈনধর্মের প্রথম পুরুষ ঋষভদেব থেকে বিচার করলে দেখা যায়—বৈদিক ধর্মের পাশাপাশি জৈনধর্ম ও দর্শন কিভাবে নানা যুগের নানা উত্থান-পতনকে অতিক্রম ক'রে অহিংসার পথে জীবাত্মার মুক্তির বাণী শুনিয়ে সুপ্রাচীনতার অধিকার নিয়ে আজও ভারত-সংস্কৃতির এক অন্যতম অঙ্গ হ'য়ে গৌরবের সঙ্গে টিকে আছে!

॥ দুই ॥

বৌদ্ধ অনুশাসনে প্রধানতঃ তিনটি প্রাথমিক বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যথা—সর্বশ্রেণীর পাপ বর্জন, কুশল কর্মাদির অনুষ্ঠান ও চিত্তের নির্মলতা সাধন।—

'সব্ব পাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা।
সচিত্তপরিযোদানং একং বুদ্ধানসাসনং ॥'

বেদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে তাঁর মহিমা কীর্তন করেছেন, কিন্তু বুদ্ধের সাধনায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুল্লিখিত। ঋগ্বেদ বলেছেন—

'অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বমুত্তিষ্ঠত প্রতরতা সখায়ঃ।
অত্রা জহাম যে অসন্নশেবাঃ শিবাম্বয়মুত্তরেমাভি বাজান্ ॥'

অর্থাৎ—'প্রস্তরসংকুল জীবন-নদী বয়ে চলেছে, বন্ধুগণ! সংহত শক্তিতে অগ্রসর হও, উচ্চশির হয়ে দাঁড়াও, নদী উত্তীর্ণ হও। যারা অকল্যাণপন্থী, তাদের সকলকে ত্যাগ ক'রে আমরা এই নদী উত্তীর্ণ হয়ে কল্যাণময়ী শক্তি লাভ করবো।'

বুদ্ধদেব তেম্নি বললেন—

'অভিত্থরেথ কল্যাণে পাপা চিত্তং নিবারয়ে।
দন্ধং হি করতো পুঞ্ঞং পাপস্মিংরমতী মনো ॥'

অর্থাৎ—'কল্যাণলাভের জন্য তোমরা অতিত্বরায় ধাবমান হও; পাপ থেকে মনকে নিবৃত্ত করো। আলস্যের সঙ্গে পুণ্যকর্ম করলে মন পাপে রত হয়ে থাকে।'

একেবারেই জীববাদী প্রশ্ন। এই নৈতিক অভিধার কাছে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক। বৌদ্ধবাদ এখানে সাংখ্যেরই সমধর্মী। সাংখ্যের 'কৈবল্য' ও বুদ্ধের 'নির্বাণ' একই বস্তু। বেদ-বিদ্যার মধ্য দিয়েই বুদ্ধদেব বেদকে অতিক্রম ক'রে প্রবেশ

করলেন মানুষের অন্তর্লোকে। যেখানে তার দুঃখ-লাঞ্ছনা-হাহাকার, যেখানে তার জরা-ব্যাধি-শোক, যেখানে প্রাত্যহিক দাবদাহে মানুষের প্রাণচেতনা দগ্ধীভূত, যেখানে লোভ ও নিষ্পেষণ, অশান্তি ও অসাম্য—মানুষের সেই সাধারণ জীবনের মর্মকোষে প্রবেশ ক'রে বুদ্ধদেব শোনালেন শান্তির ললিতবাণী। তাঁর চতুরার্য সত্য ও অষ্টাঙ্গিক আর্যমার্গে এই বাণীই উদ্গীত। চতুরার্য সত্য হচ্ছে—(ক) দুঃখ, (খ) দুঃখের কারণ, (গ) দুঃখের নিরোধ, এবং (ঘ) দুঃখ নিরোধের উপায়। অর্থাৎ—(ক) জন্মে দুঃখ, জরা-ব্যাধি-মৃত্যুতে দুঃখ, অপ্রিয়ের মিলনে দুঃখ ও প্রিয়ের বিচ্ছেদে দুঃখ; (খ) তৃষ্ণা থেকে দুঃখের উৎপত্তি; (গ) তৃষ্ণার নিবৃত্তিতে দুঃখের নিরোধ; এবং (ঘ) এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আটটি—যা অষ্টাঙ্গিক আর্যমার্গ। তা হচ্ছে—(১) সম্যক দৃষ্টি, (২) সম্যক সঙ্কল্প, (৩) সম্যক বাক্, (৪) সম্যক কর্মান্ত, (৬) সম্যক আজীব, (৬) সম্যক ব্যায়ান, (৭) সম্যক স্মৃতি, এবং (৮) সম্যক সমাধি।

যা সমাধি, তাই নির্বাণ। নিবৃত্তিসূচক নির্বাণই বৌদ্ধদর্শনের সারমর্ম। যিনি সুখে-দুঃখে-নিন্দায়-প্রশংসায়-অনুরাগে-বিরাগে সর্বাবস্থায় সমভাবযুক্ত, তিনিই প্রকৃত নিবৃত্তিময় পুরুষ। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৬ সূক্তেও অনুরূপ উপদেশ পাই, যথা—

'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥'

বুদ্ধানুসরণে—সংসারে যারা বৈরী, তাদের মধ্যে বৈরহীন হয়ে আমরা সুখে জীবন যাপন করবো; যারা বিদ্বেষভাবাপন্ন, তাদের মধ্যে আমরা বিদ্বেষবিসর্জিতচিত্তে বিচরণ করবো; সংসারের আতুরগণের মধ্যে আমরা ক্লেশহীন সুখীজীবন যাপন করবো; এবং আসক্তিপরায়ণ মনুষ্যগণের মধ্যে আমরা অনাসক্ত হৃদয়ে জীবনের দুস্তর পথ অতিক্রম ক'রে চলবো।

এই হচ্ছে নিবৃত্তির পথ, শান্তির পথ। কামনা-বাসনা, নিন্দা-প্রশংসা প্রভৃতির সমাধির উপর জীবনের যে মহত্তর বনিয়াদ রচিত হয়, সেই বনিয়াদই প্রকৃত শ্রোতার পরিপোষক। প্রেয় ছেড়ে শ্রেয়কে না ধরলে জীবনের মুক্তি নেই। এই মুক্তিই মোক্ষ বা নির্বাণ।—

'নির্বাণং নিবৃত্তি বৃত্তং নির্বানঞ্চ ন লভ্যতে।
অপ্রবৃত্তিসু ধর্মেসু যথা পশ্চা তথা পুরে ॥'

তাই ব'লে কর্ম করবো না, জড়ত্বপ্রাপ্ত হয়ে অবিদ্যা-আশ্রিত মনে নিজের মধ্যে নিজে বিনষ্টি রচনা করবো—একথা বুদ্ধদেবের কথা নয়। বৌদ্ধধর্মে হীনযান, মহাযান, তন্ত্রযান বা কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়গত স্তরের উৎপত্তি ও মতবাদের বৈষম্য পরিলক্ষিত হ'লেও বৌদ্ধধর্মের মূল কথা হচ্ছে—নিরাসক্ত চিত্তে কর্ম সংসাধন। বুদ্ধদেব বললেন—

'সুন্নাগারং পবট্ঠিস্‌স সন্তচিত্তস্‌স ভিক্‌খুনো।
অমানুসী রতী হোতি সম্মাধম্মং বিপস্‌সতো ॥'

অর্থাৎ—'যিনি শূন্যাগারে প্রবেশ করেছেন, অথবা আসক্তিশূন্য হয়েছেন, যিনি শান্তচিত্ত ও ধীমান এবং ধর্মের প্রকৃত রূপ অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি অমানুষী রতি বা দিব্য আনন্দলাভ করেন।'

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণও পার্থকে তেমনি বলেছেন ঃ যেসব মূর্খ ব্যক্তিরা বেদবাদে অনুরক্ত হয়ে বেদবিহিত ক্রিয়াকর্ম ব্যতিরেকে আর কিছু নেই—এরূপ অসার্থক বাক্যের অবতারণা করে, এবং যারা কামাত্মা স্বর্গপরায়ণ, জন্মকর্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্যপ্রধান, ক্রিয়াবিশেষ-সমন্বিত, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ক'রে ভোগৈশ্বর্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে অপহৃত-চিত্ত হয়, তাদের সামাজিক ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধি সমাধিযোগ্য হয় না, তারা মোক্ষলাভের অনধিকারী। বেদসকল ত্রিগুণবিষয়ক কর্মফল-সম্বন্ধ-প্রতিপাদক ; তুমি ত্রৈগুণ্যরহিত নিষ্কামী, নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যশুদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞানী, অবিষয়ী ও অনাসক্ত হও। নিষ্কাম কর্মেই তোমার অধিকার হোক, ফলে যেন তোমার আসক্তি না জন্মে, সকামকর্মে যেন তোমার আসক্তি না হয়।

উপনিষদ বললেন ঃ 'তেন ত্যাক্তেন ভুঞ্জিথা', ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো। সেই ভোগই মানবিক ভোগ। বৌদ্ধধর্মেও এই মানবিকতারই জয়গান। এই ত্যাগ ও নিবৃত্তিসূচক নির্বাণের উপরই নির্ভর করে জাগতিক কল্যাণ ও ঋদ্ধি। সেইসঙ্গে বুদ্ধদেব বললেন ঃ সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবন সকলেরই প্রিয়। অতএব নিজের ন্যায় ভেবে অপর কাউকেও হত্যা করবে না বা আঘাত করবে না। ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করবে, কৃপণকে দান দ্বারা জয় করবে, এবং মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করবে। বাক্যে সংযত ও চিত্তে সংযত থাকবে। শরীরের দ্বারা কোনো অপবিত্র কর্ম করবে না। এবং 'আত্মদীপো ভবঃ', আত্মদীপ হও, আপন আলোকে আপন পথ চিনে চলো।

সর্বপ্রকারের সংস্কারমুক্ত পুরুষ ছিলেন বুদ্ধদেব। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের তিনিই প্রবক্তা। কিন্তু জোর ক'রে নিজেকে তিনি কোথাও প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। তিনি জানতেন—মানুষ ও জগতের জন্য শেষপর্যন্ত থাকবে একমাত্র 'সত্য'। এই সত্যই হচ্ছে পূর্ণজ্ঞান বা বোধি, ধর্ম ও সঙ্ঘম্। সকলের যেখানে সার্বভৌম সম্মেলন, সেই তো সঙ্ঘ ; আর সকলকে নিয়ে একত্রে চলাই ধর্মের চলা। সকলের মধ্যে যে বোধির জাগৃতি, সেই তো বোধিসত্ত্ব। সেই মহাবোধির ঐক্যমন্ত্র তুলে একদা ঋগ্বেদ বলেছেন ঃ 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম। সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী।'

বুদ্ধদেবের বাণীও ঐক্যের বাণী। সেখানে কোনো বিরাগ, বিরোধ বা বিচ্ছিন্নতার স্থান নেই। তিনি 'মহাশান্তি মহাক্ষেম, মহাপুণ্য মহাপ্রেম।' তাঁর লীলাচরণের প্রাথমিক সূত্রেই বলা হলো—

'পানং ন হানে' ঃ প্রাণীকে হত্যা করবে না।
'ন চ দিন্নমাদিয়ে' ঃ যা তোমাকে দেওয়া হয়নি, তা নেবে না।
'মুসা ন ভাসে' ঃ মিথ্যে কথা বলবে না।
'ন চ মজ্জপো সিয়া' ঃ মদ খাবে না।

এ যেন উপনিষদেরই উক্তি ঃ 'মা মা হিংসীঃ',—হিংসা কোরো না, বিনাশ কোরো না সৃষ্টিকে। বুদ্ধদেব তেমনি বললেন ঃ 'প্রেমের দ্বারা বিশ্বকে রক্ষা করো, প্রীতির দ্বারা সকলের সঙ্গে সংযুক্ত হও।' বুদ্ধদেবকে তাই বলা যায়—Saviour of Democratic Sociolism and Prophet of Communism বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের ঋষি। কারণ তাঁর কণ্ঠেই একদিন উদ্‌গীত হয়েছে আব্রহ্ম মৈত্রী স্থাপনের বাণী।—

'মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং ॥'

অর্থাৎ—'ঊর্ধ্বে নিম্নে সর্বদিকে সমগ্র পৃথিবীর প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।'

অন্যত্র তাঁর উপদেশে বলা হয়েছে ঃ অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মনের যে প্রকৃতি, নিবৃত্তিরও সেই প্রকৃতি এবং তজ্জন্য উভয়ে পরস্পরসাপেক্ষ। সাত্ম প্রকৃতি ব্রহ্মসাপেক্ষ প্রকৃতি। আত্মা ও ব্রহ্ম নির্বাণের সঙ্গে অনপেক্ষ প্রকৃতি।—এই নিবৃত্তিই তথাগতের অপরোক্ষানুভূতি, স্বয়ং দৃষ্ট ও প্রত্যক্ষীভূত ধর্ম। বস্তুতঃ, আত্মা ও অনাত্মা—এই উভয়ের মাঝখানে যে বিজ্ঞান সন্ততিবাদ, বুদ্ধদেব তাই গ্রহণ করেছিলেন। সন্ততিবাদে আত্মা অনাত্মা উভয়কেই বুঝায়।

'দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্বা বুদ্ধানং ধর্মদেশনা,
লোক সংবৃতি সত্যঞ্চ, সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ।'

সন্ততিবাদকে বলা হয়েছে আত্মা ও অনাত্মার মধ্যবিন্দু। ব্যবহারিক আত্মা গ্রহণ না করলে যেমন পরমার্থ সন্ততিবাদ দেশনা করা সম্ভব নয়, তেমনি পরমার্থজ্ঞান না হলে নির্বাণ অধিগমও সম্ভব নয়। তাই বলা হয়েছে—

'ব্যবহারমনাশ্রিত্বা পরমার্থ ন দেশ্যতে,
পরমার্থমনাগম্য নির্বাণং নাধিগম্যতে।'

কিন্তু যে ব্যক্তিচেতনাকে আশ্রয় ক'রে বৌদ্ধধর্ম নতুন রূপ পেলো, তা হচেছ বুদ্ধদেবের ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রজ্ঞার সাধনা। কিসে জীবের কল্যাণ হবে, কোন্ পথে মানুষ জরা-ব্যাধি-মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাবে, কিভাবে আসবে মানুষের মধ্যে শান্তি ও সাম্য—এই সাধনায় ব্রতী হলেন বুদ্ধদেব। বৌদ্ধপ্রবর্তিত পালিগ্রন্থ 'অভিধর্মকোষ', 'ধম্মপদ', 'মহাবগ্‌গো' প্রভৃতির মধ্যে বুদ্ধদেবের সেই সাধন-মন্ত্রই নিহিত।—বৃহত্তর এশিয়ার যে মহাবৌদ্ধচেতনা, তার পিছনে রয়েছে বুদ্ধের মহা প্রেমিক মনের সর্বাত্মক কল্যাণধর্ম। অনাগারিক ধর্মপালের মতে তা বস্তুতঃ জড়বাদী নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের প্রণালী মাত্র নয়। তা শূন্যবাদও নয়, আবার 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'বাদও নয়, তা অদ্বৈতবাদও নয়, আবার বহুদেবতাবাদও নয়। তা ঈশ্বরবাদেরও অতীত এক তুরীয় তত্ত্ব ; তা অনন্ত জ্ঞান ও সর্বব্যাপী প্রেমের পথপ্রদর্শক। পূর্ণ চৈতন্যের মধ্যে তার উপলব্ধি কেবল সেই ব্রহ্মচারীরই করায়ত্ত—যিনি পরিশ্রমী, অনুরাগী এবং যিনি পরম পবিত্রতার পুণ্যজ্ঞানের সপ্ত অবস্থার সাহায্যে দশবিধ শৃঙ্খলেরই বিনাশ সাধন করেছেন। সেই সপ্ত অবস্থা, যথা—(ক) শীল বিশুদ্ধি, (খ) চিত্ত বিশুদ্ধি, (গ) দৃষ্টি

বিশুদ্ধি, (ঘ) কঙ্খাবিতরণ বিশুদ্ধি, (ঙ) মার্গামার্গ দর্শন বিশুদ্ধি, (চ) প্রতিপদজ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি, এবং (ছ) জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি।

বোধিপদলাভের পর প্রথমতঃ বুদ্ধদেব আপেক্ষিক কারণবাদের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এর অপর নাম দ্বাদশ নিদান বা মূল কারণ। পারম্পরিক সংযুক্তির দ্বারা এই কারণগুলি মানুষকে তার স্বকীয় কর্মের ফলস্বরূপ সৃষ্টি করে। এই মূল কারণ বা দ্বাদশ নিদান হচ্ছে—অবিজ্জা (অবিদ্যা), সঙ্খার (সংস্কার), বিঞ্ঞান (বিজ্ঞান), নামরূপ, সলায়তন (ষড়ায়তন), ফস্সো (স্পর্শ), বেদনা, তন্হা (তৃষ্ণা), উপাদান, ভব, জাতি ও জরামরণ। জৈবিক অস্তিত্বের এই জটিল সমস্যাবলীর সমাধান ক'রে এবং লোক্ষলাভের পূর্ণানন্দ উপভোগ ক'রে তথাগত বুদ্ধদেব বললেন ঃ যখন আপেক্ষিক কারণবাদের তত্ত্ব অনুরাগী ধ্যাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণের নিকট সুপরিস্ফুট হয়, তখন তার সমুদয় সংশয় অন্তর্হিত হয়—যেহেতু তখন তার জগৎপ্রপঞ্চের কার্যকারণ সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। যখন সে কারণবাদের নিবৃত্তি উপলব্ধি করলো, তখন সে সমস্ত অপকার অপনোদন ক'রে গগনে প্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায় বিরাজমান হলো।

মেত্তা বা মৈত্রীভাবনা বৌদ্ধদর্শনের অন্যতম বিষয়। সুত্তনিপাতের মৈত্রীসূত্রে আছে—সমস্ত প্রাণী সুখী হোক, নির্ভীক হোক এবং সুখে জীবন যাপন করুক। তেম্নি প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রেও এই মৈত্রীকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। 'মৈত্রী পারসী'তে বলা হয়েছে—

'এবমাকাশ নিষ্ঠস্য সত্ত্বধাতোরনেকধা,
ভবেয়মুপজীব্যোহং যাবৎ সর্বে ন নিবৃতাঃ ॥'

অর্থাৎ—'অনন্ত আকাশে যত জীবলোক আছে, সেই জীবলোকসমূহে যত জীব আছে, যতদিন সেইসব জীব মুক্তিলাভ না করে, ততদিন আমি তাদের সেবা করবো।'—পৃথিবীতে এতবড় দার্শনিকতত্ত্ব আর সৃষ্টি হয়নি। বিভঙ্গ, বিসুদ্ধিমগ্গ, খুদ্ধকপাঠ, ইতিবুত্তক, অঙ্গুত্তর, সুত্তনিপাত প্রভৃতি বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ এই মৈত্রীভাবনাকে নানাভাবে রূপ দিয়েছে।

তথাগত সম্পর্কিত সামগ্রিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্ম নামে ত্রিপিটকের সূত্রগুলি পাঠ করা প্রয়োজন। এই পিটকগুলি বিভিন্ন অঙ্গে বিভক্ত ; এক-একটি অঙ্গ এক-একখানি গ্রন্থ। ভারতে মৌর্য ও গুপ্তযুগের স্থাপত্যভাস্কর্যে বৌদ্ধপ্রভাব সমধিক পরিলক্ষিত হয়। গান্ধার ভাস্কর্যে তারই ছায়াপাত ঘটে। চৈত্য বা স্তূপ নির্মাণের দিক থেকেও বৌদ্ধভিক্ষুসংঘের অবদান অসীম। পরবর্তীকালে বৌদ্ধাচার্যগণের উদ্যোগে গড়ে ওঠে চর্যাপদ। এঁদের মধ্যে সহজিয়া-পন্থী যাঁরা, তাঁরা রচনা করেন 'দোঁহা'। সে যুগে সাহিত্যের প্রধান বাহন ছিল সংস্কৃত ও অপভ্রংশ, সে-যুগে আদি বাংলাভাষার একটি মূল কাঠামো গড়ে ওঠে চর্যাপদে।

বিরাট বিপুল এই দর্শনের ভূমিকা নিয়ে বিশ্বের দরবারে ভারত উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছে ঃ 'অয়মহং ভোঃ, আমাকে দর্শন করো।'

বৌদ্ধতন্ত্র ও চড়ক

তন্ত্রশাস্ত্রের দিক থেকে হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রেরও অসংখ্য গ্রন্থ আছে। মূল 'কম্পতরু' এবং 'সমাজতন্ত্র' নামে দু'খানি প্রাচীনতম বৌদ্ধতন্ত্র রচিত হয় প্রথম ও তৃতীয় শতাব্দীতে। চীনদেশীয় ত্রিপিটকে চীনা ও তিব্বতী ভাষায় অনুদিত কয়েকখানি তন্ত্রগ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নালন্দা ও বিক্রম-শীলা বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে একসময় তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হতো। স্বামী জগদীশ্বরা-নন্দ এ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করে ইতিপূর্বে বিদগ্ধ বাঙ্গালী পাঠকসমাজের অনুসন্ধিৎসা মেটাবার প্রয়াস পেয়েছেন। বাংলা দেশেই সর্বপ্রথম বৌদ্ধতন্ত্র সমৃদ্ধ হয়। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য তাঁর 'Introduction to Buddhist Esotericism' গ্রন্থে দেখিয়েছেন—কিভাবে হিন্দুতন্ত্র নানা বিষয়ে বৌদ্ধতন্ত্রের নিকট ঋণী। হিন্দু-তন্ত্রে দশমহাবিদ্যার যে বর্ণনা আছে, তা প্রধানত বৌদ্ধতন্ত্র থেকেই গৃহীত। বৌদ্ধতন্ত্রে 'সাধনমালা' তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী এবং তারাদেবীর এই অষ্টরূপের মন্ত্রাবলীও বৌদ্ধতন্ত্র থেকে প্রাপ্ত। সরস্বতী ও কালী—বাংলার এই জনপ্রিয় দেবীদ্বয়ও বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি। হিন্দুতন্ত্রের অনেক মন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্রসৃষ্ট মন্ত্রের অপভ্রংশ। বৌদ্ধধর্মের পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের এক একটি শক্তি আছে। তাঁদের নাম—লোচনা, যানকী, পাণ্ডারা, আর্য্যতারা ও বজ্রধাত্রীশ্বরী। হিন্দুতন্ত্রে যেমন বামাচার ও দক্ষিণাচার—এই দুটি বিভাগ আছে, বৌদ্ধতন্ত্রেরও তদ্রুপ ক্রিয়াতন্ত্র, চর্য্যাতন্ত্র ও যোগতন্ত্র প্রভৃতি চারটি বিভাগ আছে। বৌদ্ধতন্ত্রমতে মহাশূন্য থেকে বীজমন্ত্রের সৃষ্টি হয়, এবং এক একটি বীজমন্ত্র এক একটি দেবতার রূপ ধারণ করে। মোটামুটি চুরাশি জন সিদ্ধপুরুষের নাম পাওয়া যায় বৌদ্ধতন্ত্রে। তাঁরা সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে সান্ধ্য ভাষায় তন্ত্র প্রচার করেন।

এই বৌদ্ধতন্ত্র বা বজ্রযান তৃতীয় শতাব্দীতে মৈত্রেয়নাথ কর্তৃক স্থাপিত হয়। কামাখ্যা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রাচীন কেন্দ্র ছিল। হিন্দুতন্ত্রে যেমন আগম ও যামল নামে দুটি ভাগ আছে, বৌদ্ধতন্ত্রে তেমনি বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান নামে তিনটি প্রধান বিভাগ আছে। কালচক্রযানের বিস্তৃত দর্শন ও ইতিহাস তিব্বতী ভাষায় রুশীয় বৌদ্ধতত্ত্ববিদ ডঃ জর্জ্জ রোরিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। বৌদ্ধ সরস্বতীর মূর্তিতে দেখা যায়—তিনটি মুখ ও দুটি হাত। বৌদ্ধজগতে বাগীশ্বরী মঞ্জুশ্রীর শক্তি সরস্বতী। 'সাধনমালা' নামক বৌদ্ধতন্ত্রে মহাসরস্বতী, বজ্রবীণা সরস্বতী, বজ্রসারদা ও আর্য সরস্বতীর ধ্যান আছে। 'সাধনমালা'য় মহাসরস্বতীর বর্ণনা এইরূপ ঃ 'ভগবতী, শরদিন্দুকরাকারা, সিতকমলোপরি চন্দ্রমণ্ডলস্থা, স্মেরমুখী, অতি-করুণাময়ী, শ্বেতচন্দন-কুসুম-বসনধরা মুক্তাহারোপশোভিত-হৃদয়া, নানালঙ্কারবতী দ্বাদশ-বর্ষাকৃতি, স্ফুরদনন্তগভাস্তি ও ব্যূহাবভাসিতলোকত্রয়া।'

তেমনি চড়কেও বৌদ্ধপ্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পূর্বে ধর্ম বা ধর্মনিরঞ্জন এ উৎসবের অধিদেবতা ছিলেন। তিনিই আদি বুদ্ধ; 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থে বুদ্ধদেব ধর্মরূপে অভিহিত হয়েছেন। রাঢ় অঞ্চলে ধর্মই গাজনের প্রধান দেবতা। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের যুগে বল্লুকা নদীর তীর থেকে ধর্মশালা উত্তোলন করে বাসাই পণ্ডিত ধর্মপূজার প্রবর্তন করেন। এইভাবে সদ্ধর্মী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। নব ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের চাপে বৌদ্ধগণ 'সদ্ধর্ম্ম' সৃষ্টি করে তাতে আত্মগোপন করেছিলেন। আদি বুদ্ধ বা ধর্মনিরঞ্জন বহুকাল যাবৎ ধর্মপূজার ও গাজন উৎসবের অধিদেবতা ছিলেন; কিন্তু শৈবধর্মের চাপে তিনি গাজন উৎসব থেকে স্থানচ্যুত হলেন। কোনও স্থানে তিনি আদি বুদ্ধজাত এবং কোনও কোনও স্থানে তিনি আদি বুদ্ধ থেকে স্বতন্ত্র বলে বিবেচিত হতে লাগলেন। 'ধর্মপূজোপদ্ধতি' নামক সংস্কৃত পুঁথি থেকে জানা যায় যে, আদ্যাশক্তি চণ্ডিকা আদি বুদ্ধকণ্যা। এই আদি বুদ্ধকণ্যা আদ্যা পার্বতীর সঙ্গে সদাশিবের বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে সদাশিব গৌরীকে বামে নিয়ে গাজনে বসলেন এবং এই ভাবে কোনক্রমে ধর্মনিরঞ্জন ধর্মপূজার পরিমণ্ডলের প্রধানপদ হারালেন। কোথাও কোথাও দেখা যায়, ধর্মনিরঞ্জন শিবের গাজনে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। উৎকলের 'ধর্ম গীতা' অনুসারে ধর্ম আদি বুদ্ধের পুত্রস্থানীয়। এই গ্রন্থানুসারে নিরঞ্জন ধর্ম থেকে পৃথক। ধর্মদেবতার কোনও মূর্তি সচরাচর দৃষ্ট হয় না। রাঢ় অঞ্চলে কুর্ম-কৃতি প্রস্তরখণ্ডের উপর শ্বেতচন্দনের দ্বারা বৌদ্ধধর্মপদ অঙ্কিত করে ধর্মপূজা করা হয়। একে ধর্মপাদুকা বলে। কূর্ম দশাবতারের অন্যতম। কূর্ম ধর্মশরীর থেকে উৎ-পন্ন বলে কথিত হয়। এ জন্য সদ্ধর্মীরা কূর্মরূপী ধর্মের পূজা করতেন। কিন্তু শিব শেষকালে ধর্মের গাজনের অধিদেবতা হলেন।

ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে কোনো কোনো চিন্তাবিদ এ সম্পর্কে নানা বিষয় সংগ্রহ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, বৌদ্ধগণের 'ধর্ম্ম' প্রধানত স্ত্রীরূপী। বৌদ্ধ 'ত্রিরত্ন' অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ হীনযান ও মহাযান—এই উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তিভাজন। ধর্ম স্ত্রী-মূর্তিতে বুদ্ধের বামে এবং সংঘ পুরুষ মূর্তিতে তাঁর দক্ষিণে বসলেন। তবে এ কথা সর্বৈব সত্য ব'লে ধরে নেওয়া কঠিন। কারণ নানারূপ জটিলতার এবং বহু ধর্মগত ও পদ্ধতির মিশ্রণে ধর্মের গাজনের ইতিহাস পরিষ্কার ভাবে উদ্ধার করা দুরূহ। বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধ প্রভৃতি বুদ্ধ ও তাঁদের সঙ্গে যথা-ক্রমে বজ্রবাতেশ্বরী, লোচনী, মানুষী, পাণ্ডুরা ও তারা নাম্নী বুদ্ধ শক্তিগণ এবং সমন্তভদ্র, বজ্রপানি, রত্নপানি, পদ্মপানি ও বিশ্বপানি নামক বোধিসত্ত্বগণের আবির্ভাবের সঙ্গে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার বৈচিত্র্য সাধিত হলো। মস্তকে অমিতাভ বুদ্ধধৃত অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির জটামধ্যে গঙ্গাসমন্বিত মহাদেবের সঙ্গে অপূর্ব সাদৃশ রয়েছে। বোধিবৃক্ষতলে পদ্মাসনে উপবিষ্ট শ্বেতবর্ণ, চতুর্হস্ত, ত্রিনেত্রবিশিষ্ট, চন্দ্রকলাশোভিত, জটাজুট সমন্বিত ও সর্পবিভূষিত লোকেশ্বর বুদ্ধের মূর্তিও শিবের অনুরূপ বলে পরবর্তীকালে এঁরও শিবত্ব প্রাপ্তির পক্ষে সুবিধে হয়েছিল। অনেকে অনুমান করেন, হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজার

প্রচলন বৌদ্ধধর্মের অনুকরণে প্রচলিত হয়ে থাকবে। এই ভাবে নানা বৌদ্ধ উৎসবও শৈব উৎসবে পরিণতি লাভ করেছে। গাজন তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

কান্যকুব্জে মহারাজা হর্ষবর্ধন চীনপর্যটক হুয়ান-চুয়াং-এর সম্বর্ধনার জন্য চৈত্রোৎসব অনুষ্ঠান করেন। এই উৎসবক্ষেত্রে নৃত্যগীত ও বাদ্যের বিপুল আয়োজন হয়। একশো ফিট উঁচু মণ্ডপগৃহে মানুষের সমান উচ্চতাবিশিষ্ট বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত হয়। বহু জৈন, বৌদ্ধ, শ্রমণ, ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ এই উৎসবে সমবেত হন। মহারাজ একটি সুবর্ণময় বুদ্ধমূর্তি স্কন্ধে করে নদীতে নিয়ে স্নান করিয়ে উৎসব মণ্ডপে আনয়ন করেন। এরপর থেকে এই উৎসব প্রতিবছর চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত চৈত্রোৎসবে পরিণত হয়। এই বুদ্ধমূর্তি স্নানের সঙ্গে ধর্মের আসনের বা পাটের স্নানের সাদৃশ্য আছে। ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ একবার মুণ্ডিতমস্তক 'নেড়া' বৌদ্ধগণকে পুড়িয়ে মারবার জন্য উৎসবগৃহে অগ্নিসংযোগ করেছিলেন! এই ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ চড়কের 'নেড়া পোড়া' ব্যাপারটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। চীন-পর্যটক ফা-হিয়ান মহারাজা হর্ষবর্ধনের আর একটি বৌদ্ধ উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন। এই উৎসব প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসে অনুষ্ঠিত হতো। রথের উপর বিরাট বুদ্ধমূর্তি উপবিষ্ট করিয়ে হাতী ও ঘোড়া সহযোগে রাজপথ সমূহ ভ্রমণ করা হতো। কুড়িজন সামন্তরাজা কুড়িখানি রথে আরোহন করে শোভাযাত্রায় যোগ দিতেন। এই শোভাযাত্রায় প্রায় আটশো হাতী থাকতো। বুদ্ধদেবের মূর্তি ছাড়া আরও বহু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিও এই শোভাযাত্রায় থাকতো। পুষ্পমাল্য ও পতাকাশোভিত রথের মধ্যে বুদ্ধদেবের মূর্তি উপবিষ্ট থাকতো, আর সারথিবেশে বোধিসত্ত্বের মূর্তি রথের সম্মুখে স্থাপিত হতো। বহু দূরপল্লী ও জনপদ থেকে বহু নরনারী এই ধর্ম-উৎসব দর্শনে আসতো ও বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করতো। মহারাজা শিলাদিত্যের আহ্বানক্রমেও প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমক্ষেত্রে অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হ'তো। এই সব বৌদ্ধ উৎসব কালক্রমে ধর্মের ও শিবের গাজনে পরিণত হয়ে আধুনিককাল পর্যন্ত চ'লে আসচে।

ত্রিনাথের পাঁচালী

ত্রিনাথের পাঁচালী প্রধানতঃ ত্রিনাথের পূজো ও তৎসংশ্লিষ্ট মেলাকে কেন্দ্র ক'রে রচিত। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একত্র সমন্বয়ে গঠিত এই ত্রিনাথ ঠাকুর। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের প্রমূর্ত বিগ্রহ তিনি, এইভাবেই তাঁকে কল্পনা ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। ব্রহ্মাকে, বিষ্ণুকে কিম্বা মহেশ্বরকে তাঁদের স্ব স্ব লীলাকেন্দ্রে স্বতন্ত্র ক'রে পুজোর মধ্য দিয়ে আত্মমুক্তির সাধনা অপেক্ষা ত্রিনাথপন্থীরা উক্ত তিন দেবতাকে একই অখণ্ড শক্তিতে কল্পনা ক'রে সাধনমার্গের পথে যাত্রা করেছেন। প্রধানতঃ পূর্ব ও উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ত্রিনাথপন্থীদের আধিক্য দেখা গেলেও পশ্চিমবঙ্গেও নিতান্ত বিরল নয়। Pantheism বা একেশ্বরতন্ত্রই এঁদের মূলমন্ত্র—উপনিষদে যাঁকে বলা হয়েছে ঃ 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি'—'The superior and infinite knowledge, energy, splendour, glory and holiness of the Supreme being Who has given birth to, created and menifested the Earth, the Sky and the Heaven, *i.e.*, the whole universe, who is omnipotent, omnipresent, omniscient —who alone controls all His creations.' এই একই বহু হলেন ঃ 'একমেব বহুশ্যাম' এবং বহুর মধ্যেই তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। এই অদ্বিতীয়তা থেকেই অদ্বৈতবাদ বা Pantheism-এর সৃষ্টি। যিনি ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু এবং তিনিই মহেশ্বর ; তাঁকেই পরম ব্রহ্ম ব'লে একেশ্বরবাদীরা ধ্যান করেন এবং ত্রিনাথ-পন্থীরা তাঁকেই মনের মতো ক'রে ত্রিনাথ-ঠাকুরে রূপান্তরিত ক'রে নিয়েছেন। আসলে একের মধ্যেই বহু এবং বহুর মধ্যেই একের লীলা। এই লীলা-পুরুষই বিভিন্ন সাধক-গোষ্ঠীর জীবনে বিভিন্ন রূপে ধরা দিয়েছেন।

ত্রিনাথ-পন্থীরাও যে সর্বত্রই একই নিয়মে এই ত্রিশক্তির সংযুক্ত পুজোর মাধ্যমে নিজেদের অনুষ্ঠান সম্পন্ন ক'রে থাকেন, এমন নিদর্শন বিরল। পূর্ব ও উত্তর-বঙ্গের একাধিক অঞ্চলে এই অনুষ্ঠানকে আমরা প্রধানতঃ শৈবধর্মী অনুষ্ঠানরূপেই দেখেছি। সাধারণতঃ অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কেন্দ্র ক'রেই এই ত্রিনাথ-পন্থীরা গ'ড়ে উঠেছেন। পুজোর প্রধান অঙ্গ এক পয়সার গাঁজা, এক পয়সার পান ও এক পয়সার সরষের তেল। সর্বসাকুল্যে ব্যয় মোট তিন পয়সা। গম্ভীরা বা গাজনের মতই বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই পুজোর আয়োজন হয়। ত্রিনাথ-পন্থীরা একত্রে জড়ো হ'য়ে সিদ্ধিযোগে সিদ্ধাইমন্ত্রে উজ্জীবিত হ'য়ে গেয়ে ওঠেন ঃ

'দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও রে গুরুভাই,
ত্রিনাথ বিনা দীনের কেহ নাই।'...

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই গানের সঙ্গে ঢোল, করতাল ও সিঙ্গা জাতীয় বাদ্য-যন্ত্রের আধিক্যও লক্ষিত হ'য়েছে, কোনো কোনোক্ষেত্রে বা তারও বালাই নেই। এই উপলক্ষে কোনো কোনো অঞ্চলে ছোটখাটো আড়ং বা মেলাও বসতে দেখা গিয়েছে ঃ 'ত্রিনাথের মেলা'। তাকে চৈত্র-সংক্রান্তির গাজনের মেলার এক-শতাংশ রূপ বলা যায়। ভূত-প্রেতের নানা জাতীয় মুখোসে সং সেজে নর্তনকুর্দনের আধিক্য অবশ্য এক্ষেত্রে কম। গাজনের মেলায় তা পুরোপুরিই লক্ষিত হয়। তবে সম্প্রদায় হিসেবে ত্রিনাথ-পন্থীরা সংখ্যায় এত নগণ্য যে, বাংলার উৎসব-ক্ষেত্রে এঁরা প্রায় পিছনের দুয়োরেই প'ড়ে আছেন। এর প্রধান কারণ বোধ করি অনুষ্ঠানের কিছু অনার্য-সুলভতা। অনুষ্ঠানে যে রীতি গোড়া থেকেই প্রবর্তিত হ'য়ে আস্ছে, তা অনেকাংশে সভ্যরুচিসম্পন্ন আর্যসুলভ নয় ব'লেই খুব সম্ভবতঃ হিন্দুব লৌকিক ধর্মের ক্ষেত্রে ত্রিনাথ-পন্থীদের এই আংশিক অপাংক্তেয়তা!

এ যদি হ'য়ে থাকে, তবে তাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া চলে না। খরচের দিক থেকে মাত্র তিন পয়সা হ'লেও গাঁজা, পান আর সরষের তেলের মাধ্যমে ঘট বসিয়ে যে-পূজানুষ্ঠানের রীতি আগাগোড়া চ'লে আস্চে এবং পূজার্চনার সমস্ত কিছুকে কেন্দ্র ক'রে যে-ভাবতীর্থে সেবাইৎবৃন্দ আরোহণ ক'রে আস্চেন, সেটা হচ্ছে আসুরিক বা 'সিদ্ধি'ভাব—গাঁজা যার প্রধান উপকরণ। মহেশ্বরের মহৎ কল্যাণের আশ্রয়ে থাকবার অভীপ্সায় ধুতুরাসেবী গঞ্জিকাপিয়াসী মহাদেব-চরিত্রটিই তাঁদের কাছে সুপরিজ্ঞাত, বিভূতি-আচ্ছাদিত সর্বত্যাগী শঙ্কর-চরিত্রের স্পর্শ তাঁরা লাভ করেননি। তার মূলে র'য়েছে তাঁদের অশিক্ষা বা স্বল্পশিক্ষাজনিত স্বভাবের বৈগুণ্য। অথচ তিনিই হ'চ্ছেন মঙ্গলের আধার, 'শান্তম্, শিবম্, সুন্দরম্'। —তাঁকেই ভগ্নী নিবেদিতা ব'লেছেন ঃ 'As the moon shines above the mountains, so He bears on His forehead the new moon.—Like the true ascetic, begging food at the householder's door, He is pleased with very simple gifts.– Fresh water, a few grains of rice and two or three green bel-leaves are His whole offering, in the daily worship',—এ পাঠ কিন্তু শৈবাবলম্বী ত্রিনাথ-পন্থীদের একেবারেই অনধিগম্য। যেখানে ভাববন্যার পূর্ণ বিকাশ সম্পূর্ণভাবেই ব্যাহত, সেখানে যতবড় নিষ্ঠাই থাক্না কেন, বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর ভর ক'রে বিশেষ কোনো সাংস্কৃতিক জাগৃতি দাঁড়াতে পারে না।

আর-একদল সেবাইত র'য়েছেন—যাঁদের কাছে ত্রিনাথ ঠাকুরের বিষ্ণুরূপই প্রাধান্যলাভ করেছে। 'পদ্মনাভ গদাধর, মুকুন্দমাধব নারায়ণই' যে একমাত্র ত্রিকালজ্ঞ অধীশ্বর—এই বিশ্বাস থেকেই তাঁদের এই পূজা-রীতি। যিনি দেবতাশ্রেষ্ঠ নারায়ণ, *অনন্ত গুণসম্পন্ন গুণাধার, যিনি অব্যক্ত অথচ সর্বব্যাপী—তাঁকে ধ্যান করা ভিন্ন মুক্তি নেই, মোক্ষ নেই। তাঁকেই বন্দনা ক'রতে গিয়ে একদিন শঙ্করাচার্য*

ব'লেছিলেন—

'স্তোষেৎ ভক্ত্যা বিষ্ণুমনাদিং জগদাদিং,
যস্মিন্নেতৎ সংসৃতিচক্রং ভ্রমতীত্থম্।
যস্মিন্ দৃষ্টে নশ্যাতিতৎ সংসৃতিচক্রং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে।'...

অর্থাৎ 'জগতের আদি অনাদি বিষ্ণুকে ভক্তিসহকারে স্তব করিতেছি—যাঁহাতে এই সংসারচক্র পরিভ্রমণ করিতেছে, যাঁহার দর্শনে সংসারচক্র বিনষ্ট হয়, আমি সেই সংসারতমোনাশী হরিকে স্তব করি।'

এই স্তবের একটি নতুন রূপ ফুটে উঠ্‌তে দেখা গেল ত্রিনাথপন্থীদের মধ্যে। এঁরা হচ্ছেন বিষ্ণুধর্মী ত্রিনাথপন্থী। তেমনি কোথাও কোথাও বা ব্রহ্মবাদী ত্রিনাথ-পন্থীও যে না রয়েছেন, এমন নয়। তা নিয়ে এপর্যন্ত কোথাও কোনো আলোচনা মুখর হয়ে ওঠেনি। সম্প্রতি একটি পুস্তিকা সংগৃহীত হয়েছে। তাতে বিষ্ণুধর্মী ত্রিনাথপন্থাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। পুস্তিকাটির নাম 'ত্রিনাথের পাঁচালী', ৺মহেশচন্দ্র দাস কর্তৃক বিরচিত এবং বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সংশোধিত। পুস্তিকাখানির প্রকাশক কলিকাতা টাউন লাইব্রেরীর শ্রীকার্তিকচন্দ্র ধর। যেভাবে উত্তর ও পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে আমরা ত্রিনাথের পুজো লক্ষ্য করেছি, তার সঙ্গে এই পুস্তিকাটির সর্বত্র মিল না থাকলেও বিষয়টিকে মোটামুটি সুশৃঙ্খলভাবে গুছিয়ে সুমার্জিত ভাষায় নানা আলঙ্কারিক শব্দবিন্যাসে সুরুচিসম্পন্ন করে একটি পরিমার্জিত রূপ দেওয়া হয়েছে। এখানে বিষয়টির গবেগণার চাইতে ভাবাতিশয্যই অধিক। পুস্তিকাটিতে প্রথমতঃ ত্রিপদী ছন্দে বিষ্ণুর বন্দনা করা হয়েছে, পরে পয়ার ও ত্রিপদীর মিশ্রণে বিবেকধর্মী আতিশয্যে ত্রিনাথের পুজো-প্রচলনের মূল কাহিনীটিকে রূপ দেওয়া হয়েছে। ঢংটি ঠিক কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত চৈতন্য চরিতামৃতের ঢং। বর্ণনা এত সহজ ও প্রাঞ্জল যে, তা নিয়ে ব্যাখ্যাসহকারে বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়োজন হয় না। পাঠক মূল পাঁচালীখানি পড়লেই এর সারবত্তা উপলব্ধি করতে পারবেন। এজন্য সম্পূর্ণ পাঁচালীখানি নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা গেল। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এখানেও সেই এক পয়সার গাঁজা, এক পয়সার পান ও এক পয়সার সরষের তেলের প্রাধান্য। পুজোর প্রধান অঙ্গই এই তিনটি। জনৈক ব্রাহ্মণ বিষ্ণু-কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কিভাবে তাঁর হারানো গাভীর দর্শন পান এবং কিভাবে উক্ত তিন পয়সার তিন দ্রব্য সংগ্রহের মধ্য দিয়ে ঘরে ঘরে শ্রীহরি নারায়ণের পুজো প্রচলন করতে সক্ষম হন, সেই কাহিনীই এখানে বিশেষভাবে প্রাধান্যলাভ করেছে। এখানেও সেই আসুরিক বা 'সিদ্ধি' ভাব—বৈষ্ণব-রীতির পক্ষে যা মোটামুটি পরিপন্থী। এখানে বিষ্ণুকে মূল কেন্দ্রানুগ করেও ত্রিনাথ-পন্থীদের এই বিশেষ শ্রেণীটি বৈষ্ণব হয়ে উঠতে পারেননি। তাই তাঁদের এই ভাব বা স্বভাবকে বলা হয়েছে

আসুরিক বা 'সিদ্ধি'ভাব। এ'দের অধিকাংশই মনে প্রাণে শাক্ত। বৈষ্ণবে-শাক্তে মূলগত পার্থক্যটা ইদানীং অনেকখানিই ঘুচে গেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সার্ধশতাব্দী পূর্বেও এ পার্থক্য স্বভাবতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। তা নিয়ে আজ অবশ্য কোনো বাদানুবাদের প্রশ্ন ওঠে না। একটা কথা খাঁটি যে, বাংলার সংস্কৃতি প্রধানতঃ গড়ে ওঠে এই জাতীয় লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়েই। তাতে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি বা বিপরীত ভাবের বন্যা এসে আশ্রয় করলেও তা থেকে এমন কতকগুলো মধুর পদ্মকোরকের সৃষ্টি হয়েছে—যার ঊর্ধ্বমুখ একমাত্র সূর্যের দিকেই ন্যস্ত। সূর্যের দীপ্ত-রশ্মিতে তার সমস্ত মালিন্য সমস্ত ত্রুটি ঢাকা পড়ে গেছে। সেই পদ্ম-কোরকের রেণু থেকেই বাংলা তথা বাঙালী সংস্কৃতির জন্ম—যার মূল সুরটি পুরোপুরিই ভারতীয়। সেই সুরেরই একটি বিশেষ ধারা হচ্ছে—'ত্রিনাথের পাঁচালী'। আলোচ্য পাঁচালীখানি এইরূপ ঃ

বিষ্ণুর বন্দনা

ত্রিপদী

ত্রিনাথ কেশবত্তম, তুমি হে পুরুষোত্তম, চতুর্ভুজ গরুড়-বাহন। জলদ বরণ ঘটা হৃদয়ে কৌস্তুভ ছটা, বনমালা আদি আভরণ ॥ কৃপা কর কমললোচন। জগন্নাথ মুরহর, পদ্মনাভ, গদাধর, মুকুন্দ মাধব নারায়ণ ॥ রামকৃষ্ণ জনার্দ্দন, লক্ষ্মীকান্ত সনাতন, হৃষীকেশ বৈকুণ্ঠ বামন। শ্রীনিবাস দামোদর, জগন্নাথ যজ্ঞেশ্বর, বাসুদেব শ্রীবৎস লাঞ্ছন ॥ শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ, সুশোভন চারিভুজ, মনোহর মুকুট মাথায়। কিবা মনোহর পদ, নিরুপম কোকনদ, রতন নূপুর বাজে তায় ॥ পরিধান পীতাম্বর, অধর বান্ধুলি* বর, মুখ সুধাকরে সুধাহাস। সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, নাভীপদ্মে প্রজাপতি, রূপে ত্রিভুবন পরকাশ ॥ ইন্দ্র আদি সুর সব, চারিদিকে করে স্তব, নারদাদি ঋষি যত জন। মুনির বীণার তানে, মোহিত যে গুণ গানে, পঞ্চমুখে গান পঞ্চানন ॥ কদম্বের কুঞ্জবনে, বিহর আনন্দ মনে, শীতল সুগন্ধি মন্দবায়। ষড়ঋতু সহচর, বসন্ত লইয়া শর, নিরবধি সেবে নিজ পায় ॥ ভৃঙ্গের গুণ গুণ রব, কুহরে কোকিল সব, পূর্ণচন্দ্র শারদ-যামিনী। বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে, গান করে তাল তন্ত্রে, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ॥ উর প্রভু শ্রীনিবাস দাসের পুরাহ আশ, এই মোর সদা আকিঞ্চন। করি এই নিবেদন, দিও অন্তে শ্রীচরণ, ত্রিনাথের আর নাহি কোন জন ॥

পয়ার

কলির আরম্ভ কালে দেব নারায়ণ। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপ করেন ধারণ ॥ দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে হরিসংকীর্তন। হরিবোল বিনা আর নাহিক বচন ॥ তবু নাহি কলির নরের পাপ যায়। দেখিয়া কি করি হরি ভাবেন উপায় ॥ নবদ্বীপে ত্রিনাথ রূপ

* বান্ধুলি—রক্তপুষ্প বিশেষ। রক্তক, বন্ধুক ও জীবক শব্দে বান্ধুলী—(বান্ধুল, বানরী)

করেন ধারণ। কেমনেতে জগজ্জন করিবে পূজন ॥ কেমনে হইবে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার। তার পরিচয় শুন সবে সুবিস্তার ॥ সেই গ্রামে থাকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। অতি সে দরিদ্র দ্বিজ না মিলে ওদন ॥ গাভী চরাইয়া ফিরে ময়দান উপর। দৈবাৎ হইল হারা সে গাভী তৎপর ॥ অন্বেষণ করি দ্বিজ ভ্রমে স্থানে স্থানে। কোথাও না পায় দ্বিজ গাভীর সন্ধান ॥ আকুল হইয়া বিপ্র করিছে রোদন। মনে মনে ভাবিতেছে দেব নারায়ণ ॥ হেনকালে দেখিল সে এক সরোবর। মরিব ইহাতে মনে ভাবে দ্বিজবর ॥ আচম্বিতে দৈব বাণী দিলা নারায়ণ। "ত্রিনাথে করহ পূজা অবোধ ব্রাহ্মণ ॥ গাভীর কারণে কেন জীবন ত্যজিবে। পুনর্বার রত্নধন গাভী আর পাবে ॥ তটিনীর তট গিয়া করহ খনন। তিনপাই প্রাপ্ত হবে শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ একপাই গাঞ্জা আর একপাই পান। তেল লবে এক পাই শুন মতিমান ॥ বিলম্ব না কর দ্বিজ শুনহে বচন। ত্বরা গিয়া তিন দ্রব্য কর আনয়ন ॥" এত শুনি দ্বিজবর গমন করিল। নদীর তীরেতে আসি মৃত্তিকা খুদিল ॥ সেইখানে তিন পাই দেখিতে পাইল। আনন্দে আটখানা দ্বিজ তখন হইল ॥ ভাবে কোন দেব ইনি না জানি কারণ। কখন তাঁহার সঙ্গে নাহি দরশন ॥ যে হউক সে হউক তাঁয় করি নমস্কার। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ যেন হয় সে আমার ॥ এত ভাবি দোকানেতে গমন করিল। মৃদুস্বরে দোকানীরে কহিতে লাগিল ॥ শুন শুন দোকানদার লহ তিন পাই। তিন পাই ভিতরেতে তিন দ্রব্য চাই ॥ তৈল গাঞ্জা দেহ আর এক পাই পান। বিলম্ব সহিতে নারি করিব প্রস্থান ॥ দোকানি বলিছে শুন অবোধ ব্রাহ্মণ। কিসেতে লইবে তৈল বলহ বচন ॥ তৈল পাত্র কিছু নাহি আনিলে সঙ্গেতে। কিসেতে লইবে তৈল বলহ ত্বরিতে ॥ ব্রাহ্মণ বলেন শুন দোকানদার ভাই। কিসেতে লইব তৈল ঠাকুরে শুধাই ॥ এত বলি দ্রুত-গতি করিল গমন। দেখেন সেখানে আর নাহি কোনজন ॥ দেখিয়া ত দ্বিজবর করেন রোদন। বলে প্রভু কোথাকারে করিলা গমন ॥ কান্দিতে লাগিল দ্বিজ ভাবিয়া না পায়। হেনকালে দৈববাণী হইল তথায় ॥ "তৈল আন বস্ত্র মধ্যে করিয়া বন্ধন। আমার বচন কভু নহিবে লঙ্ঘন ॥" এত শুনি দ্বিজবর গমন করিল। দোকানদারে গিয়া তবে ব্রাহ্মণ কহিল ॥ কোঁচার কাপড়ে তৈল বান্ধি দেও মোরে। কি কার্য পাত্রেতে মোর কহিনু তোমারে ॥ এত শুনি দোকানদার ভাবে মনে মন। নিশ্চয় উম্মাদ এই ব্রাহ্মণ নন্দন ॥ ঠকাইয়া দেয় তৈল বিপ্রের কুমারে। দেখিয়া কুপিত হইলেন গদাধরে ॥ তৈলের কলসী দেব করিল হরণ। দেখিয়া বিস্ময় মুদি হইল তখন ॥ দোকানদার ভাবে মনে ব্রাহ্মণ এ নয়। বুঝিনু দেবতা ইনি হবেন নিশ্চয় ॥ ব্রাহ্মণের পদ মুদি করিয়া ধারণ। বলে প্রভু ক্ষম মোরে আমি অভাজন ॥ ঠকায়ে দিয়েছি তৈল তোমারে আপনি। সে দোষ ক্ষমহে মোরে শুন দ্বিজমণি ॥ ব্রাহ্মণ বলেন বাছা কিছু জানি নাই। ইহার তদন্ত জানেন ত্রিনাথ গোসাঞি ॥ মানহ তাঁহার পূজা পুন তৈল পাবে। তোমার মনের বাঞ্ছা তিনি পুরাইবে ॥ মুদি বলে কোথা তিনি বলগো আমায়। তোমার চরণে ধরি করি গো বিনয় ॥ আদি অন্ত

কথা সব ব্রাহ্মণ কহিল। শ্রবণ করিয়া মন্দি অবাক হইল ॥ মনে মনে মানস করিয়া ততক্ষণ। মন্দি দুরাচার পূজা করিল মানন ॥ পুনর্বার তৈল কুম্ভ মন্দি যে পাইল। হরষিত হয়ে মনে নিজ গৃহে আইল ॥ কবিবর কহে শুন শুন ভক্তগণ। ত্রিনাথ প্রকাশ করেন আপন পূজন ॥

ত্রিপদী

ঘরেতে আসি ব্রাহ্মণ, আনন্দিত হয়ে মন, ত্রিনাথের করেন পূজন। আনি নানা উপহার, তবে ব্রাহ্মণ কুমার, পূজা করে দেব নারায়ণ ॥ ঘটের স্থাপনা করি, ত্রিনাথের নাম স্মরি, বলে প্রভু দেহ পদছায়া। আমি অতি মূঢ়মতি, কি জানি তোমার স্তুতি, আমায় করহ প্রভু দয়া ॥ ওহে হরি দীনবন্ধু, অনাথ জনার বন্ধু ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি মহেশ্বর। তিন দেব একত্তরে, পূজা প্রকাশের তরে, ত্রিনাথ হইয়া তদন্তর ॥ এতেক করি স্তবন পূজা করিছে ব্রাহ্মণ, গুরু তার আইলা হেনকালে। শিষ্যে ডাকি ততক্ষণে, বলে কি কর এখানে, বিশেষ করিয়া কহ মোরে ॥ ধ্যানেতে শিষ্য আছিল, কথা তখন না কহিল, দেখিয়া কুপিত গুরু তার। লাথি মারি ঘট'পরে ফেলিল ধরণীপরে, তবু শিষ্যের বাক্য নাহি আর ॥ তল্পিদারে ক্রোধে কন, তল্পি তোল এইক্ষণ, দুরাচারের ঘরে নাহি রব। শিষ্য হ'য়ে গুরু প্রতি, অমান্য করিল অতি, এইক্ষণে গৃহে চলি যাব ॥ এত বলি ক্রোধানলে, আপনার গৃহে চলে, হেনকালে শুন বিবরণ। অমান্য করি ত্রিনাথে, ফেলি ঘট পদাঘাতে, স্ত্রী পুত্রাদির হয়েছে মরণ ॥ রোদনের ধ্বনি শুনে, তল্পিদার কহে ব্রাহ্মণে, শুন প্রভু করি নিবেদন। বুঝি রোদন করে, শুনি তোমার মন্দিরে, শুনি গুরু করে আগমন ॥ গৃহে আসি ততক্ষণ, দেখিল শূন্য ভবন, স্ত্রী পুত্র মরেছে তিনজন। শুনি গুরু এই কথা, হৃদয়ে পাইল ব্যথা, ভূমে পড়ে হ'য়ে অচেতন ॥ বলে পুত্র গেলি কোথা, খাইয়া আমার মাথা, একবার দেখা দেরে মোরে। তোমার লাগিয়া বাপ, হৃদয়েতে পাই তাপ, কেমনে রহিব একা ঘরে ॥ আর নাহি গৃহে যাব, জলে ডুবিয়া মরিব, এত বলি আইসে জলাশয়। জলেতে নামি যেমন, দেহ করিবে পতন, অমনি আকাশবাণী হয় ॥ শুন ওহে দ্বিজবর, নাহি ত্যজ কলেবর, নারী আর পাইবে তনয়। তব শিষ্য দ্বিজবর, গিয়াছিলে তার ঘর, বসিয়া সে ত্রিনাথ পূজায় ॥ তব সহ সম্ভাষণ, না করিল সেই জন, দেখি ক্রোধ কৈলে তুমি তার। ঘট পদেতে ফেলিলে, তেঁই এত দুঃখ পেলে, স্ত্রী পুত্র হে মরিল তোমার ॥ এবে এক কার্য কর, ত্বরা যাহ তার ঘর, আদ্য অন্ত কহ গিয়া তায়। তব নারী পুত্রগণ, পাবে প্রাণ এইক্ষণ, কবিবর রচিলা ভাষায় ॥

পয়ার

শুনিয়া আকাশবাণী ব্রাহ্মণ তখন। হরষিতে শিষ্যগৃহে করেন গমন ॥ আদ্য অন্ত কথা যত শিষ্যের কহিল। শ্রবণে ব্রাহ্মণ তবে বিস্ময় হইল ॥ ব্রাহ্মণ বলেন ভক্ত তুমি বাছাধন। না জানিয়া তোমা প্রতি কহি কুবচন ॥ এখন করহ তুমি মম প্রতিকার। তোমার কল্যাণে পাই পুত্র পরিবার ॥ ব্রাহ্মণ বলেন গুরু শুনহ বচন

বিধিমত কর তুমি ত্রিনাথ পূজন ॥ শুনি ত্রিনাথের পূজা মানস করিল। কোল্কে পোড়া ভস্ম শিষ্য গুরু হস্তে দিল ॥ এই ভস্ম লয়ে যাও ত্বরায় করিয়া। তাহাদের অঙ্গে তুমি দিবে মাখাইয়া ॥ এত বলি কোল্কে পোড়া ভস্ম করি দিল। হরষিত মনে গুরু গৃহেতে আইল ॥ স্ত্রী পুত্রের অঙ্গে মাখায় করিয়া যতন। সকলে পাইয়া প্রাণ উঠিল তখন ॥ আনন্দে ত্রিনাথ ধ্বনি করেন ব্রাহ্মণ। ত্রিনাথের করে পূজা আনন্দিত মন ॥ ঘট স্থাপনা করি পূজা আরম্ভিল। ধন পুত্র লক্ষ্মীলাভ ক্রমেতে হইল ॥ মেলা হইল তথা ত্রিনাথের পূজায়। প্রত্যাবধি লক্ষ লক্ষ লোক আইসে যায় ॥ অন্ধ খঞ্জ দোঁহে আছে পথেতে বসিয়া। জিজ্ঞাসা করিল খঞ্জ লোকেরে চাহিয়া ॥ কহ কহ মহাশয় কহ বিবরণ। বলহ করিছ সবে কোথায় গমন ॥ একজন কহে যাই ত্রিনাথ দেখিতে। বর মাগি লব মোরা তাঁহার পদেতে ॥ অন্ধে পায় চক্ষু দান দরিদ্রের ধন। মানস করিলে পায় খঞ্জেতে চরণ ॥ শুনি দোঁহে মানস করিল যতনেতে। অন্ধ পায় চক্ষু, পদ পাইল খঞ্জেতে ॥ সামনেতে নৃত্য করে তুলি দুই হাত। ধন্য ধন্য মহাপ্রভু ধন্য হে ত্রিনাথ ॥ ত্রিনাথ করেন কৃপা সবাকার তরে। দুই বাহু তুলি নৃত্য করে প্রেম ভরে ॥ হরি হরি বল সবে যত বন্ধুগণ ॥ মহেশচন্দ্র দাসে ভণে শুন ভক্তগণ ॥

॥ ইতি ত্রিনাথের পালা সমাপ্ত ॥

এতদ্ব্যতীত 'ত্রিনাথ'-সম্পর্কিত বহু গান ও ছড়া নানাদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

বাউল সাধনা

মধ্যযুগের ইতিহাসে আমরা নানা সাধক সম্প্রদায়ের পরিচয় পাই, তার একটি বড় অংশ গড়ে ওঠে বাউলকে আশ্রয় করে। মধ্যযুগের ভারতীয় মরমীয়াদের একটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে এই বাউল। তারও বহু আগে থেকে বাউলের ইতিহাস রচিত হয়ে আসছে। এঁদের আদিপুরুষ হিসেবে ঋকবেদের ব্রাত্যদের ধরা যেতে পারে। বৈদিক যুগের সমগ্র আচার-বিচারের তারা ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। বাউলদের মধ্যেও যুগ-ব্যতিক্রমতার লক্ষণ স্পষ্ট। পরবর্তীকালে নাথযোগীদের সম্পর্কে নাথপন্থী বাংলাসাহিত্যে যা পাওয়া যায়, তাতেও বাউলধর্মী রীতির পরিচয় মেলে। নাথযোগীরা ছিল ভ্রমণশীল সম্প্রদায়, বাউলদের মধ্যেও সেই ভ্রাম্যমানতা লক্ষ্য করবার মতো। গোরক্ষ-বিজয়ে বা মীনচেতনে যে 'কায়াসাধ'-এর উল্লেখ দেখা যায়, তাও বাউলদের সাধনারই কথা। সুফীসম্প্রদায়ের সাধনাও অনু.প। নাথযোগীদের প্রধান ব্রত ছিল ত্যাগ, সুফীদের প্রধান ব্রত ছিল প্রেম। বাউলদের মধ্যে এই উভয় শ্রেণীরই প্রভাব রয়েছে। এই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েই তাঁরা বস্তু থেকে ভাবে এবং ভাব থেকে মহাশূন্যতার পথে জ্যোতির্ময় আত্মার সন্ধান করেছেন। আত্মাকে না জানলে কোনো সাধনার সিদ্ধি নেই। উপনিষদ বলেছেন ঃ 'আত্মানং বিদ্ধি', বলেছেন ঃ 'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ', অর্থাৎ—সেই পরম পুরুষকে না জানলে মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার নেই। তাঁকেই বাউলেরা 'মনের মানুষ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। 'মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে,/ আমি আর বাইতে পারলাম না' ঃ এই মন-মাঝি বা মনের মানুষের কাছে নিজেকে নিবেদন করতে না পারা পর্যন্ত শান্তি নেই। নিজের অহং ছাড়তে পারলে তবে সেই পরমহংসের সাধনার সিদ্ধি। নিরন্তর তাঁরই খোঁজ করে বাউল বলেছেন—

'আমার মনের মানুষ যে রে,
আমি কোথায় পাব তারে ?'

তাঁরই সন্ধানে বাউল অনন্তকাল ধরে সংসার-পথ পেরিয়ে চলেছেন অজানালোকের পথে, মহাশূন্যের পথে। বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদ এর একটি প্রধান আধার। অধরার যে সাধনা, ধরার বন্ধনে তাঁকে কোথাও পাওয়া যায় না। তবু নিত্য তাঁরই সন্ধানে প্রাণ ছুটে চলে।—

'আমি কি সন্ধানে যাই সেখানে
মনের মানুষ যেখানে !
অন্ধকারে জ্বলছে বাতি,
দিবারাত্র নাই সেখানে।'...

সংসারের নিত্য দাবদাহ পাছে প্রতিকূল হয়ে বাধা দেয়, চিরকাল তাই এই

বাউলেরা গৃহছাড়া। লক্ষ্য করলে স্পষ্ট দেখা যাবে—বৌদ্ধ দোঁহা ও বাউল শেষ-পর্যন্ত একসূত্রে এসে মিলেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তুলনামূলক আলোচনা-সাহিত্যে এমন বহু নিদর্শন রয়েছে। ক্ষিতিমোহন সেনের মতে ঃ 'বাংলাদেশের আউল বাউল নিরঞ্জনীদের মধ্যেও এই শূন্যবাদ পাই। শ্রীহট্ট বিঠঙ্গলের মঠের মতবাদে, অষ্টগ্রামী ও দক্ষিণ শাহবাজপুরী বাউল সমাজে, উত্তরবঙ্গের কমলকুমারী মাঝবাড়ি মধ্যমা মতে, বিক্রমপুর নরসিংদী বাউল সমাজ এবং রাঢ়ের বাউলদের মধ্যে সর্বত্রই শূন্য ও সহজের খুব বড় স্থান।'

এই শূন্যবাদ ও সহজবাদ বিষয় দুটি জানবার প্রয়োজন। বেদের দশম মণ্ডলের নাসদীয় সূত্রে শূন্যতত্ত্বের পরিচয় আছে। শূন্যপুরাণের উল্লেখ থেকে দেখা যায়— শূন্যতত্ত্ব প্রচারে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থের সৃষ্টিবাদের প্রভাব ছিল। 'অসঙ্গম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ম্' বলে উপনিষদ ব্রহ্মের যে স্বরূপ নির্দেশ করেছেন, তার সঙ্গে শূন্যপুরাণের নিরঞ্জনের কোনো তারতম্য নেই। বুদ্ধদেবের মতে জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ড অনাত্মক। তাতে আত্মার প্রশ্ন নেই। সহজবাদ কিন্তু একেবারেই স্বতন্ত্র জিনিষ। লালন ফকীরের একটি গানে এই সহজবাদের প্রকৃত উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন—

'সুখ পা'লে হও সুখ-ভোলা,
ও মন দুখ পা'লে হও দুখ-উতলা।…'

এই ভাবটিকেই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী দেখিয়েছেন ঃ সুখ বা দুঃখে চিত্তের কোনো পরিবর্তন হবে না—বাস্তব জগতের কোনো আঘাতেই মন চঞ্চল হবে না—এই উদাস অবস্থাই হচ্ছে সহজ অবস্থা। বৌদ্ধ সহজ মানে সিদ্ধারা বলেছেন—সহজে ভাব-অভাব নাই, পাপপুণ্য নাই, রাগ-বিরাগ নাই, সহজ স্বভাবতঃই নির্মল।'…

কিন্তু এই সহজবাদের পথ গুরু ভিন্ন নিরাপদ নয়। এই গুরুকে বাউলেরা আখ্যা দিয়েছেন 'সাঁই' বলে। 'মুর্শীদা' আর 'মারফাতি' গান বাউলেরই দুটি বিশেষ সুর। বৌদ্ধধর্মজাত গুরুবাদের প্রভাব পারস্যে এবং সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। এই বৌদ্ধ-গুরুবাদের সঙ্গে সুফী-গুরুবাদের মিলন ঘটেছিল ভারতবর্ষে। মুসলমান সুফীরা এবং বৌদ্ধ শ্রমণেরা একইভাবে গুরুকে শ্রদ্ধা করতেন। এই শূন্যবাদ, সহজবাদ ও গুরুবাদ মিলিয়ে তবেই বাউল তাঁর স্বধর্মে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। অনেকে এই বাউলের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে বলেও অনুমান করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

'বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কামে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥'

এই সূত্র থেকে যদি বৈষ্ণবে ও বাউলে কিছু একটা সম্বন্ধ দাঁড় করানো যায়, তবে বোধ করি অনেকেরই আপত্তি থাকে না।

বাউলেরা সর্বত্রই কিন্তু তাঁদের নিজেদের বাউল বলেই পরিচয় দিয়েছেন। বলেছেন—

'তাইতে বাউল হইনু ভাই,
এখন লোকের বেদের ভেদ-বিভেদের
আর তো দাবী-দাওয়া নাই।'

ভারতের শাস্ত্রীয় ভাববাদ ও লৌকিকবাদের একত্র সমন্বয় ও বিস্তৃতি ঘটেছে এই বাউলে। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষাশেষি বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় সর্বপ্রথম বাউলের জন্ম। ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁদের আধিক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং একসময় মহাপ্রভুও যে এই বাউলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না। আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই বাউলদের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়ে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বলেছেন: 'পশ্চিমবঙ্গে বৈষ্ণব কাঠামোর উপর চুনকাম করিয়া বাউল সাজিয়াছে, পূর্ববঙ্গে ইসলাম কাঠামোর উপর রং দিয়া ফকির সাজিয়াছে, পূর্ববঙ্গের বে-সরা ফকির এবং পশ্চিমবঙ্গের বাউল এক আধ্যাত্মিক মিরাসের উত্তরাধিকারী।'

সাধারণতঃ স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর শ্রেণীদের মধ্যে বাউলের প্রাধান্য দেখা গেলেও কালক্রমে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে বাউলের প্রাণরস বিকীর্ণ হয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক বাংলা সঙ্গীতের একটা বিস্তৃত অংশ জুড়ে আছে এই বাউল। সমস্ত শ্রেণী থেকে তাঁরা একেবারেই স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। অনেকটা আপনভোলা বা উদাসী বলে লোকে তাঁদের বাতুল বলে মনে করে; কিন্তু আসলে তাঁরা তা নন্। বাউল ভিন্ন তাঁদের কোনো স্বতন্ত্র জাত নেই। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে মিলে গড়ে উঠেছে এই বাউল সম্প্রদায়। তাই বলে তাঁদের মধ্যে কোনো রেশারেশি নেই, বরং হিন্দু-মুসলমান মিলনের তাঁরা উদ্গাতা।

ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ: 'আনন্দরূপমমৃতং', এই আনন্দে গিয়ে পৌঁছাতেই মানুষের যুগ যুগ ব্যাপী সাধনা। বাউলেরা মানুষের উপর অধিক মূল্য আরোপ করেছেন তাঁর মনের মানুষ বা আনন্দময় ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যলীলায়। তাঁর সঙ্গে লীলাই তাঁকে পাওয়া—অধরাকে জ্ঞানে ও প্রেমে ধরা—নিত্যনিরঞ্জনকে নিরন্তর নিজের বোধের মধ্যে ধরা। বেদবাদের রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করে যেসব বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের ধারা ভারতীয় মানব-ইতিহাসে একদা ছড়িয়ে পড়লো, যেমন জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ, শৈব, শাক্ত, তন্ত্র, বৈষ্ণব প্রভৃতি, বাউল এলেন এই তুলনামূলক ধর্মবিশ্বাসের নির্যাসকে নিজেদের সহজ পন্থায় গ্রহণ করে।

মন-মাঝি এই মনের মধ্যে অবস্থান করে এই দেহ-বৈঠা দিয়ে জীবনতরণী বেয়ে চলেছেন অনন্ত সংসার-সমুদ্রে। বাউলের কণ্ঠে তাই কেবলই ব্যাকুল প্রার্থনা: 'মন-

মাঝি তোর বৈঠা নে রে, / আমি আর বাইতে পারলাম না।' এই মন-মাঝিই তাঁর নিত্যানিরঞ্জন 'মনের মানুষ'। চণ্ডীদাস যেমন মানবমহিমা কীর্তন করেছেন, তেমনি বাউল সম্প্রদায় মানবদেহকে কেন্দ্র করে দেহাতীত সত্তায় গিয়ে পৌঁছাতে 'কায়া-সাধনা'র আশ্রয় নিয়েছেন। তনু থেকে অতনুতে উত্তরণই বাউল-সাধনা। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন ঃ 'আমি রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি', এখানে রূপ থেকে অরূপ-রতনের যে প্রত্যাশা, তনু থেকে অতনুসত্তার প্রত্যাশাও একই ভাবার্থক। এই ভাবকেই সহজভাবে গ্রহণ করে বাউলেরা দিব্যরসে মজেছেন। এই দিব্যরসই দিব্যভাব বা মহাভাব। দিব্যভাবেই শ্রীরাধা কৃষ্ণগত হন। রাধা তো কৃষ্ণেরই স্বরূপে প্রকাশ। যেই কৃষ্ণ, সেই রাধা, রাধাকৃষ্ণ এক, তেমনি বাউলও অতনুসত্তায় নিজেকে রাধাসত্তা মনে করে আপন তনুতে তন্ময় হয়ে ওঠেন। এই প্রেমই তাঁকে মহাভাবে নিমজ্জিত করে—যেমন করেছে শ্রীচৈতন্যকে। ভক্তিযোগে ভক্তের যে ব্রহ্মানুভূতি, ভাগবত তাকেই ছন্দে রূপ দিয়ে বলেছেন ঃ 'ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম করে আকর্ষণ। দিব্যদেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন।' যা দিব্যদেহ, তা ভাগবতী তনু। এই তনুতে তন্ময় শ্রীচৈতন্যের উপলব্ধিতে পেলাম ঃ 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূঃ', অর্থাৎ—ব্রহ্মই অনুভাবিতা, ব্রহ্মই অনুভূতি। তিনি যেমন সকলের মূল, তেমনি সকল প্রকার অনুভবের মূল ; সেই অনুভবের অনুভবী হওয়া জীবের মুক্তাবস্থা। জীবকে বন্ধনমুক্ত করতেই সাধকের জীবনসাধনা। শ্রীচৈতন্যের একই অঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি প্রবৃত্তি-যোগ ও নিবৃত্তিযোগ। গৌর হচ্ছেন প্রকৃতি, আর কৃষ্ণ পুরুষ। পুরুষ ও প্রকৃতির ঐকাত্মে প্রবৃত্তিযোগ আর ভিন্নাবস্থায় স্থিতি—নিবৃত্তিযোগ। প্রবৃত্তিযোগের অপর নাম প্রেম, আর নিবৃত্তিযোগের অপর নাম বৈরাগ্য। এই প্রেম ও বৈরাগ্য অভিন্ন বস্তু। এখানে প্রেমরূপী কৃষ্ণকে অন্তরে রেখে বৈরাগী বা সন্ন্যাসরূপী চৈতন্যের বহি-র্বিচরণ। এককথায় বলা যায়—চৈতন্য প্রবৃত্তিযোগে গঠিত কোমল গৌরতনুকে কঠোর সন্ন্যাসরূপ আবরণে আবৃত করে মূর্তিমান নিবৃত্তিযোগ। বাউল সাধনা সহজ সাধনা হলেও তার মূলগত সূত্র হচ্ছে এইখানে। এখানে রতি কখন আরতি হয়ে ওঠে, কাম কখন সধর্ম মনস্কামনায় জ্যোতির্ময় অতনুসত্তায় গিয়ে পৌঁছায়, সাধক তা নিজেই জানে না। তন্ত্রেও এই গুণটিই প্রকাশিত। হিন্দুতন্ত্রে ও বৌদ্ধতন্ত্রে যে চক্রসাধন আছে, বাউলেও সেই মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, আজ্ঞা ও সহস্রার—এই ষট্‌চক্রের সাধনা বিদ্যমান। তবে তাদের সাধনার প্রকৃতি হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র থেকে স্বতন্ত্র ; তাদের পথ সহজিয়া পথ। নৃত্য ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আলেক বা অলখ-সাধনা ঃ যে অলখ পুরুষ মনের মানুষ হয়ে মানবমনের মধ্যেই জেগে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন আদ্যাশক্তি মহাদেবীর উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ 'আমাকে রসে-বশে রাখিস মা, বাউলদেরও তেমনি রসে-বশে থাকতেই আনন্দ ; কারণ আনন্দময়ীর সংসারে আনন্দে থাকাটাই কাম্য। তা বিশুদ্ধ হিন্দুভাবেও হতে পারে, বৌদ্ধভাবেও হতে পারে, আবার ইসলাম ভাবেও হতে পারে। এখানে বেদান্তের

একেশ্বর ইসলামেরও একেশ্বর। বাউলের 'সাঁই' আর 'মনের মানুষ' সেখানে সম-অর্থেই একাত্ম ও একাকার। অন্তর্নিহিত কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করে তুলবার মধ্য দিয়েই এই সাধনার সিদ্ধি। 'শরীরমাদ্যং খলুধর্ম সাধনং' বলতে যা বুঝি, তার ব্যবহারিক সত্য নিহিত রয়েছে এই ষট্‌চক্র সাধনে। কিন্তু বাউলেরা কোনো ধর্মের তিতিক্ষাই তাদের সহজিয়া সাধনায় গভীরভাবে গ্রহণ করেন নি ; অথচ তাঁদের সাধনসঙ্গীতে যে দার্শনিক তত্ত্ব মেলে, তা অপরাপর ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের তুলনায় কোনো অংশে ন্যূন নয়। সকলেরই জপ-তপ আছে, সাধন আছে, কিন্তু সাধ্যের সিদ্ধি বা প্রকৃত ধর্ম তার বুদ্ধির অগম্য ও নাগালের বাইরে। তার জন্যেই মানবচিত্ত সদা ব্যাকুল, যেমন এই বাউল গানটি—

'আমি কেমন করে করবো বলো সত্য সাধনা!
আমায় সদাই চঞ্চল করে রিপু ছয়জনা।
ষোলজন করে ঝগড়া,
ভেঙে দিল সোনার আখড়া,
দেহের মধ্যে মানুষ মাকড়া, তারে চিনলাম না।
সত্যতে উৎপত্তি ধর্ম,
রাজা যুধিষ্ঠির তার জানে মর্ম,
জহরদ্দির বৃথা জন্ম, ধর্ম চিনলাম না।'

এই ধর্মে গিয়ে পেঁাছাতেই সব সাধকের সব সাধনা। যেমন অপর একটি গানে বলা হয়েছে—

'মন-পাখী, বিবাগী হয়ে ঘুরে ম'রো না।...
ভবে আত্মাতত্ত্ব পরম তত্ত্ব, যার করো উপাসনা।'

এই আত্মাতত্ত্বই পরম তত্ত্ব। যমের কাছে এই তত্ত্বই জানতে চেয়েছিলেন নচিকেতা। এই তত্ত্বই পরম কাম্য, পরম প্রাপ্তি, পরম মুক্তি।

সন্ধ্যামন্ত্র

বেদ অপৌরুষেয়। ঋষিগণ বেদ রচনা করেন নি, তাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র।

'ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারো নতু বেদস্য কর্তারঃ।
ন কশ্চিদ্ বেদকর্তা চ বেদস্মর্তা চতুর্ভুজঃ ॥'··

বেদকে তাই শ্রুতি বলা হয়। গুরুপরম্পরায় যা শ্রুত হ'য়ে আসছিল, বেদব্যাস সেই বেদকে চারভাগে সঙ্কলিত ক'রে স্বীয় শিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ববেদ শিক্ষা দেন। বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য অত্যধিক বিদ্যাভিমানের ফলে গুরু কর্তৃক পরিত্যক্ত হন এবং উপাসনা দ্বারা সূর্যদেবকে তুষ্ট ক'রে তাঁর নিকট পুনরায় বেদ বা অনন্ত জ্ঞান লাভ করেন। যাজ্ঞবল্ক্যলব্ধ বেদ শুক্ল যজুর্বেদ এবং যাজ্ঞবল্ক্য-পরিত্যক্ত বেদ কৃষ্ণ যজুর্বেদ নামে পরিচিত।

কিন্তু সন্ধ্যা-মন্ত্র সবগুলিই বৈদিকমন্ত্র নয়। ঈশ্বর-উপাসনার উপযোগী কয়েকটি বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে বেদোত্তর যুগের কয়েকটি উপাসনা-মন্ত্র যুক্ত হয়ে সন্ধ্যা-মন্ত্র সংগঠিত হয়। ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য, আহ্নিককৃত্য প্রভৃতি তত্ত্বানুযায়ী সামবেদীয় সন্ধ্যামন্ত্রের রূপান্তর ভাষ্য রচনা করে একদা ভক্তপ্রবর ইন্দ্রমোহন চক্রবর্তী এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রূপান্তরভাষ্যের জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি তাঁর ব্যাখ্যায় স্পষ্টই দেখিয়েছেন—যাঁরা গুরু কর্তৃক উপবীত ধারণ করেন, গায়ত্রীমন্ত্রসহ সন্ধ্যাহ্নিককৃত্য তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য। উপবীত ধারণ ব্যতীতও এই মন্ত্রসমূহের প্রাণদায়ী শক্তি অভাবনীয়। সন্ধ্যার তাৎপর্য হলো সম্যক ধ্যানের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

'উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ।
তামেব সন্ধ্যাং তস্মাত্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥' (ব্যাস)

ব্রহ্মকে ঋতস্বরূপ ও সত্যস্বরূপ বলা হয়েছে। সুতরাং, মানসিক যথার্থ সঙ্কল্প ও বাচিক যথার্থ ভাষণ ব্রহ্মোপলব্ধির প্রধানতম সোপান। কিন্তু দৈহিক পবিত্রতা এবং মন ও বাক্যের সংযম রক্ষা করা কঠিন। এই কারণে বলা হয়েছে—কায়মনোবাক্যে ভগবৎ-চিন্তাই প্রকৃত ধ্যান। ত্রিসন্ধ্যার মধ্যে দেহ, মন ও বাক্যের সমন্বয়যুক্ত ধ্যান রয়েছে—যার অপর নাম যোগ। যোগ অর্থে জগৎকারণ সনাতন ব্রহ্মে সমাহিত হওয়া। সন্ধ্যার মধ্যে রয়েছে একাধারে শরীর সুস্থ, সবল ও যোগক্ষম রাখবার কৌশল এবং মনকে নিয়ত ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবার নির্দেশ। ব্রহ্মোপাসনা ও শাস্ত্রীয় কর্ম একত্রে অনুষ্ঠেয়। শাস্ত্রীয় কর্মের দ্বারা অবিদ্যাদি সংসারবন্ধন অতিক্রম করা হয়, এবং ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা লাভ হয় অমৃতত্ব।

'বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥' (ঈশ)

পরমাত্মারূপ জ্যোতির্ময় সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত ; ঐ মুখ উন্মুক্ত হলে আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্তী পুরুষের কল্যাণতম রূপের দর্শন ও তাঁর সঙ্গে একাত্মযোগ ঘটে।

'অমৃতযোনৌ সত্যে জুহোমি স্বাহা।' (সন্ধ্যামন্ত্র)

'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥'···(ঈশ)

সন্ধ্যার আর একটি অর্থ—ত্রিসন্ধ্যা বা তিনটি সন্ধিক্ষণ, দিন ও রাত্রির নক্ষত্রবর্জিত সন্ধিক্ষণ ; মধ্যাহ্নও পূর্বাহ্ন ও অপরাহ্নের সন্ধিকাল ব'লে সন্ধ্যার অন্তর্গত। এই তিনটি ক্ষণই ঈশ্বরোপাসনায় বিশেষ উপযোগী এবং এই কারণে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে ত্রিসন্ধ্যা বিহিত। প্রাতঃ আরম্ভ করতে হয় সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্রাহ্ম মুহূর্তে, সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই করতে হয় সূর্যোপস্থান—উদীয়মান সূর্যের বন্দনা। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের মধ্যেই রয়েছে স্বাস্থ্যরক্ষার চমৎকার ব্যবস্থা। মন্ত্র অর্থে যা মনন করা যায়।

'মন্ত্রাঃ মননাৎ।' (যাস্ক)

অর্থান্তরে অভিযুক্ত ব্যক্তি যা মন্ত্র ব'লে গ্রহণ করেন, শুধু তাই মন্ত্র।

'মন্ত্রোঽয়মিত্যাভিযুক্তোপদিষ্ট মন্ত্রঃ। (জৈমিনি)

প্রথম অর্থটি ব্যাপক, দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। মন্ত্রোচ্চারণে মনের পবিত্রতা জন্মে এবং চিত্তের একাগ্রতা আসে। তখন মন্ত্রের মধ্যেই দর্শন করা যায় আরাধ্য দেবতার মূর্তি। উচ্চারিত প্রতিটি অক্ষর মহাকাশে এক একটি মূর্তি পরিগ্রহ করে সমষ্টিগত মন্ত্রের সমষ্টিগত মূর্তিই সেই মন্ত্রের দেবতার মূর্তি। মনে উদয় হয় যে মূর্তি, কথায় তার রূপপ্রকাশ মাত্র। বস্তুতঃ শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ বাক্য এক। যিনি ঋত (মানস), তিনিই সত্য (বাচিক)।

'ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি।'
(তৈত্তিরীয় ঃ শান্তি পাঠ)

'ওঁ বাঙ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্।'
(ঐতরেয় ঃ শান্তিপাঠ)

'ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।' (সন্ধ্যামন্ত্র)

'ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম।' (সন্ধ্যামন্ত্র)

সন্ধ্যার তৃতীয় অর্থ—সন্ধিক্ষণে যে দেবতার উপাসনা করা হয়, তিনি 'সন্ধ্যা', অর্থাৎ—তিনি তৎকালে সম্যক্ রূপে ধ্যানের বিষয়ীভূত হন। সন্ধ্যার মন্ত্রসকলের মধ্যে গায়ত্রী জপই প্রকৃত সন্ধ্যা, (গায়ন্তং ত্রায়তে ইতি গায়ত্রী); কারণ, 'ধীমহি' (ধ্যান করি) কথাটি শুধু গায়ত্রীতেই আছে।

সন্ধ্যার সমগ্র অনুষ্ঠানটির মধ্যে রয়েছে একই সঙ্গে শরীর ও মন উন্নত করবার চমৎকার একটি বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা। প্রাতঃসন্ধ্যার কথাই ধরা যাক। ব্রহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগের পর শৌচাদি ও হস্তপদাদি প্রক্ষালন ক'রে প্রথমে আপোমার্জন বা মন্ত্রস্নান।

মন্ত্রপাঠ করতে করতে মস্তকে জল সিঞ্চন ক'রে শরীরের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করা গেল, এবং পরবর্তী প্রাণায়ামের জন্য শরীরকে ঠিক ক'রে নেওয়া হলো। প্রাণায়াম (Breath Control) এক প্রকৃষ্ট ব্যায়াম। নিঃশ্বাস নিতে নিতে (পুরকের দ্বারা) নাভিদেশে সৃষ্টিরূপী ব্রহ্মার ধ্যান, শ্বাসরোধ ক'রে (কুম্ভকের দ্বারা) হৃদয়ে স্থিতিরূপী বিষ্ণুর ধ্যান এবং শ্বাস নিঃসরণ করতে করতে (রেচকের দ্বারা) ললাটে সংহাররূপী শম্ভুর ধ্যান করা হলো। প্রাণায়াম জনিত উত্তপ্ত শরীরকে স্নিগ্ধ করবার জন্য আচমন ক'রে তিনবার জলপান করা গেল। তারপর অঘমর্ষণ (নাসাপান—) (Nasal douche) ক'রে শরীরের আভ্যন্তরীণ শুচিতা সম্পাদন করা হলো। এবারে পূর্বাকাশে উদীয়মান সূর্যের দিকে মুখ করে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে আরম্ভ করা গেল সূর্যোপস্থান বা সূর্য-বন্দনা। প্রভাত-সূর্যের কিরণ এসে পড়লো সমস্ত শরীরের উপর, মন্ত্রপাঠের বিষয় সমূহ এসে পড়লো মনের উপরেও। সম্পন্ন হলো রৌদ্রস্নান (Sun Bath)। দেহমন উভয়ই হলো পবিত্র ; মনকে গ'ড়ে তোলা হলো ধ্যানের উপযোগী ক'রে। এবারে আবাহন করা হলো গায়ত্রীর। অঙ্গন্যাস ক'রে গায়ত্রীর ধ্যান করা হলো : 'ওঁ ভূর্ভুবঃ সঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।' গায়ত্রী জপ করতে করতে চিত্ত হলো সমাধিস্থ। সমাধির অন্তে মন আবার ফিরে এলো পাঞ্চভৌতিক জগতে, এলো চাঞ্চল্য ; তাই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিঘ্ন হ'তে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা গেল সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। রুদ্র যিনি তাঁর দক্ষিণ মুখের দ্বারা আশ্রিতকে সর্বদা রক্ষা করেন, সেই রুদ্রদেবতারও স্তব করা হলো : 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।' সর্বশেষে অন্ধকার ও পাপবিনাসন সূর্যকে অর্ঘ্য দিয়ে ও নমস্কার ক'রে সন্ধ্যার পরিসমাপ্তি। সন্ধ্যার এই ক্রমগুলি এমন একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে তিনবেলা নিয়মিত সন্ধ্যা করলে দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতি সুনিশ্চিত।

গায়ত্রীর অর্থোপলব্ধি সহ মন্ত্রপাঠ সহকারে স্নানের মধ্যে রয়েছে স্নান করতে করতে বিশ্বের সাথে নিজের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া। এইরূপে ক্ষিতি-অপ-তেজঃ-মরুৎ ও ব্যোমাত্মক বিশ্বের যে কোনো মহাভূতের কথাই চিন্তা করা যাক না কেন, তার প্রত্যেকটির মধ্যে রয়েছেন এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—যাঁদের সমষ্টি হলেন পরমাত্মরূপী সবিতা। এইরূপে উপর্যুপরিক্রমে অবস্থিত ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যম্—এই সপ্তলোকের দেবতা হলেন যথাক্রমে অগ্নি, বায়ু, সূর্য, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেব ; এবং সেই সপ্তলোক ছন্দিত হলো যথাক্রমে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টুভ ও জগতী ছন্দে। এই যে প্রত্যেক কাজের মধ্যেই দেবতাজ্ঞান, বিশ্বের সাথে পরিচয়, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ, এটা মনন বা মন্ত্র ভিন্ন হয় না।

এরপর প্রাণায়াম। শ্বাস নিরোধই প্রাণায়াম। পূরক, কুম্ভক ও রেচক—এই তিনের সাহায্যে প্রাণায়াম করতে হয়। প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে

প্রাণায়াম, কারণ প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যেই রয়েছে পূরক, কুম্ভক ও রেচক। ব্যবধান যা কিছু, তা শুধু সময়ের পরিমাণের। আমাদের এই যে দেহ—এর মধ্যেই রয়েছেন সকল দেবতা—জলরূপে জলদেবতা, বায়ু রূপে বায়ুদেবতা, অগ্নিরূপে অগ্নিদেবতা ইত্যাদি। বায়ুকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলা হয়েছে। যে বায়ু আমাদের শরীরকে অধিকার করে রয়েছেন, ইনি পঞ্চধা বিভক্ত, যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান। প্রাণায়ামে নাভিদেশে সৃষ্টিদেবতা ব্রহ্মার ধ্যান, হৃদয়ে স্থিতিদেবতা বিষ্ণুর ধ্যান এবং ললাটে লয়দেবতা মহেশ্বরের ধ্যান বিহিত। আমাদের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসেই রয়েছে এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের রহস্য। সপ্তলোক নিয়ে যেমন নিখিল বিশ্ব, সেইরূপ আমাদের বিশ্বপ্রতীক এই দেহমধ্যেও এই সপ্তলোক পূর্ণরূপে প্রকাশিত।

'ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥' (গীতা)

সূর্যোপস্থানের মধ্যেও স্বাস্থ্যরক্ষার একটি প্রকৃষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে। উন্মুক্ত স্থানে উন্মুক্ত সূর্যের দিকে সূর্যবন্দনা—একদিকে যেমন শরীর হচ্ছে রৌদ্রপ্লাবিত, অন্যদিকে মনও চলেছে সেই সবিতার পানে। দেহ ও মনের একত্র প্লাবন। গায়ত্রী মন্ত্রে যে ভর্গ অর্থাৎ তেজঃস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা বিহিত রয়েছে, সেই তেজঃ সূর্যমণ্ডলেই সমধিক বর্তমান বলে গায়ত্রী জপের পূর্বে তদাধারভূত সূর্যের উপাসনা বিহিত। অনুরূপ ভাবে গায়ত্রী জপের পরেও সূর্যার্ঘ্যদান ও সূর্যনমস্কার বিহিত রয়েছে। জগৎসবিতা পরব্রহ্মের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াত্মক ভর্গের উপাসনাই গায়ত্রীমন্ত্রে সন্নিহিত।

'আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্।
হৃদয়ে সর্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি ॥
হৃদ্যাকাশে তু যো জীবঃ সাধকৈরুপবর্ণতে।
স এবাদিত্যরূপেণ বহি র্নভসি রাজতে ॥' (যাজ্ঞবল্ক্য)
'সবিতুঃ—সর্বান্তর্যামিতয়া প্রেরকস্য জগৎস্রষ্টুঃ
পরমেশ্বরস্য।' (সায়ণ)
'দেবস্য সবিতুঃ ভর্গরূপম্ অন্তর্যামি ব্রহ্ম।' (রঘুনন্দন)

যুগযুগান্ত ধরে চলে আসছে এই সাত্ত্বিক উপাসনা হিন্দুভারতে।—

'ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।
ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।
ঊর্ধ্বলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ ॥'
'ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
ওঁ রুদ্রায় নমঃ ॥'
'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥' (ঈশ)
॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

গুরুগ্রন্থ সাহিব

‘গুরুগ্রন্থসাহিবজী’তে নানক-প্রবর্তিত শিখধর্ম বিধৃত রয়েছে। ‘গুরুগ্রন্থসাহিবজী’ একটি বিশাল গ্রন্থ, তার অধিকাংশই গুরুমুখী বা প্রাচীন পাঞ্জাবী ভাষায় লিখিত এবং এর বাণী সমূহ ‘শবদ’ বা উপদেশ নামে পরিচিত। ‘শবদ’ সমূহ অনেকসময় পৌড়ী বা কবিতা নামেও আখ্যায়িত হয়। ‘শবদ’ রচয়িতা গুরুদের নাম পর্যায়ক্রমে ‘মহলা’ নামে ব্যবহৃত হয়েছে। পঞ্চম গুরু শ্রীঅর্জুনজীর উদ্যোগে গুরুদের দ্বারা প্রবর্তিত শবদসমূহ ভিন্ন বিভিন্ন ভক্ত মহাপুরুষদের বাণীও ‘গুরুগ্রন্থসাহিবজী’তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ভক্ত মহাপুরুষেরা হলেন জয়দেব, কবীর, নামদেব, ত্রিলোচন, পরমানন্দ, সবান, বেনী, রামানন্দ, ধন্না, পিপা, সৈন, রবিদাস, ফরিদ ও ভিকন। এখানে হিন্দু-মুসলমানে কোনো ভেদ নেই। সকলেই সংশ্লিষ্ট ও অন্তর্ভুক্ত। দশম গুরু শ্রীগোবিন্দ সিংজীই প্রত্যক্ষভাবে শিখধর্মের শেষ গুরু। তাঁরই নির্দেশে ‘গ্রন্থ-সাহিবজী’ই শাশ্বত গুরুরূপে অভিষিক্ত হয়। তদবধি এই ‘গুরুগ্রন্থসাহিবজী’ই শিখ-ধর্মাবলম্বীদের একমাত্র স্বীকৃত, পূজ্য ও আরাধিত গুরু বা গুরুর প্রতীক স্বরূপ পুণ্যগ্রন্থ। গ্রন্থভুক্ত শবদরাজি একত্রিশটি রাগানুসারে গ্রথিত হয়ে ঈশ্বরোপাসনায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই রাগগুলি হচ্ছে—শ্রীরাগ. রাগমাঝ, গৌড়ী, আশা, গুজরী, দেবগংধারী, বিহাগড়া, বড়হংস, সোরব, ধনাসরী, জৈৎসরী, টোডী, বৈরাড়ী, তিলঙ্গ, সূহী, বিলায়ল, গোংড, রামকেলী, নটনারাইন, মালগৌড়ী, মারূ, তুখারী, কেদার, ভৈংরো, বসংত, সারংগ, মলার, কাণড়া, কল্যাণ, প্রভাতী ও জৈজাবংতী। এরপরে আছে শ্লোক, গাথা ও রাগমালা অধ্যায়।

গুরু নানকের যাবতীয় ‘পৌড়ী’ই ঈশ্বর-ভজনায় অভিব্যক্ত। নানকের ভজন মানেই তাঁর এই পৌড়ী বা কবিতাবলী। যেমন—

‘সাচা সাহিব সাচ না এ ভাখিআ ভাউ অপার।
অখহ মংগহ দেহ দেহ দাত করে দাতার।
ফের কি অগে রখী ঐ জিত দিসৈ দরবার॥
মূহ কি বোলন বোলী ঐ জিত সুখ ধরে পিআর।
অংমৃত ওয়েলা সচ নাউ ওয়ভিআঈ ওয়ীচার॥
করমী আওয়ে কপড়া নদরী মোখদুআর।
নানক এওয়ে জানী ঐ সভ আপে সচিআর॥’

অর্থাৎ—‘সত্য প্রভু, সত্য তাঁর নাম, অপার প্রেমের সঙ্গে এই নাম উচ্চারণ করতে হয়। দাও দাও বলে সকলেই তাঁর নিকট যাচ্ঞা করে এবং দাতা অর্থাৎ পরমেশ্বর দান করেন। সেই পরমাত্মা পুরুষের সামনে কি উপচার রাখবো—যার দ্বারা তাঁর সভা দর্শন করতে পারবো! মুখে কি বাক্য উচ্চারণ করবো—যা শুনে তিনি প্রীত

হবেন ? অমৃত বেলায় অর্থাৎ—ব্রহ্মমুহূর্তে তাঁর সত্য নাম জপ এবং তাঁর মহিমা কীর্তন, তাতেই তিনি প্রীত হবেন। পূর্বকর্ম অনুসারে আহার, বস্ত্র অর্থাৎ আবরণরূপ এই দেহলাভ হয়, কিন্তু তাঁর কৃপাদৃষ্টি দ্বারাই জীবের মোক্ষলাভ হয়ে থাকে। নানক তাই বলছে—এই কথাটি জেনো—সত্যস্বরূপ প্রভু বা পরমেশ্বরই সব।'

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণীতেও নানক-বাণীরই স্পর্শ পাই। আসলে তপঃসিদ্ধ পুরুষমাত্রেরই এই একই বাণী। তাঁরা ঈশ্বরদ্রষ্টা পুরুষ, তাঁর বিভূতি প্রকাশেই তাঁদের আবির্ভাব। গুরু নানকের আবির্ভাবও আমরা এইভাবেই লক্ষ্য করি। পাঞ্জাবের তালবন্দি গ্রামে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়, ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন ঈশ্বরমুখী পুরুষ। তাঁর ধর্মবিশ্বাসে কোনো জাতিভেদ বা বর্ণস্বাতন্ত্র্য ছিল না। দেবালয় ও মস্‌জিদ ছিল তাঁর কাছে একই অর্থবহ। বেদান্তবাদী হিন্দু ও ইসলামধর্মী মুস্‌লিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি কখনো ভেদরেখা টানেননি। জীবমাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান—এই মহাজ্ঞানই তাঁকে এক বিরাট সমন্বয়ধর্মী সাধকে পরিণত করেছিল। তাঁর দেহাবসানের পর তাই দেখা যায়—তাঁর নশ্বরদেহের অন্ত্যেষ্টির জন্য হিন্দু ও মুসলিম উভয় শ্রেণীই সমান দাবীদার হয়ে এগিয়ে আসে। কবীর, দাদু প্রমুখ মধ্যযুগীয় সাধকবৃন্দের সমমানসিকতার পুরুষ ছিলেন গুরু নানক। একদা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে তাঁর সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ঘটে। নানক ছিলেন একাধারে সাধক ও কবি। তাঁর যাবতীয় কাব্যসৃষ্টিই ছিল ঈশ্বরভজনা মূলক। সৃষ্টির আদিতেও ঈশ্বর, অন্তেও ঈশ্বর, ঈশ্বরের দ্বারাই এই বিশ্ব আচ্ছাদিত, ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই তাই বলা হয়েছে ; 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ',—এই মহাজ্ঞানের তপস্বী সাধক ছিলেন গুরু নানক। ধর্মবিশ্বাস এবং সামাজিক নীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদারপন্থী। এই ঔদার্যের মহিমাতেই তিনি শিখসম্প্রদায়কে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছিলেন। তাঁর সঙ্গীত বা ভজনাবলীই 'গুরুগ্রন্থসাহিবজী'র অন্যতম প্রাণস্বরূপ ও পথপ্রদর্শক।

দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ ছিলেন শিখ-বর্ণমালা 'গুরুমুখী'র আবিষ্কারক। ১৫৩৮ থেকে ১৫৫২ খৃষ্টাব্দের মানুষ ছিলেন তিনি। তৃতীয় গুরু অমরদাস (১৫৫২-১৫৭৪) লঙ্গরখানার প্রবর্তন ক'রে জাতিভেদ প্রথা রদ করতে উদ্যোগী হন। সর্বসাধারণের সঙ্গে একত্রে ভোজনের মধ্যে যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বিকাশ, লঙ্গরখানার প্রবর্তন মূলতঃ সেই উদ্দেশ্যেই। চতুর্থ গুরু রামদাস যে রামদাসপুর নগর স্থাপন করেন, পরবর্তীকালে সেই রামদাসপুরই হয় অমৃতসর। তাঁর উদ্যোগেই স্বর্ণমন্দির বা হর-মন্দিরসাহিব প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। গুরু রামদাসের কনিষ্ঠ পুত্র অর্জন বা অর্জুন (১৫৮১-১৬০৬) হন শিখদের পঞ্চম গুরু। তাঁর সঙ্কলিত আদি গ্রন্থই গ্রন্থসাহিবের ভিত্তিস্বরূপ। অর্জুন-পুত্র হরগোবিন্দ (১৬০৬-১৬৪০) হন ষষ্ঠ গুরু। তিনি দু'টি তরবারী ব্যবহার করতেন ; একটি আধ্যাত্মিক শক্তির ও অপরটি জাগতিক শক্তির প্রতীক। তিনিই প্রথম অত্যাচারকারী মোঘলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তাঁর পৌত্র

হররাই (১৬৪৫-১৬৬১) সপ্তম গুরুর পদ গ্রহণ ক'রে দারা শিকোহর সঙ্গে সৌহার্দ্য সম্পর্ক স্থাপনে যত্নবান হন। দারা শিকোহও ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। কিন্তু তাতে ঔরঙ্গজীব ক্ষিপ্ত হয়। হররাইয়ের দ্বিতীয় পুত্র হরকৃষণ (১৬৬১-১৬৬৪) স্বল্পকাল জীবিত ছিলেন। তিনিই শিখদের অষ্টম গুরু। নবম গুরু তেগবাহাদুর (১৬৬৪-১৬৭৫) নানা ভূভাগে শিখধর্মের প্রসারে আত্মনিয়োগ ক'রে ঔরঙ্গজীবের প্ররোচনায় মোঘল সৈন্য কর্তৃক নিহত হন। ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকাল ভারতের ইতিহাসে নৃশংসতা ও কলঙ্কের কাল। তাঁর এই নৃশংস অত্যাচার বুঝতেই তেগবাহাদুরের পুত্র দশম গুরু গোবিন্দ সিং (১৬৭৫-১৭০৮) শিখদের অস্ত্রশিক্ষা দেন এবং শিখযোদ্ধা 'খালসা' বাহিনী সৃষ্টি করেন। তিনিই শিখদের পদবী দেন 'সিং' অর্থাৎ সিংহের মতো সাহসী ও শক্তিধর। তাঁর দুই পুত্রও মোঘলের হাতে নিহত হন। গুরু নানকের পর গোবিন্দ সিংই ছিলেন শিখদের সবচাইতে প্রভাবশালী গুরু। তিনিই শিখদের কেশ, চিরুনী, লৌহবলয়, কৃপাণ ও প্যাণ্ট বা কুচ্ছ ধারনের প্রবর্তন করেন। তাঁর জীবন ছিল একাধারে বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গে মহিমান্বিত। তিনি স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ করেন। তিনি ঘোষণা করেন তিনিই প্রত্যক্ষতঃ শেষগুরু। অতঃপর 'গুরুগ্রন্থসাহিব'ই শিখ সম্প্রদায়ের কাছে গুরুর স্থান লাভ করবে। 'শিখ' শব্দের মূলগত অর্থ—শিষ্য। গুরু ভিন্ন শিষ্য হয় না। তাই শিখ-সমাজে গুরুর স্থান সকলের ঊর্ধ্বে। সেই থেকে প্রত্যেক শিখমন্দিরে 'গ্রন্থসাহিব' বিশেষ সম্মানের সঙ্গে পূজিত হয়।

শিখেরা মূলতঃ অদ্বৈতবাদী। ঈশ্বর এক ভিন্ন দুই নন, এ শিক্ষা গুরু নানকের। সেই শিক্ষা থেকে শিখেরা কখনো বিচ্যুত হয়নি। ঈশ্বর একাধারে সগুণ ও নির্গুণ ; তেমনি তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা। তাঁর সৃষ্ট এই জগতের মধ্যেই তিনি ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। জগৎ একটা ভূয়ো পদার্থ নয়, এ তাঁরই লীলা প্রকাশ, তাই জগৎ সত্য। তিনি যেমন বিশ্বময়, তেমনি বহির্বিশ্বেও তিনি। মানবদেহে আত্মারূপে তিনি বিরাজিত, তাই মানুষমাত্রেই দেববিগ্রহ ; তার মধ্যে ঈশ্বরত্ব জাগ্রত হলেই সে নিজেকে সেই বিগ্রহরূপে জানতে পারে। ঈশ্বরনির্ভর হয়েই শিখেরা হিন্দুদের ন্যায় কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। আবার বৈষ্ণবদের মতো কখনো-বা তাঁরা দ্বৈত সাধনায়ও তৃপ্তি পান। যেখানে বলা হয়েছে 'অহং ব্রহ্মাস্মি', সেখানে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না, তাঁকে পাবার তৃপ্তিতেই দ্বৈতানুভূতি। এখানে হিন্দুধর্মের সঙ্গে শিখধর্মের মূলগত কোনো প্রভেদ নেই। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন যেমন হিন্দুদের আচরণীয়. তেমনি শিখদেরও। সৎকর্মের দ্বারা পুণ্যফল লাভ এবং অন্যায় কর্মের পরিণাম নরকবাস, এখানেও উভয় ধর্মের একই বিশ্বাস। গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে জীবনে তাকে সার্থক করে তবেই পরম গুরু শ্রীভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব—শিখ-ধর্মের এইটেই প্রধান শিক্ষা। সেখানে জাতিভেদ প্রথার কোনো স্থান নেই। 'যত্র জীব, তত্র শিব'—এ শিক্ষা গুরু নানকেরও, শ্রীরামকৃষ্ণেরও। মানবদেহই যখন ঈশ্বরের প্রধান মন্দির, তখন এই দেহকে পবিত্র ও শৌর্য-বীর্যসম্পন্ন ক'রে তোলাই

মানব মাত্রের ইতিকর্তব্য। দেহের পাপ যখন মনকে কলুষিত করে, তখন ঈশ্বর-ভজনা থেকে বিরত হয়ে মন কেবলই বহির্মুখে গমনে প্রবৃত্ত হয়। তাই শাস্ত্রে আত্ম-সংযমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর সকল ধর্মের সার কথাই হচ্ছে এই। এখানে শিখধর্মের স্বতন্ত্র বিধান বলে কিছু নেই। যদিও শিখেরা ক্রমে নামধারী, আকালি, নিরঙ্কারী ও নানকপন্থী সম্প্রদায়ে সম্প্রসারিত, কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য তাঁদের একই। তাঁদের মধ্যে ধূমপান ও মদ্যপান যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি পরিচ্ছন্নতাও অবশ্য পালনীয়। ধর্মের পথে এ সবই সহায়ক। মূল লক্ষ্য ঈশ্বর-উপলব্ধি, তাঁর মহিমার উদ্দেশ্যে নিজেকে নিবেদন।

'মলার মহলা (৫)'-য় বলা হয়েছে—

'হে গোবিন্দ হে গোপাল হে দয়াল লাল।
প্রাণনাথ অনাথ সাথে দীন দরদ নিওয়ার ॥
হে সম্রথ অগম পূরণ মোহ্ ময়ংত্মা ধার্।
অন্ধ কূপ মহা ভয়াল নানক পার উতার ॥'

অর্থাৎ—'হে গোবিন্দ, হে গোপাল, হে দয়াল প্রভু! প্রাণনাথ, নিঃস্বের বন্ধু, দীনের দুঃখমোচনকারী! হে সর্বশক্তিমান, অপরিমেয়, পূর্ণ প্রভু! আমাকে কৃপা করো। নানক বলে ঃ সাংসারিক অন্ধকূপের ভয়াল অন্ধকার থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার করো।'

এই পূর্ণ আত্মসমর্পণই শিখধর্মের মূল মন্ত্র। এই মন্ত্র থেকে বিচ্যুতি মানেই ধর্ম থেকে বিচ্যুতি। 'গুরুগ্রন্থসাহিব' তাই শিখদের ধর্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ আধার।

কোরাণে ধৈর্য, ক্ষমা ও সম্প্রীতির বাণী

[একদা নিয়মিত কোরাণ ও হাদিস পাঠ শুনবার আমার অবকাশ ঘটে। তখনই মনে পড়ে—ধর্মসমন্বয়ের সূত্রে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন একসময় গিরিশচন্দ্র সেনকে দিয়ে কোরাণ শরিফ বাংলায় অনুবাদ করান। আর শ্রীরামকৃষ্ণ পরহংসদেবের মুসলীম-ভাবে সাধনা তো ইতিহাস-সিদ্ধ হয়ে আছে!—পরবর্তীকালে কোরাণ ও হাদিস সম্পর্কে যাঁদের সঙ্গে আমার বিশেষ আলোচনা হয়, তাঁদের মধ্যে মওলানা মণিরুজ্জমান ইস্‌লামাবাদি, কাজী আব্দুল ওদুদ ও মওলানা আহমদ আলী প্রধান। মওলানা মণিরুজ্জমান সেই সূত্রে আমাকে তাঁর সযত্নে পঠিত রাজা রামমোহনের জীবনীগ্রন্থটি উপহার দেন। কারণ রামমোহনই প্রথম মধ্যযুগীয় সাধক-সম্প্রদায়ের ভাবধারায় ধর্মসমন্বয়ের সূত্রে সকলের জন্য ইসলাম ও বেদান্ত চর্চার দরজা খুলে দেন। ভবিষ্যৎ-কালে তারই সম্মিলিত প্রতিরূপ লক্ষ্য করি কাজী নজরুলের মধ্যে। তাঁর সঙ্গেও আমার এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ ঘটে। তিনি তাঁর 'জিঞ্জির' কাব্যে ইসলামের বাণী সম্পর্কে লেখেন—

'ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ দুখ সমভাগ ক'রে নেব সকলে ভাই ;
নাই অধিকার সঞ্চয়েব।
কারো আঁখিজলে কারো জাড়ে কিরে জ্বলিবে দীপ!
দু'জনার হবে বুলন্দ্‌ নসিব, লাখে লাখে হবে বদ্‌নসিব ;
এ নহে বিধান ইসলামের।'...

কাজী আব্দুল ওদুদও বাংলায় কোরাণ রচনা করেন। সাম্প্রতিককালে বাংলাভাষায় আরও দু'একটি গ্রন্থ বেরিয়েছে। মওলানা আহমদ আলী একদা সাম্প্রদায়িক বিরোধ-কালে 'কোরাণের শিক্ষা—হিংসা ও অহিংসা' নামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে আমার যে ভাবময় আলোচনা হয়, সেই আলোচনাই আমাকে উদ্বুদ্ধ করে কোরাণের মূল কিছু প্রয়োজনীয় বাণীকে অর্থবহ ক'রে প্রকাশ করতে। যে অসহনীয় কালের স্রোতে আমরা ভেসে চলেছি, সেখানে জাতিগত, সম্প্রদায়গত, ধর্মগত ও বর্ণগত বিভেদের শেষ নেই। সেখানে প্রতিটি মানুষকে আজ প্রতিটি ধর্মীয় বাণী শোনাবার প্রয়োজন। তাতে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বিভেদ দূর হ'তে পারে। কারণ জীবন সকলেরই প্রিয়।]

যদিও পৃথিবীতে ইসলাম সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম হিসেবে প্রচারিত, তবু হিন্দু, খ্রীষ্টীয় ও অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলাম ধর্মেরও মূল বাণী হচ্ছে—জীবে দয়া এবং অহিংসা ও প্রেম। যেখানে প্রেমের বন্ধন, সেখানে বিভেদ অর্থহীন। কোরাণে বলা হয়েছে ঃ ন্যায় এবং ধর্ম অনুসারে পরস্পরের সাহায্য করো, কিন্তু অন্যায় বা অসূয়া দ্বারা নয়।

নিত্য উপাসনা করো, দান করো এবং ঈশ্বরনিষ্ঠ হও।

এই সূত্রে কোরাণের কয়েকটি বয়াত এখানে উল্লেখযোগ্য ঃ

সুরা 'মোম তাহনাতের' ২য় রুকুতে আল্লাহর বাণী হিসেবে বলা হয়েছে ঃ 'লায়্যান-হাকুমুল্লাহো আনিল্লাজিনা লাম ইউকাতেলুকুম ফিদ্দীনে অলাম্ ইউখ্‌রেজু কুম মিন দিয়ারেকুম, আন্ তাবাররুহুম অতুকছিতু এলায়হিম ইন্নাল্লাহা ইউহিব্‌বুল মুক্‌ছিতিন।'

অর্থাৎ—'যারা তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি, অথবা তোমরা মুসলমান ব'লে বিদ্বেষবশতঃ তোমাদেরকে স্বদেশ হ'তে বিতাড়িত করেনি, সেইসব ভিন্নধর্মাবলম্বীর সঙ্গে বান্ধবতা স্থাপন করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচারের পরিচয় দিতে কখনোই আল্লাহ নিষেধ করেন নি, বরং আল্লাহ এ কথাই বলেছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ন্যায়াচারিদেরকে প্রেম করেন।'

'সুরা মায়দা'র ৫ম রুকুর একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ '...আল্লাহ মান্ কাতালা নাফ্‌ছান বে গায়রে নাফ্‌ছিন আও ফাছাদিন ফিল আর্‌দে ফাকাআন্নামা কাতালান্নাছা জামিআন্ ; অ মান আহ্‌য়্যাহা-ফাকাআন্নামা আহ্‌য়্যান্নাছা জামিআ।'

অর্থাৎ—'যে ব্যক্তি জীবনের বিনিময় অথবা ভূপৃষ্ঠে উৎপাত সৃষ্টির অপরাধ ব্যতীত একজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মনুষ্যসন্তানকে হত্যা করলো, আর যে-ব্যক্তি একজন বিপন্নের জীবন রক্ষা করে, সে যেন সমস্ত মনুষ্যসন্তানকে জীবন দান করলো!'

ইসলাম যে ধৈর্য ও অহিংস নীতির দ্বারা অধৈর্য ও হিংসাকে প্রতিরোধ করতে শিক্ষা দেয়, এবং নরহত্যা যে ইসলামের কাছে কতবড় জঘন্যতম পাতকের কাজ, তা কোরাণের বিভিন্ন উক্তি থেকে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ধৈর্য ও ক্ষমার কথাও সেখানে একই সঙ্গে উক্ত হয়েছে।

'সুরা নাহাল' ১৬ রুকুতে বলা হয়েছে ঃ 'অ-ইন্ আকাবতুম ফা-আকেবু বেমেছ্‌লে মা-উকিবতুম বিহি, অলাইন্ ছাবারতুম লাহুয়া খায়রুল্লিছাবে রিণ।'

অর্থাৎ—'তুমি যদি কারুর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হও, তবে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাইলে প্রাপ্ত আঘাতের সমপরিমাণ আঘাত করতে পারো, কিন্তু যদি ধৈর্যধারণপূর্বক ক্ষমা করতে পারো, তবে তা ধৈর্যশীলের পক্ষে একান্তই কল্যাণকর।'

অপর ধর্মকে আক্রমণ করা থেকেই ধর্মের বিবাদ সৃষ্টি হয়। এজন্য 'সুরা নাহাল' ১৬ রুকুতে বলা হয়েছে ঃ 'উদ্‌উ এলা ছাবিলে রাব্বেকা বেল হেক্‌মাতে ওয়াল্‌মাওয়োজাতিল হাছানাতে অ জাদেলহুম বেল্লাতি হিয়া-আহছান ; ইন্না রাব্বাকা হুয়া আ'লামো বেল্ মুহ্‌তাদিন।'

অর্থাৎ—'তুমি জ্ঞান ও সুন্দর উপদেশযোগে লোক সকলকে তোমার প্রতিপালকের পথে অর্থাৎ—সত্যপথে আহ্বান করো এবং যদি তারা তর্কে প্রবৃত্ত হয়, তবে সুনীতিসম্মত উপায়ে তাদের সঙ্গে তর্কে যোগ দেবে। কে পথপ্রাপ্ত আর কে পথভ্রষ্ট, তোমার প্রতিপালক তা সম্যক অবগত আছেন।'

এই আয়াতে আক্রমণাত্মক কর্কশ ভাষায় ধর্মপ্রচার করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং জ্ঞান ও সুন্দর উপদেশযোগে মানুষকে বোঝাতে বলা হয়েছে। লোকের সত্য-বিমুখতা দেখে অধৈর্য আসতে পারে, এজন্য সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, কে সত্য-প্রাপ্ত আর কে সত্যপ্রাপ্ত নয়, তা তোমার প্রভু উত্তমরূপে অবগত আছেন, সুতরাং কেউ যদি সত্যগ্রহণ না করে, তাতে তোমার বিচলিত হবার কারণ নেই।

অন্যত্র পৌত্তলিকগণের উপাস্য দেব-দেবীকে নিন্দা করতে নিষেধ ক'রে 'সুরা এনআম' ১৩ রুকুতে বলা হয়েছেঃ 'অলা তাছুব্বুল্লাজিনা ইয়াদউনা মিনদুনিল্লাহে ফা ইয়াছুব্বোল্লাহা আদঅম বেগায়রে এল্‌মিন।'

অর্থাৎ—'পৌত্তলিকগণ খোদার পরিবর্তে যে সকল দেব-দেবীর পূজা করছে, তোমরা তাদের নিন্দা কোরো না ; অন্যথায় তারাও জেদের বশবর্তী হ'য়ে অজ্ঞতা-বশতঃ আল্লাহ্‌কে গাল দেবে। পৌত্তলিকগণ যদিও মূর্তিপূজা করে, তবু তারা অনন্ত আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী।'

এতদ্ব্যতীত বলপ্রয়োগদ্বারা ধর্মগ্রহণ করাতে চেষ্টা করা যে আল্লাহ্‌ সমর্থন করেন না, তা 'সুরা বকর'স্থিত 'লা একরাহা ফিদ্দিনেঃ ধর্মপ্রচারে বলপ্রয়োগ বৈধ নয়'—এই উক্তি দ্বারা বোঝা যায়। সুতরাং যে আল্লাহ্‌ একজন নিরপরাধ লোকের হত্যাকে সমগ্র মনুষ্যজাতির হত্যার তুল্য অপরাধ ব'লে মনে করেন, এবং যিনি পরধর্ম ও অন্যের পূজ্য দেব-দেবী ও উপাসনালয় আক্রমণ করতে নিষেধ ক'রে জ্ঞান ও উপদেশযোগে ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা দিয়েছেন, তিনি কি প্রকারে ধর্মের নামে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা, গৃহদাহ ও নরহত্যা সমর্থন করতে পারেন? কোরাণে বহুস্থানে যে 'ফাসাদ' বা দাঙ্গাহাঙ্গামার উৎপাতকে আল্লাহ্‌ অপ্রিয় বস্তু ব'লে উল্লেখ করেছেন, ধর্মের নামে সেই 'ফাসাদ' তিনি কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন? যিনি প্রকৃত আঘাত-কারীকেও ক্ষমা করতে উপদেশ দিয়েছেন, তিনি কি কখনো—যারা প্রস্তরাঘাতের কল্পনামাত্রও করেনি—সেইসব নিরপরাধ পুরুষ-নারী ও শিশুর হত্যাকাণ্ড সমর্থন করতে পারেন? কোরাণ বজ্রনির্ঘোষে এইসব নিষ্ঠুরতামূলক কার্যকে ক্ষমাহীন মহা-পাতকের কাজ ব'লে নির্দেশ দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক নবী ও রসুলেরই বাণী হচ্ছেঃ 'পরমেশ্বরই তো এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন! তবে কেন তোমরা সেই সর্ব-শক্তিমান অন্তর্যামীকে ত্যাগ ক'রে মূর্তির পূজা করছো? এস, আমরা সকলে তাঁরই পূজা করি এবং তাঁরই নিকট মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপন করি।'

ইসলাম-ধর্মাবলম্বী মুসলীম সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তির যেমন এই কথাগুলি বিশেষভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন অপরাপর ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরও। কারণ এই সম্মিলিত উপলব্ধির উপরেই নির্ভর করে সকলের সঙ্গে প্রেমে ও প্রীতিতে বাস ক'রে মানবিক মূল্যবোধের উত্তোরণ।

সুভাষিতম্

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি

যেমন সা-রে-গা-মা সেধে সেধেই গান, যেমন জলে নেমে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তেই সাঁতার, তেমনি কর্ম করতে করতেই জ্ঞান। সা-রে-গা-মা যেমন গানের সোপান, জলে অঙ্গ সঞ্চালন যেমন সাঁতারের সোপান, তেমনি কর্মই হচ্ছে জ্ঞানের সোপান। কর্মের মধ্যেই তাই শতায়ু কামনা ক'রে ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে ঃ 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমা।' তার সঙ্গে যুক্ত থাকে সংযম। জীবনের বহুরূপী এই কর্ম হচ্ছে ঈশ্বরেরই কর্ম। সব কর্ম ঈশ্বরে গিয়েই পৌঁছাচ্ছে, কারণ কর্মের অধিকর্তা যে তিনিই। কর্ম করতে করতে এই বোধটি যখন জাগ্রত হয়, তখনই জ্ঞানের দরজা খুলে যায়। কর্মযোগ তখন এসে মেশে জ্ঞানযোগে। কর্মীর তখন জ্ঞানই প্রধান। সা-রে-গা-মা সাধতে সাধতে যেমন একটা রাগে এসে মন স্থির হয়, তেমনি কর্ম করতে করতে জ্ঞানে এসে কর্মী প্রজ্ঞার আলোকে তপস্যায় স্থিত হয়। এই জ্ঞানই তো ব্রহ্মজ্ঞান, সকল বিদ্যার সার বিদ্যাই যে ব্রহ্মবিদ্যা। কেনোপনিষদ তাই বলেছেন ঃ 'তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা,' অর্থাৎ তপস্যা, সংযম ও কর্ম হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা। এই জ্ঞানের মূল আকর হচ্ছে মন, মনকে তাই ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনার নির্দেশ দিয়ে ছান্দোগ্য বলেছেন ঃ 'মনোব্রহ্ম ইত্যুপাসীত।' কর্ম যাঁকে স্পর্শ করে, জ্ঞান তাঁকে নিবিড় করে জানে। আর এই জানার পরিসমাপ্তি ঘটে ভক্তিতে। তখন আর স্পর্শ বা নিবিড়তা নয়, তখন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া। এই আচ্ছন্নতাই ভক্তিযোগ। কর্ম ও জ্ঞানের মহামিলন ভক্তিতে। এই ভক্তি কার প্রেমে নিমজ্জিত ? না—যিনি 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।' তিনিই একমাত্র জানবার—'তম্ এব বিদিত্বা,' তাঁকেই জন্ম-জন্মান্তরের সকল কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি নিবেদিত। এই নিবেদনই তাঁর সঙ্গে প্রেম, তাঁকে জানা, তাঁর সঙ্গে একাত্মতা।

ব্রাহ্মমুহূর্ত

ঈশ্বরকে ডাকার কি কোনো নির্দিষ্ট সময় আছে ? প্রত্যক্ষেই হোক কি পরোক্ষেই হোক, তাঁর সঙ্গে যে প্রতিমুহূর্তের প্রতিনিঃশ্বাসের যোগ ! মাতৃকল্পনায় এখানে পার্থিব মায়ের সঙ্গে ব্রহ্মময়ী মহামায়ার কোনো ভেদ নেই। সন্তানের মনে মায়ের রূপটি সর্বত্রই এক। শুধু মাতৃগত হওয়া চাই। মা ভিন্ন আর কিছু জানিনে, এইটেই মাতৃগত ভাব। অন্তরে এই ভাবটি জাগিয়ে তোলার জন্যেই জপ, ধ্যান ও আরাধনার দরকার। কিন্তু যে-সন্তানের মধ্যে এই ভাবটি জন্মসূত্রেই প্রবল, তাকে আর জপে বসতে হয় না। কি লোকালয়ে, কি নির্জনে তার মননই প্রধান। সন্তানের মননই মায়ের

অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। পরমহংসদেব একেই জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি পুরুষের নিদিধ্যাসন বলেছেন। পার্থিব যোগের মতো বিশ্বাত্মা ও পরমাত্মার যোগও একই রকম। সন্তানের আত্মিক শক্তি মায়ের স্নেহময় প্রাণকাযে গিয়ে ঝঙ্কৃত হয়। তিনি যে সর্বানুভুঃ, সদাজাগ্রত প্রাণশক্তি। তিনি যে প্রাণের মধ্যেই জেগে আছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে সাধকেরা বলেন ঃ কোণে, মনে ও বনে জপ আরাধানা করবে। সম্পূর্ণ নির্জনতা ভিন্ন মন একাগ্র হয় না, আর মন একাগ্র না হলে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় না। এজন্যে ঋষি-নির্দিষ্ট কাল হচ্ছে প্রাগূষা বা ব্রাহ্মমুহূর্ত। ভক্ত তুলসীদাস বলেছেন—

'পয়লা পহরমে সব কোই জাগে
দুস্‌রে পহরমে ভোগী,
তিস্‌রে পহরমে চৌর জাগে,
চৌথা পহরমে যোগী।'

'চৌথা পহর' মানে সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত। কিন্তু মহামায়া বা ব্রহ্মকে একান্ত চিত্তে যখনই স্মরণ করা যায়, তখনই তো ব্রাহ্মমুহূর্ত! আমাদের কর্ম ও চিন্তাসূত্রগুলিকে যদি নানা প্রহর দিয়ে ভাগ করি, তবে সকল কর্মের মধ্যেও মনের একটা বিশেষ মুহূর্তকে ব্রাহ্মমুহূর্ত বলে গ্রহণ করা যায়। কেবল দেখতে হবে, সেই মুহূর্তটি যেন একান্তভাবে তাঁরই মননের মুহূর্ত হয়। রামপ্রসাদ তাই সহজ ক'রে বলেছেন—

'কাজ কি আমার যেয়ে কাশী!
মায়ের পদতলে প'ড়ে আছে
গয়া, গঙ্গা, বারাণসী।'

গৃহ-কোণের দরকার নেই, বনে যাবার দরকার নেই, সব বন-কোণ গয়া-গঙ্গা কাশী-বৃন্দাবন মায়ের পদতলেই সমাচ্ছন্ন। সেইখানে প্রণতি নিবেদনই আত্ম-নিবেদন। আসলে চাই ঈশ্বরগত মন, চাই মাতৃগত ভাব। সেই ভাবমুহূর্তটিই ব্রাহ্মমুহূর্ত।

জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ

যিনি জন্মরূপে সৃষ্টিশীলা, তিনিই মৃত্যুরূপে লীলাময়ী। জন্ম-মৃত্যুর এই প্রবাহে তিনি নিত্য অচঞ্চলা। তিনি আপনি এসে দেহ ধারণ ক'রে ধরা দেন এই ভুবনে, আবার আপন লীলা-অবসানে জীর্ণ বস্ত্রের মতো দেহ ত্যাগ ক'রে অন্তর্হিত হন। তিনিই আসেন, তিনিই যান। মহাবিশ্বে এই তাঁর প্রতিমুহূর্তের খেলা। এই খেলা খেলতেই তাঁর বিশ্বরচনা। সব হার-জিতের পালা তাঁর এইখানে। যাঁকে তিনি জিতিয়ে দিচ্ছেন, তিনিও তিনি, আবার যাঁকে তিনি হারিয়ে দিচ্ছেন, তিনিও তিনি। দাতা হয়ে তিনি ভিক্ষা দিচ্ছেন, গ্রহিতা হ'য়ে তিনিই আবার ভিক্ষা গ্রহণ

করছেন। তিনি কোথাও রাজা, কোথাও ফকির, কারুর মুখে তিনি হাসি, আবার কারুর মুখে তিনি কান্না। পার্থিব জগতে আকৃতিগত দেহরূপের নামকরণ আছে, সব নামকে তিনি নিজের নামাবলী দিয়ে আচ্ছন্ন ক'রে আছেন। আমাদের আত্মীয়-সমাজে আমরা যে নব-প্রজন্মকে ঘিরে আনন্দের হাট বসাই, আর বিয়োগান্ত দৃশ্যে শোকে নিমজ্জিত হই, সে শুধু মায়াবদ্ধ নামরূপ দেহ নিয়ে। কিন্তু দেহ আর দেহী যে এক নয়, তা উপলব্ধি করি—যখন দেহ ছেড়ে দেহী অন্তর্হিত হন। যতক্ষণ দেহকে কেন্দ্র ক'রে তিনি আছেন, ততক্ষণই এই দেহ ঘিরে সকলের অনলস উচ্ছ্বাস। ততক্ষণই অমুক বাবু, তমুক বাবু, অমুক দিদি, তমুক দিদি। দেহ ছাড়লে সব নামরূপ-দেহের একই পরিণাম। সেখানে গীতার সেই 'বাসাংসি জীর্ণানী যথা বিহায়ঃ।' এ যেন খাঁচার মধ্যে অচিন পাখীর নিত্য আসা-যাওয়া। বাউল তাই গেয়েছে—

'খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী
কমনে আসে যায়!
ধরতে পেলে মনোবেড়ি
দিতাম তারি পায়।'

কিন্তু ধরা যায় কি ? যায় না। ধরা যায়না বলেই তিনি অধরা। জন্ম-মৃত্যুর আধিকারিক হয়েও তিনি জন্ম-মৃত্যুর অতীত। রবীন্দ্রনাথ তাই গাইলেন—

'জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে তুমি রয়েছ দাঁড়ায়ে।'

দুই হাতে তাঁর কালের মন্দিরা বেজে চলেছে ; মহাকালকে অতিক্রম ক'রে দ্রুত বেগে প্রধাবিতা হচ্ছেন মহাকালী। এই প্রধাবিত সময়-সীমাটাই জীবন, আর অতিক্রমণটাই মৃত্যু। কোনো মুহূর্তকে ধ'রে রাখার উপায় নেই ; প্রতিমুহূর্তই প্রতিমুহূর্তের মৃত্যু ঘোষণা করছে। জন্মটাই আশ্চর্য, মৃত্যুটাই সত্য। বিশ্বের এই পরম বিস্ময় যিনি সুখ-দুঃখের অতীত হ'য়ে ধরতে পারেন, তিনিই যোগী। তাঁর যোগ তাঁরই সঙ্গে —যিনি প্রতিনিঃশ্বাসে মহাবিশ্বে মায়ার সৃষ্টি ক'রে সেই মায়াকে আপন লীলায় অতিক্রম ক'রে মহামায়া মহাপ্রাণ হ'য়ে বিরাজ করছেন। উপনিষদ তাই বলেছেন ঃ 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণঃ এজতি নিঃসৃতম।' —বিশ্বের যা কিছু সমুদয়, তা মহাপ্রাণ থেকে উচ্ছৃত হ'য়ে প্রাণের মধ্যেই নিঃসৃত হচ্ছে, আবার প্রাণ থেকে মহাপ্রাণেই তার সম্পৃক্তি। জন্ম-মৃত্যু চলেছে এই আবর্তন আর বিবর্তনের ঘূর্ণিচক্রে। সবই সেই অচিন পাখী, সেই অচিন সত্তা—যাঁকে দেহের মধ্যে পাওয়া যায় না, অথচ দেহে আছেন বলেই দেহ সঞ্চরণশীল। তাঁকে জানবার জন্যেই তাঁর এই বিচিত্র রূপের প্রকাশ, এই বিশ্ব রচনা। তাঁকে জানবার জন্যেই জীবন, আর তাঁকে জানতে জানতেই জীবনাবসান। এই তাঁর খেলা, এই তাঁর লীলা। তিনি নিজেকেই আস্বাদ করছেন। নাম রূপে, শব্দ রূপে, রূপে রূপে বিচিত্র রূপে। অনির্বাণ শিখা তিনি।

গায়ত্রী

যিনি মাতা, তিনিই ইষ্ট, তিনিই গুরু, তিনিই মন্ত্র। সাধকের কাছে ঈশ্বরের মাতৃরূপটিই মধুর রূপ। গায়ত্রীসূত্রে আমরা সেই মাধুর্যময়ী মাতৃরূপটিই প্রত্যক্ষ করতে অভিলাষী। এই সূত্রের প্রথম শব্দটি 'ওঁ'—যা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কে ধারণ করে আছে। যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম, যিনি পরম ব্রহ্ম, যিনি মহাশক্তি মহামায়া, যিনি একাধারে সত্যম, শিবম. সুন্দরম, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যাঁর পরম সৃষ্টি, যিনি পরমা প্রকৃতি, যাঁর মধ্যে এই সমুদয়েরই স্থিতি ও লয়, সেই মহাশক্তি আমাদের ধ্যানে এই 'ওঁ'-য়ে স্থিত। এই শব্দটি উচ্চারণ ক'রে আমরা সেই আদ্যাশক্তি মহামায়ার মহিমার উদ্দেশ্যেই প্রণত হই। দ্বিতীয়তঃ বলা হয়েছে 'ভূর্ভু'ব, স্বঃ', অর্থাৎ তিনি ভুলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক মিলিয়ে বিরাজ করছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তাঁর আসন পাতা। তিনি Omnipotent ও Omnipresent. তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও সর্বানুভুঃ; তাঁর অবিদিত কিছু নেই; তিনি মহান থেকে মহীয়ান, কণা থেকে কণীয়ান, অন্তরে বাহিরে সর্বত্র তিনি বিরাজিতা, অধিষ্ঠিতা। তিনি কুলকুণ্ডলিনী, তাঁকে জাগ্রত করলেই চিত্তের জাগরণ; তিনি সাবিত্রী, চিৎস্বরূপিনী তিনি। ঈশোপানিষদ তাঁরই উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।'—এই সমুদয় বিশ্ব তাঁর দ্বারাই আচ্ছাদিত। গায়ত্রীতে তৃতীয়তঃ বলা হয়েছে ঃ 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ', অর্থাৎ—অন্তর্যামী তিনি, শুধু সূর্যবর্ণ ধারণ করেই দিব্যবিভায় তিনি প্রকাশিতা নন, একই সঙ্গে তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ ঘটিয়ে তা বিষয়ে প্রেরণ করছেন ও ধীশক্তি প্রদান করছেন। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, the self of the universe, সূত্র হিসেবে গায়ত্রী তাই এক মহামন্ত্র।

'ওঁ' স্বরূপা বিশ্বজননীকে উপলব্ধি এই একটি মন্ত্রের দ্বারাই সম্ভব। লৌকিক সমাজে গায়ত্রী জপ তাই হিন্দুর উপবীত ধারণের আবশ্যিক অঙ্গ। কারণ বেদান্তধর্মী হিন্দুর কাছে এই অদ্বৈত শক্তিই একমাত্র উপাস্য। হিন্দুর পূজার্চনায় নানা মূর্তির আধারে সেই একই পরমা শক্তি রূপে রূপে শতরূপে বিরাজিতা। এই বহুধাকল্পিত রূপের মূলে বিরাজ করছেন সেই এক অনির্বচনীয় অনন্য সত্তা—যিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। তিনি শুধু হিন্দুর নন, তিনি নিখিল মানবের অন্তর্যামী। তিনি 'বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ'। তিনি মহাকাশ হয়ে মহাশূন্য রচনা ক'রে রয়েছেন, তাই সূর্যকে উদ্দেশ্য ক'রে বলা হয়েছে ঃ হে আদিত্য, হে অপাবৃণু, হে পূষণ, তোমার হিরণ্ময় আবরণ উন্মোচন ক'রে আমাকে সেই পরম সত্যকে দেখতে দাও। —আবার জীবদেহে তিনি আত্মারূপে বিরাজ করছেন, তাই আত্মার উন্মেষ ঘটিয়ে তাঁকে উপলব্ধির জন্যে বলা হয়েছে ঃ 'আত্মানং বিদ্ধিঃ।' রবীন্দ্রনাথ বললেন ঃ "ব্রহ্মকে সহজ ক'রে জানবার শক্তিই আমাদের সত্যকার শক্তি; সেই শক্তি আমাদের আছে; জানতে পারছিনে বলে সে-শক্তিকে কখনোই অস্বীকার করবো না। বার

বার তাঁকে ডাকতে হবে, বার বার তাঁকে বলতে হবে, 'এই তুমি, এই তুমি, এই তুমি। এই তুমি আমার সম্মুখেই, এই তুমি আমার অন্তরেই।' বলতে বলতে তাঁর নামে আমার সমস্ত শরীর বাজতে থাকবে, আমার মন বাজতে থাকবে, আমার বাহির বাজতে থাকবে, আমার সংসার বাজতে থাকবে। আমার চিত্ত বলবে 'সত্যং', আমার বিশ্বচরাচর বলবে 'সত্যং'। ক্রমে আমার প্রতিদিনের প্রত্যেক কর্ম বলতে থাকবে 'সত্যং'। তখন স্বভাবতঃই মনে হবে 'আমি সত্যলোকে জ্ঞানলোকে বাস করি, আমি ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত।"

গায়ত্রীমন্ত্রের এইখানেই সার্থকতা। তাঁকে উপলব্ধির জন্যে তাই উপদেশচ্ছলে স্বামী প্রণবানন্দ বললেন ঃ 'খুব জপ-ধ্যান করো, গায়ত্রী পাঠ করো, তবেই সব বুঝতে পারবে। জপ-ধ্যান ব্যতীত চিত্ত শুদ্ধ হয় না, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত শুদ্ধ জ্ঞান জন্মে না, আব শুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত ধর্মতত্ত্ব কখনো উদ্ভেদ হয় না।' কারণ—'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।' —সাধক তাই একাগ্রচিত্তে স্তবে বসেন, করজোড়ে প্রণাম নিবেদন করে বলেন—

'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু,
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু,
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।'

আর সেই সূত্রে আরাধ্য দেবীমূর্তির সামনে উপবেশন ক'রে মাতৃ-উপাসক উচ্চারণ করেন—

মহাদুর্গা, মহামায়া, মহাকালী, মহেশ্বরী,
জগদ্ধাত্রী, জগন্মাতা, প্রণমামি জগদীশ্বরী।
মহাশ্বেতা, মহালক্ষ্মী, নিত্য শুদ্ধা সনাতনী,
নমো নমঃ বিশ্বরূপা, নমো দেবী নারায়ণী।

এই বিশ্বরূপা নারায়ণীই রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণের ভবতারিনী মহাকালী, প্রণবানন্দের ত্রিশূলধারিনী ষড়ৈশ্বর্যময়ী জগজ্জননী, তিনিই গায়ত্রী মাতা, জগন্মাতা, জগদ্বল্লভ, জগদীশ্বরী। সর্বমানবের তিনিই একমাত্র উপাস্য ; তিনি একাধারে প্রকৃতি ও পুরুষ।

চিরমুক্তি

যিনি মহামায়া, তিনিই মায়া হ'য়ে এই বিশ্বে বিরাজিতা। জীবকে মায়াবদ্ধ ক'রে তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর বিশ্বলীলা সাঙ্গ করছেন। তিনি অনাদি, অতীত। মহাকাশ হ'য়ে তিনি মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত, আবার মহাপ্রাণ হয়ে সর্বজীবের প্রাণের মধ্যে প্রাণময় হয়ে আছেন। বিচিত্র বেশে বিচিত্র লীলায় তিনি লীলায়িত। তিনি চির প্রকাশমান, অথচ চির পলাতক। একদিন তাঁর উদ্দেশেই লেখনীতে ক বিতা এলো—

ক্ষুদ্র এই দেহ দিয়ে কি ক'রে ধরে রাখি
তোমার অনন্ত চিন্ময়ী সত্তা ?
দূরদৃশ্য ঐ যে দিগন্তপ্রসারি মহাকাশ,
সে-ই কি পারে ঠাঁই দিতে তোমাকে ?
তোমার লীলাপ্রকাশ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে
আপন স্পর্শ রেখে তুমি অদৃশ্যে বসে হাসো।
কী বিস্ময়, কী পরম বিস্ময় তুমি !
অথচ একটি পুষ্পের কোমল পাঁপড়িতে
বিচিত্র রং আর সৌরভ হয়ে মিশে আছো তুমি,
আলো হয়ে আছো সূর্যে, চন্দ্রে আর তারায় ;
দৃশ্যে অদৃশ্যে সর্বভূতে সপ্রকাশ তুমি।
এই দেহের প্রতি-কোষের অগ্নি-সঞ্চারণে
তুমি বায়ুহিল্লো'ল নিত্য প্রবাহিত।
সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম তোমার গতি,
অথচ ভূমা থেকে ভূমা তুমি ;
পৃথিবীর ক্ষুদ্র তৃণ থেকে ব্রহ্মাণ্ডের লোকে লোকে
তোমার প্রতিমুহূর্তের উপস্থিতি,
প্রতিমুহূর্তে'র প্রচ্ছন্ন পলায়ন।
কী বিস্ময়, কী পরম বিস্ময় তুমি !
হে পলাতক, নিত্য পলাতক !
ক্ষুদ্র এই দেহে আমি কি ক'রে ধরে রাখি
তোমার অনন্ত চিন্ময়ী সত্তা ?

আমার সমগ্র সত্তাকে তাঁর পায়ে অঞ্জলি প্রদান ক'রে একান্ত চিত্তে বলি ঃ হে আমার চির আনন্দ, চির দুঃখ, চির বিরহ, চির সুখ ! তোমার বিশ্ববিমোহন চোখের অমৃত দৃষ্টি তুমি আমার প্রতি সঞ্চারিত করো। হে শান্ত, শুভ্র, হে জ্যোতির্ময়, হে দিব্য শিখা। তোমার ললাটবিচ্ছুরিত জ্যোতি বিকীর্ণ ক'রে আমার এই বিবর্ণ আননকে জ্যোতিষ্মান করো, তোমার জ্যোৎস্নাশুভ্র হাসির সুষমায় আমার সমস্ত কান্না তুমি মুছে দাও। আমার দৃষ্টিতে তোমার শুভদৃষ্টি দান করো, আমার কণ্ঠে তোমার বাণী দাও, চিত্তে তোমার মন্ত্র দাও। 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।' হে অব্যক্ত, হে ব্যক্ত, হে আবিঃ, চির প্রকাশিত—চির জাগ্রত, হে নিত্য, চিরন্তন, হে অনন্য—অনন্ত অসীম, হে অমৃত, হে সুধা, হে পূর্ণ, হে বিচিত্র, চির পুরাতন, চির নূতন ! তুমি আমার সকল দীনতা, সকল হীনতা দূর ক'রে আমার সকল মলিনতা তোমার শাশ্বত সৌন্দর্যে উজ্জ্বল করো, আমাকে নিঃশেষ ক'রে নিয়ে তোমার মধ্যে আমাকে পূর্ণ করো, তোমার সুধায় এই তৃষিত চিত্ত ভরে দাও। হে শিব, হে শাশ্বত কল্যাণ,

হে মৃত্যুঞ্জয়, হে সুন্দর—চির সুন্দর! প্রতিমুহূর্তের ক্লীবতা আর মৃত্যু থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও। আমার আয়ুকে তোমার পরমায়ু দিয়ে ভরে তোলো। আমার সমস্ত আকাঙ্খা আর কামনাকে তোমার উপাসনায় রূপায়িত করো ; আমার এই সমগ্র সত্তা যেন তোমার পূজার নৈবেদ্য হয়, আমি যেন এক অনন্য প্রার্থনা হয়ে প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো তোমার পায়ে অঞ্জলি হ'তে পারি! তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করো, সমস্ত পাপ ধ্বংস করো, তুমি যে 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং!' হে জীবনেশ্বর, হে পিতার পিতা, মাতার মাতা! আমার জীবনে তোমার জীবন যোগ ক'রে মহাজীবনের বিপুল রাগিনীতে তুমি আমার তৃষিত অন্তর ভরে তোলো। আমি তোমার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাই। সেখানে দুঃখ নেই, শোক নেই, মৃত্যু নেই, বিচ্ছেদ নেই, সে এক অনন্ত শান্তির লীলাবাস। সেখানে আমাকে আপ্লুত করো, পরিস্নাত করো, পবিত্র করো, পরিপ্লাবিত করো। আমার সকল আমিত্ব তোমার তুমিত্বে ভরে তোলো। তবেই আমার মুক্তি, চিরমুক্তি।

আমি, তুমি ও জগৎ

প্রশ্ন হলো : 'আমি কে ?'

—'আমি' হচ্ছে চৈতন্যময় সত্তা—যে সত্তা এই জীব-মানবদেহে নামরূপে বিরাজ করে। অহং ব্রহ্মাস্মি।

—'তুমি কে' ?

—তত্ত্বমসি। তুমিও সেই অমৃতময় চৈতন্যসত্তা ; ভিন্নতর নামরূপে জীব-মানব-দেহকে আবৃত ক'রে রয়েছে।

আবার প্রশ্ন হলো : 'জগৎ কি ?'

—জগৎ হচ্ছে সেই চৈতন্যসত্তার ভূমিক্ষেত্র। দেহ ধারণ ক'রে জীবের উদ্ভব হবে বলেই জগৎ তার নিজেকে চলমান সার্বভৌমরূপে সাজিয়ে রেখেছে। তাই সে পূর্ণ চৈতন্যের আনন্দসত্তা।

যে তাপের দ্বারা এ জগৎ সৃষ্ট ও স্থিত, সে তাপ সেই অমৃতময় চৈতন্যসত্তারই তাপ। এই তাপ থেকেই 'তপ' বা 'তপস্যা'। জগৎ তাই 'আমি' ও 'তুমি'র তপভূমি। তপের দ্বারা এই ভূমিকে ভূমার সঙ্গে যুক্ত করাই প্রকৃত কাজ। ভূমার সঙ্গে যুক্ত হলেই 'আমি', 'তুমি' ও 'জগৎ' এক হয়ে যাই। একই চৈতন্যময় সত্তার তিনটি ভিন্নতর অথচ অবিচ্ছিন্ন রূপ হচ্ছি আমি, তুমি ও জগৎ। নিত্য চলার গতিতেই জগৎ চলছে, তুমি চলছো, আমি চলছি। চলছি এই নামরূপকে কেবলই অতিক্রম ক'রে অরূপ অব্যয়ে—সেই অমৃতময় চৈতন্যে। একেই বলে আবর্তন, বিবর্তন ও প্রত্যাবর্তন। চৈতন্য থেকে আবর্তিত হয়ে জগতের বিবর্তনে বিহার ক'রে আবার চৈতন্যে প্রত্যাবর্তন।

রাধা-ভক্তি

শ্রীরাধা হচ্ছেন বিশ্বপ্রকৃতির দিব্য ব্রহ্মময়ী রূপ ; কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণভাবিনী ব্রহ্মময়ী শ্রীরাধা। কৃষ্ণ তাঁর অন্তরে বাহিরে সর্বত্র। গার্হস্থ্যধর্মের সর্বকর্ম জুড়ে তাঁর কৃষ্ণ, স্বপ্নে কৃষ্ণ, জাগরণে কৃষ্ণ, চলনে কৃষ্ণ, বলনে কৃষ্ণ, সখীবিহারে কৃষ্ণ, নির্জনে কৃষ্ণ, যমুনা-পুলিনে কৃষ্ণ, বেশে কৃষ্ণ, বাসে কৃষ্ণ, প্রতি-অঙ্গের লাবনী জুড়ে তাঁর কৃষ্ণের লাবণ্য বিভাসিত। কে কৃষ্ণ ? যিনি মুরলী বংশীধারী, তিনিই চক্রধারী রণকুশলী। এই কি কৃষ্ণ ? না, তিনি হচ্ছেন একই দেহে মহামায়ারূপী পুরুষোত্তম পরমব্রহ্ম। এই বিশ্ব-প্রকৃতি যাঁর করুণার ছায়ামাত্র, সমগ্র জীবজগৎ যাঁর ইচ্ছার প্রকাশ, তিনিই মহামায়া, মহাশক্তি, জ্যোতির্ময় পরমব্রহ্ম। ভক্তের নিত্য সাধনা এই বাঞ্ছিতকে পাবার। জীব-জগতের পুঞ্জীভূত ভক্তি তাই একমাত্র দিব্য ব্রহ্মময়ী শ্রীরাধার মধ্যে উচ্ছ্রিত হয়ে উঠেছে। ভক্তেব প্রতীক, ভক্তির প্রতীক, নিজেকে নিঃশেষে বিলীন করে দেবার আধার শ্রীরাধা। ভক্ত যখন শ্রীরাধা হয়ে ওঠে, তখনই তার কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে।

হৃদ্-শ্মশান

মানুষের হৃদয়ে চিরনন্দিত পুষ্পবিতানেব মতো একটি পরিব্যাপ্ত শ্মশানভূমি রচনারও প্রয়োজন আছে। পুষ্পবিতানে সে যেমন নিজেকে নানা সম্ভারে সাজিয়ে তুলতে পারে, তেমনি সেই শ্মশানভূমিতে সে দাহ করতে পারে তার অহংকে, তার দীন মনের নিম্ন বৃত্তিগুলিকে। বাইরের শ্মশান রয়েছে দেহের সৎকার সাধনের জন্য ; সে তো জীবনান্তের ইতিহাস ! কিন্তু জীবনকে তার আত্মবোধের মধ্যে উজ্জ্বল করে তুলতে হলে প্রয়োজন তার মনের ক্ষুদ্রতম অংশগুলির বিলুপ্তি। সেই অংশগুলি তার ষড়রিপুর দ্বারা আচছন্ন হয়ে আছে। তাতে শক্তি জোগাচ্ছে তার অহং। হৃদয়ের সজ্জিত শ্মশানে তাকে দাহ ক'রেই তবে পেতে হয় জীবনের পূর্ণতাকে। সেই পূর্ণতাই ফুটে আছে নন্দিত পুষ্পবিতানের মণিমালঞ্চে। তার বিচিত্রবর্ণ নানা পাঁপড়ির সুরভি নিয়েই জীবন হয় সুরভিত। মানুষের কাছে সেইটেই স্বর্গ।

ভাব-সঙ্গম

বিরাটের কীর্তি বিরাটের স্পর্শেই পূর্ণ হয়। সাগরের অবিরাম গতিতে মহা-সাগরের সৃষ্টি, সেই তো সাগরের পূর্ণতা। পূর্ণ হয়েই সে ধন্য হয়, কীর্তিমান হয়। কীর্তির্যস্য সঃ জীবতি। কীর্তিমান পুরুষই চিরকাল জীবিত থাকেন, জীবিত থাকেন দেহকে অতিক্রম ক'রে দেহাতীত সত্তায়। সেই সত্তাই ভাগবতী সত্তা। আর যখন স্বদেহে জীবিত থাকেন, সেই দেহ হয় ভাগবতী তনু। এই তনু থেকেই অতনুতে উত্তরণ। এই উত্তরণের জন্যই বিপ্লবীর বিপ্লবসাধনা, সাধকের যোগসাধনা, শিল্পীর শিল্প সাধনা, গায়কের সুরসাধনা। কর্মময় জীবনে প্রাণময় জীবনেশ্বরের আরতি চলে অবিরাম। সেই আরতির ধূপের সুরভিতে এসে সমবেত হন সাধনপথের নানা সাধক।

এই সমবেত সম্মেলনকেই বলা হয় মহাভাবসঙ্গম। নইলে কোনো ভাবই বিরাটের কীর্তি নিয়ে কান্তিময় হয় না, পূর্ণ হয় না।

যোগ

তাকেই তো যোগ বলে—যার দ্বারা যুক্ত হওয়া যায়। অঙ্কশাস্ত্রে আর ধর্মশাস্ত্রে এখানে পার্থক্য নেই। সংখ্যার সঙ্গে সংখ্যা জুড়ে দিলে যেমন অঙ্কের ক্ষেত্রে যোগ হয়, তেমনি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংযুক্তিই হচ্ছে যোগ। তেমনি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের, সীমার সঙ্গে অসীমের, স্বল্পের সঙ্গে বৃহতের এবং পৌরুষের সঙ্গে অপৌরুষের যে মিলন, সেই মিলনই যোগের দ্বারা সিদ্ধ হচ্ছে। 'গীতাঞ্জলি'র কবি যখন গাইলেন—

'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো',

তখন অনন্ত সত্তার সাথে পার্থিব সত্তার বা অসীমের সঙ্গে সসীমের যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষাই উদ্বেলিত হ'তে দেখা যাচ্ছে। যাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাঁদের কাছে এখানে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগসাধনটি বিশেষভাবে গ্রাহ্য। আমরা যাঁকে যোগীপুরুষ বলি, তিনি সাধনবলে নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে এক অলৌকিক ঐশিশক্তির অধিকারী হন ব'লে পার্থিব জগতে তাঁর সেই সঞ্চারিত শক্তির স্পর্শে মানুষের ঋদ্ধি সাধিত হয়। যোগের দ্বারা তিনি সিদ্ধ বলে লোকসমাজে তিনি সিদ্ধপুরুষ নামে আখ্যায়িত হন। শারীরবিদেরা স্বাস্থ্যের জন্য যোগ-ব্যায়াম করেন। প্রশ্ন হ'তে পারে —ঈশ্বর-যোগী আর যোগ-ব্যায়াম কি একবস্তু? উত্তরে বলা যায়—একই বস্তু। দু'টিই মন্ত্র-সাধন। একটি আত্মিক, আর একটি দৈহিক। একটি প্রাণের আরতি, আর একটি দেহের আরতি। একে বলা যায়—উভয়াঙ্গিক যোগ। এখানে সমস্ত দেহটাই মন হ'য়ে ওঠে, এবং গোটা মনটাই দেহরূপ ধারণ করে। মনের ইচ্ছা তাই দেহ চরিতার্থ করে এবং দেহের ইচ্ছা তাই মনের দ্বারা পরিপুরিত হয়। এই দু'য়ে মিলে যোগ এবং এই যোগ হচ্ছে অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে, অসীমের সঙ্গে, পরমাত্মার সঙ্গে। এই যোগের দ্বারা যে বিভূতি লাভ হয়, শাস্ত্রকারেরা তাকেই বোধকরি বিভূতিযোগ বলে থাকেন। ঈশ্বর-সাক্ষাৎ বলতে যোগী-ঋষিরা এই ঈশ্বর-বিভূতিকেই ইঙ্গিত করেন। তিনি নিরাকার জ্যোতিস্বরূপ। এই জ্যোতিই ঈশ্বর-বিভূতি। যিনি এই পরমাশক্তির সঙ্গে যুক্তাত্মা, তিনি নিজের মধ্যে সেই জ্যোতির স্পর্শে জ্যোতিষ্মান হ'য়ে বিশ্বলোকে বিভূতি সঞ্চার করেন। পার্থিব জগতে মাঝে মাঝে এমন জ্যোতিষ্মান ব্যক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁর কাছে অগণিত মানুষ গিয়ে ভিড় করে, ভিড় করে তাঁর সঙ্গে বিভূতিযুক্ত হ'তে, ভিড় করে তাঁর স্পর্শে ও বাণীতে নিজেদের জীবন ও কর্মকে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে ফলবান ক'রে তুলতে।

এই সংযুক্তি বা যোগই আনন্দ। যিনি যোগযুক্ত পুরুষ, তিনি সদানন্দ, তার কোনো বিকার নেই; যেমন পরমাত্মা নির্বিকার, তেমনি তিনিও বিকারহীন। এই দেহও

যখন যোগের দ্বারা সচল হয়, তখন আর ব্যাধি থাকে না। দেহচর্চার যেমন কতকগুলো 'প্রসেস' বা পদ্ধতি আছে, তেমনি মনোচর্চার দ্বারা সসীমকে অসীমে যুক্ত করারও একটা পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতির সার কথা হচ্ছে—একাগ্রতা। একাগ্র না হ'লে একাত্ম হওয়া যায় না, আর একাত্ম না হ'লে যোগে ভুল হ'য়ে যায়। এখানেও অঙ্কশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের একই কথা। মনকে একাগ্র করে তবেই যোগে বসতে হয়। এইভাবে মন যখন তার আপন আসনটি পেতে বসলো, তখন আর সংশয় সংক্ষোভ ব'লে কিছু থাকে না, তখন আনন্দ—শুধুই আনন্দ, তখন সবই আনন্দময় হ'য়ে ওঠে। যোগী তখন যোগানন্দ।

স্তব

এই মুহূর্তে আমি যাকে প্রাণ ভ'রে ডাকছি, সেই তো আমার প্রেম, আমার ঈশ্বর। এই মুহূর্তে আমার সমস্ত প্রাণ একটি ধ্যানে বিধৃত হলো। বিশ্বের যা-কিছু শব্দতরঙ্গ ও বিষয়বৈচিত্র্য—তার স্পর্শ থেকে দূরে এসে প্রাণ আমার আত্মস্থ হলো। আত্মস্থ না হ'লে ধ্যান আসে না, আর ধ্যানের পূর্ণতা না ঘটলে প্রেমকে পাওয়া যায় না, ঈশ্বর-লাভ হয় না। সংসারের হট্টগোলের মধ্যে প্রেম নেই, প্রেমের পথ চুপিসারের অভিসারের পথ, ঈশ্বরের পথও তাই। প্রেমাভিসারে মানুষের তাই একক-যাত্রা, ঈশ্বর-অভিসারেও তাই। প্রেম যদিও সর্বকিছুকে জড়িয়ে আছে, তবু প্রেমকে বিশেষ ক'রে সেই-ই পায়—যে তাকে সর্বকিছু থেকে স'রে এসে এককভাবে একান্ত ক'রে চায়; ঈশ্বরও তেমনি সর্বকিছুকে ধ'রে আছেন। তবু তিনি বিশেষ ক'রে ধরা দেন তাকেই—যে সর্বকিছু ফেলে একান্তে তাঁকেই সমস্ত প্রাণ সমস্ত অনুভূতি দিয়ে আকর্ষণ করে।

প্রেম হ'লে ভগবান
প্রেমে তবে ভরে প্রাণ।

এ তো তখনই হয়—যখন প্রাণের সঙ্গে প্রেমের ও ঈশ্বরের কোনো বিচ্ছেদ থাকে না। তখন প্রাণই প্রেম হয়, প্রেমই ভগবান হয়। এ যেন জ্যামিতির ক-খ-গ একটি ত্রিভুজ। প্রতিটি রেখার সঙ্গে প্রতিটি রেখা জুড়ে আছে, তাকে আলাদা করে নিলে শুধু রেখাই থাকে, ত্রিভুজ হয় না। প্রাণ, প্রেম ও ঈশ্বরও তেমনি একটি ত্রিভুজ। প্রাণ রেখাটিকে প্রেমে জুড়ে দাও, তারপর প্রেম রেখাটিকে ঈশ্বরে। সব মিলিয়ে এক অখণ্ড সত্তা।

আমার এই খণ্ড খণ্ড জীবনের বাইরে আমি চাই সেই এক অখণ্ড সত্তায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে। তাই প্রাণ ভ'রে আমি তাকে এই মুহূর্তে ডাকছি—যে আমার প্রেম, আমার ঈশ্বর। দিনের কোলাহলের বাইরে এই নির্জন নিশিতে আমার প্রেম আসবে ঈশ্বর হ'য়ে, আর ঈশ্বর আসবেন প্রেম হ'য়ে। আমার প্রাণে তাই ধ্যানের আসন সাজিয়ে আমি ধ্যানমগ্ন স্তব হ'য়ে ব'সে আছি।

পূজা

পূজা কথাটি বহু ব্যাপক। পূজাতত্ত্বে প্রার্থনাই আসল। কি প্রার্থনা এবং কার কাছে প্রার্থনা, এটুকু যদি বুঝতে পারি, তবে পূজা কথাটির সার্থকতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। আমরা প্রার্থনা করি তাঁরই কাছে—যিনি শ্রেয়, শ্রদ্ধেয় এবং শক্তিমান। এবং এই একই অর্থে জগৎকারণ পরম ঈশ্বরকেও বুঝি। আমাদের যত-কিছু প্রার্থনা, তা শক্তিমানের কাছ থেকে ক্রমে সেই ঈশ্বরে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। আর—কি প্রার্থনা করি? ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত হিতের জন্য আমরা সব কিছুই প্রার্থনা করে থাকি। সম্মান, প্রতিপত্তি, খ্যাতি, অর্থ, সম্পদ থেকে শুরু করে সুন্দরী স্ত্রী পর্যন্ত প্রার্থনার আমাদের শেষ নেই। এই প্রার্থনাই পূজার রূপ ধরে বর্ষচক্রে এক-একটা তিথিকে কেন্দ্র ক'রে লৌকিক বা সামাজিক ভিত্তিতে আমাদের কাছে এসে উদ্ভাসিত হয়। আমরা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে দেবতার মূর্তি গড়ে এই পূজার আয়োজন ক'রে থাকি। তাতে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না. প্রয়োজন হয় না কোনো আচার-আড়ম্বরের। শ্রদ্ধাকে পুষ্প ক'রে আমরা দেবতার উদ্দেশে অর্ঘ নিবেদন করি। কখনো আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হয়, মনে করি পূজো সার্থক হয়েছে; কখনো-বা অপূর্ণতার বেদনা মিশে থাকে আমাদের পূজার যা কিছু উপচার ও উপকরণে। প্রয়োজন হয় একাগ্র সাধনা ও নিষ্ঠার। কিন্তু এই ব্যক্তিগত প্রার্থনার দিক ভিন্ন পূজার্চনার একটি বড় সামাজিক দিকও আছে। এই দিকটি গোষ্ঠীগত বা সমষ্টিগত ভাবে আমাদের কাছে প্রতীয়মান। পূজানুষ্ঠান এখানে সার্বজনীন হ'য়ে তবেই উৎসবের সূচনা করে। সকলকে মিলিয়ে যে-আনন্দের সংযুক্তি, তাই উৎসব। এ উৎসবে পূজার মূলগত প্রার্থনার দিকটি গৌণ, আনন্দই প্রধান। হিন্দুর জাতীয় উৎসবরূপে দুর্গাপূজা পরিগণিত। দুর্গতিহারিনী দুর্গা মহাশক্তিস্বরূপিনী। তিনি সর্ব কলুষনাশিনী মহাদেবী। তাঁকে আমরা ব্যক্তিগত প্রার্থনায় যেমন রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি বলে প্রণাম করি, তেমনি সামাজিক জীবনে তাঁকে কেন্দ্র ক'রে উৎসবের মাধ্যমে একটা গোটা সপ্তাহ সুরে ও সঙ্গীতে ডুবে থাকি। তারপর বিজয়ার শুভ মুহূর্তে সামাজিক মিলনের দ্বারা আমরা সার্বজনীন মৈত্রীসুধা পান ক'রে প্রীতির আনন্দ বোধ করি।

পূজার এই উভয়াঙ্গিক রূপটিরই একটি বিশেষ মূল্য আছে। তবে দেখা প্রয়োজন—সার্বজনীনতা অর্থে বাহ্যাড়ম্বরটাই প্রধান হয়ে না দাঁড়ায়। ভারতীয় দর্শনে দেবীসূক্ত একটি মূল্যবান অধ্যায়। তার অন্তর্নিহিত ভাবটিকে ব্যক্তিগত জীবনে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। প্রার্থনায় শক্তির সঞ্চার হয়, জীবন ফলবান হয়ে ওঠে। তাই সার্বজনীন হয়েও আমরা যেন ব্যক্তিজীবনের সেই প্রার্থনার দিকে অবিচলিত থেকে দেবীর আশীর্বাদ লাভে সমর্থ হই। কারণ দেবীর আরাধনা পূর্ণতারই আরাধনা।

একটি ধ্যান

আমরা এই যে সংসারে এসেছি, সে শুধু সংসারকে কিছু দিতে, কিছু নিতে নয়। আমাদের আকাঙ্ক্ষার অবশ্য অন্ত নেই, প্রতিনিত্য আমরা আকাঙ্ক্ষার যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে আছি। সংসার থেকে এত পাচ্ছি, তবু পেয়ে পেয়েও আমাদের দাবীর অন্ত নেই। আমাদের জন্ম-কাল থেকে এ সংসার আমাদের কেবল দিচ্ছেই ; পিতা হ'য়ে দিচ্ছে, মাতা হ'য়ে দিচ্ছে, ভগ্নি হ'য়ে দিচ্ছে, জায়া হ'য়ে দিচ্ছে, বন্ধু হ'য়ে দিচ্ছে, স্বজন-পরিজন হয়ে দিচ্ছে, তারও বাইরে অকাতরে দান করছে প্রকৃতি। সবার কাছ থেকে পেয়ে পেয়ে আরও বেশী পাবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের পেয়ে বসে। পেতে পেতে মনে হয়—এই যেন আমার পাওনা, সবাই যেন আমার দাবী মেটাতেই বাধ্য। কিন্তু বুঝি না—যতই পাচ্ছি, ততই সকলের কাছে আমার ঋণ বেড়ে উঠছে! সে ঋণ সুদে-আসলে না মেটাতে পারলে আমাদের লজ্জার শেষ নেই, আমাদের এ জন্মের মুক্তি নেই। তাই সংসার থেকে আমরা যতটুকু পাচ্ছি, তার চতুর্গুণ তাকে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। জীবন ভ'রে যা ভোগ করছি আর সঞ্চয় করছি, তা যেন একটা দেবোত্তর সম্পত্তির ট্রাষ্টী হিসেবেই ভোগ করছি। সঙ্গে নিয়ে যাবার কোনো অধিকার নেই আমাদের।

এই ভাবের চিন্তাসূত্র থেকে মহাপুরুষেরা এ সংসারকে প্রবাস ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। এখানে শুধু দিতেই আসা, দিয়েই আনন্দ, নেবার রীতি নেই। যেটুকু নিচ্ছি, তা আরও অধিকতর দানের জন্যই গ্রহণ করছি। কিন্তু সংসারের বিরাট এক শ্রেণীর ভোগবাদী মানুষকে যখন দেখি—নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজন ছাড়া এক পাও কোথাও নড়েন না, তখন বড় আশ্চর্য ব'লে মনে হয়। তাঁরা আপাত ভোগকে বড় ক'রে দেখতে গিয়ে এ সংসারের ঋণের কথা ভুলে যান। তাঁদেরও যে সে-ঋণ একদিন সুদে-আসলে শোধ ক'রে যেতে হয়, একথা ভাবতে বসলে তাঁরা ভয়ে কণ্টকিত হন। অথচ মজা এই যে, তাঁরা যা কিছু স্নেহ, যা কিছু ঐশ্বর্য নিজের ক'রে পান, একদিন তাকেই আবার দশগুণ বেশী ক'রে সংসারকে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে হয়।

সৃষ্টির এই হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম। যার কাছ থেকে আমরা যতটুকু পাচ্ছি, তাকে তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি। এই নেওয়া-দেওয়ার কাজ আমাদের সচেতন মনের অগোচরে প্রতিনিয়তই ঘটছে। যিনি সাধু ব্যক্তি, তিনি তার মধ্যেই মনের শুদ্ধাচারের দ্বারা নির্বাণ লাভ করছেন, আর যিনি অবিবেকী দুষ্ট লোক, তিনি তার মধ্যেই নিজের পঙ্কে নিজে ডুবে মরছেন। সুতরাং আমাদের প্রাত্যহিক-জীবনের ভোগগুলিকে যতক্ষণ না আমরা ত্যাগের মহামূল্যে গ্রহণ করতে পারছি, ততক্ষণ এ সংসারের অতিথিশালায় মানুষ হিসেবে আমাদের এতটুকুও মর্যাদা নেই। তেমনি মানুষের মধ্যে যিনি অতিমানুষ, তিনি এই ত্যাগকে আরও অধিক মহৎ দানের লালিত্যে ললিত ক'রে রেখে যান। সে দান হচ্ছে জ্ঞান, জ্ঞানমমৃতম্। এ বিশ্ব, এ-সংসার সেই জ্ঞান থেকেই উদ্ভুত—যেমন একটি সামান্য বীজ থেকে উদ্ভুত বিরাট

বনস্পতি। বীজ যেমন ধরিত্রী থেকে রস নিয়ে নিজেকে সে ধরিত্রীকেই দান করছে, তেমনি মানুষও এ-সংসার থেকে সবকিছু পেয়ে, সবকিছু নিয়ে নিজেকে সে বেশী ক'রে সংসারকেই দান করছে। নিজেকে দিয়ে সংসারের বিরাট বনস্পতিতে ফুল ফোটাতেই তার আসা, তার থেকে নিতে কিছু নয়।

বাঙ্ময়ী

যিনি বাক্, তিনিই বাঙ্ময়ী, তিনিই ব্রহ্মাণী, বাগেশ্বরী। একহাতে তাঁর বীণা, তাই তিনি বীণাপাণি ; অন্য হাতে তাঁর বেদ, তাই তিনি বেদবতী। তিনি শুধু স্রষ্ট্রী নন্, তিনি যেমন সৃষ্টির কারণ, তেমনি সেই সৃষ্টিকে সুরের মাধুর্যে ভ'রে তুলছেন তিনি। তিনি দেবলোকের ধ্যেয়া কিনা জানি না, কিন্তু যে রূপের মধ্যে সৃষ্টি রূপ-ময় হ'য়ে ওঠে, তিনি তার মূল কারিকা। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে—তমোগুণা কালী যেমন অকল্যাণকে অশুভকে খড়্গে নিধন করেন, বেদবতী ব্রহ্মাণী তেমনি সেই ধ্বংসের মধ্যে সুরের প্রতিষ্ঠা করে নবীন প্রাণ সৃষ্টি করেন। দক্ষিণায়নের তিমির বিভাবরীর অবসানে উত্তরায়ণ আসে নবীন ঊষার মূর্ছনা নিয়ে। প্রজ্ঞার আলোক বর্ষিত হয় সৃষ্টিলোকে। তিনি স্রষ্ট্রী, সৃষ্টিকারিকা তিনি। তিনি আনন্দময়ী। শাস্ত্রে বলেছে ঃ আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভুতানি জায়ন্তে। এই বিশ্বলোক আনন্দ থেকেই সৃষ্ট। সেই আনন্দলোকের রসলোকের রসময়ী প্রজ্ঞাময়ী বেদবতী তিনি। তাই শাস্ত্রে বলেছে—বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। রসমধুর বাক্যই কাব্য। যিনি বাঙ্ময়ী, রসময়ী, কাব্যে এসে তিনি মধুরা হ'য়ে ওঠেন। কবিরা তাই রসপ্রবক্তা। এই রস থেকে, আনন্দ থেকেই কাব্য। সৃষ্টির মুলে পাই এই কাব্যকে। কাব্য থেকেই নৃত্য, গীত, নাট্যকলা ও কাহিনী। এ যেমন আনন্দ থেকে উচ্ছৃত, তেমনি আনন্দ দানেরও কারণ। সাহিত্য তাইতো আনন্দবিধায়িণী কাব্য। যিনি স্বরময়ী সরস্বতী, তাঁরই সারস্বত প্রজ্ঞালোকের অভিযাত্রী আমরা। তিনি শ্বেতবর্ণা, কারণ তিনি কলুষহারিণী। আমাদের সাধনরাজ্য থেকে তাই যতক্ষণ কলুষতাকে, পঙ্কিলতাকে, আবিলতাকে আর অন্ধতাকে অপসারিত ক'রে মনের স্বচ্ছ সরোবরে শ্বেত হংস ভাসিয়ে দিতে না-পারছি, ততক্ষণ জীবনে ও সমাজে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সারস্বত যজ্ঞে আমরা সেই সৌন্দর্য-প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারই গ্রহণ ক'রে থাকি, আর এই অঙ্গীকারই সঞ্চারিত হয় কালে কালে লোকে লোকে।

শাশ্বত ভারত

সিন্ধু-সভ্যতার ঐতিহ্য নিয়ে যে ভারতবর্ষ একদিন জন্ম নিয়েছিল, তার আদর্শ ছিল একক সাধনার। সাধনার দ্বারা সিদ্ধির পথে সে মানুষকে দিয়েছিল দেবতার আসন, বলেছিল—নর-নারায়ণ। দেবতাকে প্রিয় ক'রে প্রিয়কেই সে দেবতাজ্ঞান করেছিল। আব্রহ্ম মৈত্রীজ্ঞানে সেদিন ভারতের মর্মমূলে যে প্রেমময়তা উদ্ভাসিত

হয়েছিল, সেই প্রেমই হচ্ছে ভারতের শাশ্বত ধর্ম। এই প্রেম ক্রমে স্বদেশপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেমে এবং জাতীয়তা থেকে আন্তর্জাতিকতায় রূপ নিয়েছিল। আজও ভারতবাসী যতখানি স্বদেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী, ততখানি আন্তর্জাতিক। আধুনিক যুগে রামমোহন, কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ তার এই শাশ্বত আদর্শ বিশ্বজগতে প্রকাশ করেছে।

ক্ষমা, প্রেম এবং ত্যাগ—এই তিনটি মূল সত্যের দ্বারা আমাদের জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক জীবন উৎসারিত। কিন্তু এই ক্ষমা নির্বীর্যের ক্ষমা নয়, বীর্যবানের ক্ষমা। এই তিনটি মূল সত্যের দ্বারাই ভারতবর্ষ চিরকাল ভূমাসুখ উপলব্ধি করেছে, বলেছেঃ 'ভূমৈব সুখম, নাল্পে সুখমস্তি।' আর সেই সঙ্গে বলেছেঃ 'যেনাহং নামৃতস্যাং, কিমহং তেন কুর্যাম?' অর্থাৎ—যার দ্বারা অমৃত-লাভ নেই, তা নিয়ে আমি কি করবো? এই আদর্শেই চিরকাল ভারতীয় প্রাণসত্তা গঠিত। প্রতিটি ভারতবাসীর প্রাণকোষে এই আদর্শেরই প্রবাহ সঞ্চারিত। মানুষকে সে চিরকাল জেনে এসেছে মহৎ, প্রভাত-সূর্যের মতই তার মাহাত্ম্য। একেই রূপ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ 'মানুষের মাহাত্ম্য প্রভাতের সূর্যের মতো। দিগন্ত তার সম্মুখে বহু দূরে, আলোর মতো সে দূরে প্রসারিত। মানুষের জীবনযাত্রা বর্তমান জীবনকে অতিক্রম ক'রে চলে, তার সঞ্চয় অজানা অধিকারীদের জন্যে। মানুষের মধ্যে যাঁরা মহত্তম, তাঁরা বাস করেন অনাগতকালে, তাঁরা প্রস্তুত করেন ভাবীযুগের আশ্রয়।'

সেই আশ্রয়ে জন্ম নেয় নিত্য নব নব মানুষ। তারা ক্লীবতা থেকে এগিয়ে আসে দুর্জয় শক্তিতে, তারা ভীরুতা থেকে এগিয়ে আসে বীর-বীরত্বে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের চোখে জ্বলে ক্রোধ-বহ্নি। বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে সেই শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন ঃ 'বীর্য মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্রবীর্য ব্রহ্মতেজ।' সেই বীর্যশক্তিতে উদ্বোধিত ভারতের আরাধ্যা দেবী হলেন হিমালয়দুহিতা পার্বতী—দেবী দশভূজা। অসুরনিধনে তিনি নিজেই নিযুক্তা। নানা আয়ুধে সজ্জিতা এই দেবীমূর্তি চিরকাল ভারতবর্ষকে দুঃখ থেকে ত্রান করেছেন, বিপদে অভয় দিয়েছেন। কিন্তু একদিকে যেমন এই শক্তি, অন্যদিকে তেমনি দেখতে পাই সর্বত্যাগী ক্ষমাসুন্দর উমানাথকে। তিনি সর্বমঙ্গলের আধার, শিবশঙ্কর। এই শক্তি ও ত্যাগ এবং প্রেম ও ক্ষমাই ভারতবর্ষের শাশ্বত জীবন, এই শক্তিময়ী মহামায়াই ভারতবাসীর কাছে দেশমাতৃকায় রূপায়িত।

কালের বিবর্তনে এবং নিত্য নব নব বস্তুর নব নব মূল্যমানে ও নানা বিরুদ্ধ চিন্তাসূত্রে নানা বেদান্ত সৃষ্টি হতে পারে, এবং এমন কি কোনো প্রবলতম বন্যাস্রোতে অতীতের এই বিরাট ঐতিহ্যকে ভাসিয়ে নেবার একটা দুর্বার প্রয়াসও হয়তো মাঝে মাঝে তীব্র হ'য়ে উঠতে পারে, কিন্তু নানা নদীশোভিত মহাসমুদ্র ও বিটপীস্পর্শিত পর্বতমালার চিরন্তনতার মতই ভারতের মূলগত প্রাণসত্তা অতীতের শাশ্বত গৌরব বয়ে নিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের অজানা তীরে ; কাল থেকে কালান্তরে তার অমৃত ঐশ্বর্য অমর বিভায় বিভাদীপ্ত। নানা ঘূর্ণাবর্ত ও পরিবর্তনের মধ্যেও সে আপন লীলায় নিত্যরসে লীলায়িত।

প্রাণন

প্রাণের কাজই হচ্ছে প্রাণকে আকর্ষণ করা, প্রাণকে টানা। বিশ্বপ্রকৃতিতে এই যে নিত্য রূপের পরিবর্তন, তা প্রাণেরই খেলা। মানুষের প্রাণকে তা আকর্ষণ করে। প্রকৃতির রূপ যদি কোথাও একই বর্ণে স্থূল হ'য়ে থাকতো, তবে তা মানুষকে নৃত্য-ছন্দে দোলা দিতে পারতো না। প্রাণের কাজই হচ্ছে চলমানতা, নানা বিচিত্র রসে সে রসায়িত। অন্যের প্রাণে যখন সেই রসের সঞ্চার ঘটে, তখনই হয় মূলের প্রতি মূলাতীতের সম্মিলিত আকর্ষণ। বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে যা ঘটচে, মানুষের ক্ষেত্রেও সে-ঘটনা একই পর্যায়ের। তোমার প্রাণ যেখানে অনড় বা পাষাণ নয়, যেখানে সে মন্দাকিনীধারায় নিত্য প্রবাহিত, যেখানে সে ঝর্ণার মতো উচ্ছলিত, সেখানে সে আপনাকে ছাড়িয়ে কোটি কোটি প্রাণকে তার প্রতি আকর্ষণ করছে, নিত্য রসধারায় কেবল টানছে। চাঁদ যে অমন আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে আকাশে হাসে, সে কেবল তার প্রাণাবেগে। যার বেগ আছে, সেই তো প্রাণ, আর তাতে যে আকৃষ্ট হয়, সেই তো আবেগ! 'মোশন' আর 'ইমোশন'। ফুলের মধ্যে, গানের মধ্যে, কবিতার মধ্যে, নাচের মধ্যে, সুরে আর ছন্দে, সৌন্দর্যে ও গন্ধে, হাসিতে আনন্দে, প্রেমে ক্ষেমে ঔদার্যে, নিত্য নব লাবণ্য বিভাসে কেবল সেই প্রাণেরই খেলা চলেছে। সেই প্রাণ আকর্ষণ করছে বিশ্বপ্রাণকে। সব মিলে চলেছে এক মহাপ্রাণের উদ্দেশ্যে, এক আনন্দলোকে।

জীবন

জীবনকে তুমি যদি কিছু না-ই দেবে, তবে জীবনের কাছ থেকে তুমি প্রত্যাশাই বা করবে কি? ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে তুমি সুদ পাও, তারপর একদিন সুদে-আসলে পুরো টাকা তুলে নাও। এই জীবনটাও যে তেমনি একটা বৃহৎ ব্যাঙ্ক। এখানে তুমি তোমার ব্যক্তিসত্তাকে যত বেশীপরিমাণে দিতে পারবে, ততো তোমার কর্মের, গুণের ও আনন্দের সুদ বেড়ে যাবে।

এক-একটি মানুষ দেখি—আলস্যে দিন যাপন ক'রে মুখে দুনিয়া মাৎ করে, আর নিজের দুষ্ট ভাগ্যের জন্যে অপরকে অপরাধী ক'রে আনন্দ পায়। অনেক দুঃখ স্বীকার ক'রেও জীবনকে সে কোনোদিক থেকেই কিছু দিচ্ছে না, জীবনের ঘরে তার কোনো কর্মের অঙ্কই গিয়ে জমা পড়ছে না, শুধু ফাঁকির পর ফাঁকিই জমে উঠচে। যে ভাগ্যসূর্যের মুখ দেখবে ব'লে প্রতিদিন সে শয্যা ছেড়ে ওঠে, সে ভাগ্য যে তার প্রতিদিনের কর্মের অঙ্কের সুদ, একথা সে জানতেই পারে না। আর পারে না বলেই তার দুঃখও ঘোচে না। নিজেকে দহন করলে তবেই না আলোর শিখায় জীবন উজ্জ্বল হয়! সংসারে যে মানুষটি যতবেশী ফলবান হয়েছে, বুঝতে হবে—নিজেকে সে নিংড়ে নিংড়ে জীবনকে দান করেছে। নিজের অহং, নিজের স্বপ্ন, নিজের কর্ম, নিজের সাধনা, নিজের জ্ঞান—সবকিছু দুঃখের অগ্নিতে জীবনকে অর্ঘ্য

দিলে তবেই জীবন একদিন সুদে আসলে বিজয়-গৌরবের আনন্দ দান করে। সংসারের ফলবান মানুষদের জীবনে তারই স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। তাই বলি—দাও, দাও, নিজের সত্তাকে দগ্ধ ক'রে ক'রে জীবনকে অগ্নি উপহার দাও, জীবন তোমাকে আলোয় আলোয় পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সুদে আসলে সে তোমাকে পূর্ণ ক'রে দেবে। তখন তুমি আর তোমার জীবন—দু'টি আলাদা থাকবে না ; তখন তুমিও যা, জীবনও তাই ; তখন তুমি 'জীবন' হয়ে উঠবে, জীবন 'তুমি' হ'য়ে উঠবে। সেদিন হাত পেতে কেউ তোমার কাছে অটোগ্রাফ চাইলে তুমি বড় অক্ষরে লিখে দেবে ঃ 'আমি যা, আমার জীবনও তাই ; আমার জীবনই আমার বাণী'।

শক্তি

মানুষের শক্তি যেখানে অসামান্যের স্পর্শে উজ্জ্বল, সেখানে মানুষের মাহাত্ম্য দীপ্ত ভানুর মতো সর্বত্র আপন রশ্মি বিস্তার ক'রে মহিমময় হ'য়ে ওঠে। সে তখন ক্ষুদ্রকে ছাপিয়ে, সামান্যকে ডিঙিয়ে ভূমার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। এই মিলনই তার সার্থক মিলন। পদে পদে বাধাকে দু'পায়ে রজ্জুর মতো জড়িয়ে মানুষ যতই দুঃখের সঙ্গে, দারিদ্র্যের সঙ্গে হাত মেলাতে যায়, ততই সে নিজের মধ্যে নিজের মৃত্যু রচনা ক'রে শুধু নিজেকেই ধ্বংস করে না, এই সৃষ্টি আর বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত রহস্য উদ্ঘাটনের অগ্রগতিকেও সে একই সঙ্গে ব্যাহত করে।

আবির্ভাব

সংসারে কতো লোকই তো আসে, জীবননাট্যের অভিনয় শেষ ক'রে আবার একদিন চলেও যায়। কে তাদের খোঁজ রাখে ? মহাকালের বিরাট ক্যান্‌ভাসে তাদের স্বাক্ষরটুকুও থাকে না। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আসেন, যাঁদের আসাকে বলতে হয় আবির্ভাব। জীবননাট্যের বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁরা যে অভিনয় ক'রে যান, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ। মহাকালের বুকে তাঁরা যে স্বাক্ষর রেখে যান, সহসাই তার দাগ মিলিয়ে যাবার নয়। সৃষ্টিজগতে সেই মানুষই তো সার্থক! লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো সরল-রেখার জীবন নয় তাঁদের। সে-জীবনের সুখ-দুঃখের ইতিহাসের পাতায় পাতায় যে অভিজ্ঞতার ঔজ্জ্বল্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কোনো কালে অগণিত গণমানসের পক্ষে তাই হয় অভিধান। সেই অভিধানে যে শব্দতত্ত্ব, ভাবার্থ ও অক্ষর নির্দেশ থাকে, তাই হয় অগণিত মানুষের জীবনযাত্রার সহায়ক।

হয়ে ওঠা

কুঁড়ি যেমন বিকশিত হ'তে হ'তে কুসুমে পরিণত হয়, লাভ করে তার আপন সার্থকতা, ব্যক্তিও তেম্‌নি তার ক্রমিক ঋদ্ধির দ্বারা ব্যক্তিত্ব লাভ ক'রে লোকজীবনের পরিপূর্ণতায় তার পরিণতি খুঁজে পায়। এই পাওয়াই তার পরম পাওয়া। জীবনের

ধর্মই হচ্ছে কর্ম ও মননের দ্বারা কিছু-একটা হ'য়ে ওঠা। যেখানে এই 'হয়ে ওঠা' নেই, সেখানে জীবন তার নিজের বেগে চলে না, জড়তায় অচল হ'য়ে অবরুদ্ধ হ'য়ে থাকে। কিন্তু বেগ বা এনার্জিই হচ্ছে জীবন। এই এনার্জিই কুঁড়িকে পুষ্পে পরিণত করে, আলোকে সূর্যে পরিণত করে, জীবনকে মহাজীবনে তুলে ধরে। যে ব্যক্তির যে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধারা, তার মূলেও এই এনার্জি। ব্যক্তিত্বই ব্যক্তিকে বহুর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য দান করে, এবং এই ব্যক্তিত্ব যখন গভীর পাণ্ডিত্য ও বিশ্বধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিলাভ করে, তখন ব্যক্তি হয় মনীষী আর তার ব্যক্তিত্ব হয় মহনীয়। ব্যক্তি যেখানে লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শে মনীষার স্বাক্ষর এঁকে যান লোকচিত্তে, সেখানে সেই প্রতিভা আর মনীষাই তার ব্যক্তিত্বকে এক অনির্বচনীয় আলোকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে। এই বিশেষ ব্যক্তি তখন যা কিছু স্পর্শ করে, তাই সোনা হ'য়ে ওঠে; যা কিছু বলে, তাই মধুস্রাবী হয়, যা কিছু করে, তাই নব নব সৃষ্টির রূপ নিয়ে দাঁড়ায়, আর তার ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সে সকলকে আকর্ষণ করে তার নিজের দিকে। সে হয় সূর্যমান। কিছু না-হওয়া থেকে সে তখন পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। এই হ'য়ে-ওঠাই সৃষ্টির সার্থকতা।

শিল্পী

শ্রেষ্ঠ শিল্পী যিনি, তিনি আসেন দুঃখ-সাগরে জীবন-তরী বেয়ে, জীবনের অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে কুড়িয়ে রচনা করেন তিনি আনন্দের গান, আর সেই গান শুনিয়ে চমকিত ক'রে দিয়ে যান বিশ্ববাসীকে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীমাত্রকেই আমরা তাই ব'লে থাকি সাধক। তাঁর সাধনা সকলের সঙ্গে সমন্বিত হবার সাধনা, তাঁর ধ্যান মানব-প্রকৃতির বিচিত্র রহস্য উদ্ভাবনের ধ্যান, তাঁর কর্ম কাল থেকে কালান্তরের পথে প্রবাহিত। প্রচলিত জীবনযাত্রার মধ্যে তিনি আসেন মূর্তিমান বিদ্রোহীর বেশে। তাঁর চাল-চলন ও আচরণ দেখে লোকে যতক্ষণ তাঁকে উন্মাদ ব'লে আখ্যায়িত করে, তিনি ততক্ষণে আপনভাবে উন্মনা হ'য়ে রচনা করেন বিশ্বচিত্র। তার মধ্যে হয়তো বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয় তারাই—যারা তাঁকে তাদের জীবন থেকে, জ্ঞান ও বুদ্ধি থেকে বাতিল ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। প্রচলিত সুরের প্রত্যক্ষ ব্যতিক্রম ব'লেই সমকালে প্রায়শঃ নিন্দিত হ'য়ে মহাকালে অভিনন্দিত হন তিনি দেশে দেশে। তিনি কবি, তিনি শিল্পী, তিনি স্রষ্টা, তিনি মহাজীবনের বাণীপ্রবক্তা, 'ক্ষুদ্র আমি'র বন্ধন ছিন্ন ক'রে 'বৃহৎ আমি'র বিরাট পরিবেশ তাঁর। মুক্তিমন্ত্রে তিনি আসেন মানুষকে মুক্তি দিতে, অথচ যা কিছু তিনি পরিবেশন করেন, তা জীবনের অভিজ্ঞতারই পরম সঞ্চয়, তা বেদনার রসে সিক্ত, কিন্তু বেদানার রসসঞ্চারি।

চরৈবেতি

জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু কর্ম অনন্ত। কবি লংফেলো যখন একথারই ধ্বনি তুলে তাঁর কাব্যে লিখলেন: 'Life is short. Art is long, and opportunity

fleeting', তখন পাশ্চাত্য জগৎ একটি নবতম জীবনদর্শনের সন্ধান পেলেও আসলে এ দর্শনের মূল ভিত্তি হচ্ছে ভারতবর্ষ। ভারতীয় দর্শনে কর্মযোগের প্রাধান্যের কাছে আর সবই গৌণ হয়ে গেছে। ভারতীয় শাস্ত্রকার বলেছেন ঃ 'কর্মন্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' ঃ অর্থাৎ—কর্ম ক'রে যাও, ফললাভের প্রত্যাশা কোরো না। ফল-লাভের প্রত্যাশা নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ব'সে থাকলে কাজ আর শেষ হবে না। সময় সঙ্কীর্ণ, এবং জীবন যে নানা কাজেরই সমষ্টিমাত্র ! সেই কাজের মধ্যেই মানুষের পরিপূর্ণতা, সেই কাজের মধ্যেই একটা দেশ ও জাতির নব নব উত্থান ও জাগৃতি।

যিনি দেশ-সচেতন ও আত্মসচেতন ব্যক্তি, তিনি কর্মের কথাই ব'লে থাকেন, আরামের প্রীতিকর শয্যা তার জন্যে নয়। তিনি বলেন—যেমন ক'রে উপনিষদ বলেছেন : 'চরৈবেতি, চরৈবেতি' ঃ অবিরাম কাজ করো, অবিরাম এগিয়ে চলো। দেশের যাঁরা মুক্তিযোদ্ধা, জাতিকে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে যেতে আসেন, তাঁদের মধ্যে এই প্রসাদগুণই আমরা লক্ষ্য করি। আধুনিককালে কবি রবার্ট ফ্রস্টের একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তির মধ্যে এই 'চরৈবেতি'র সুরই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফ্রস্ট বলেছেন—

'The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.…'

এ তো ভারতবর্ষেরই বাণী ! তেমনি নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য, তাই হচ্ছে ভারতবর্ষের চিরকালের আদর্শ। এখানে নানা ধর্মের নানা মানুষ, ভিন্ন তাদের রুচি, ভিন্ন তাদের ভাষা। নানা কালে বিভিন্ন আক্রমণকারী শাসক এসে তাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে দিতে চাইলেও ভারতবাসীর সহর্মমিতাবোধকে তারা নষ্ট ক'রে দিতে পারেনি। স্বাধীন ভারতে এই বহুধর্মের বহু ভাষাভাষি মানুষদের নিয়েই রচিত হলো নবতম সংবিধান। এখানে ধর্মের স্থান হলো ব্যক্তিগত, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষ হলো নব-গণতন্ত্রের দেশ, এখানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবারই সমান অধিকার। বৌদ্ধ আদর্শের যেমন পুনর্জন্ম ঘটলো নবীন ভারতে, তেমনি ইস্‌লাম আর বেদান্তেরও নতুন সমন্বয় ঘটলো এখানে।

অপরকে স্বেচ্ছায় আঘাত করা ভারতের নীতি নয়, বলপূর্বক অপররাজ্য অধিকার করাকে ভারতবর্ষ কোনোদিন কৃতিত্ব ব'লে স্বীকার করেনি। সে বলে 'পাণং ন হানে', অর্থাৎ—প্রাণীকে হত্যা করবে না। 'ন চ দিন্নমাদিয়ে,' অর্থাৎ—তোমাকে যা দেওয়া হয়নি, তা তুমি নেবে না। আর বলে—

'মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং ॥'

অর্থাৎ—উর্ধ্বে অধে সর্বদিকে সমস্ত জগতের প্রতি তুমি হিংসাহীন অপরিমিত

মৈত্রী রক্ষা করবে। ভারতবর্ষ কর্মের সঙ্গে জ্ঞানকে একসূত্রে বেঁধেছে। 'অবিরাম কর্ম করো এবং জ্ঞানের দ্বারা কর্মকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরো'—ভারতবর্ষ এই কথাই বলে।

কিন্তু এ নীতি তার নির্বীর্যতার পরিচায়ক নয়। শক্তির বিরুদ্ধে কিভাবে দাঁড়াতে হয়, সে জানে, আর জানে বলেই ভারতবর্ষ চিরকাল পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। আর যখন সে কোনো রাষ্ট্রের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করে, তাও এই মনুষ্যত্বজাত বন্ধুত্ব। সে পৃথিবীকে যা দান করে, তা হচ্ছে—'সত্য প্রকাশ': কর্মের সত্য, জ্ঞানের সত্য ও প্রেমের সত্য। এই সত্য লাভের জন্যই অবিরাম চরৈবেতি, চরৈবেতি।

আশ্রম

প্রাচীন ভারতের আশ্রমের শিক্ষা ছিল মনুষ্যত্ববোধের শিক্ষা। সংসার-জীবনের জটিলতা থেকে এই আশ্রমজীবনে এসে মানুষ আশ্রয় চাইতো শান্তির আর সান্ত্বনার। সেই ক্ষেত্রটি ছিল বোধির ক্ষেত্র। নিজের চেতনা সম্বন্ধে বোধ পূর্ণ হলেই তবে আসে বোধি। কিন্তু ক্রমবিবর্তনে ভারতবর্ষ থেকে সেই আশ্রম আজ উঠে গেছে। আজ আর সেই তপোবনও নেই, সেই আশ্রমও নেই। যে সব আশ্রম নামীয় মঠ বা সঙ্ঘ আজ মাথা তুলে আছে, সেখানে প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমের পরিবেশ নেই , তেমনি নেই আত্মানুসন্ধান ও নৈতিক জ্ঞানানুশীলনের অবকাশ। তার জন্যে যে আশ্রম অথবা মঠ বা সঙ্ঘেরই প্রয়োজন, এমন নয়। কোনো কোনো মানুষ আছেন যাঁরা বৃহত্তর ধ্যান-ধারণার মধ্যে প্রবেশ না ক'রে সংসারকেই আশ্রম জ্ঞান ক'রে নিয়ে শুচিশুদ্ধ জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে আত্মানুশীলনের অবকাশ পান। আশ্রমবাসী ব্যক্তির চাইতে সংসার-জীবী এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের মানসিক প্রবণতা যে কিছু কম, একথা মনে করা যায় না। কিন্তু সব চাইতে বড় আশ্রমিক ক্ষেত্র হচ্ছে ব্যক্তির মন। সমস্ত দেহকে মিলিয়ে মনকে যিনি আশ্রম ক'রে তুলতে পেরেছেন, তাঁর কাছে বনানী-পরিবেষ্টিত নির্জন আশ্রমিক পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা সামান্যই। কিন্তু এ জাতীয় মনাশ্রমিক ভাবটি সহজ নয়। কর্তব্যের ক্ষেত্রে সাংসারিক প্রিয়জনদের প্রয়োজন মিটিয়ে যিনি এই মনাশ্রমিক ধর্মে বোধি লাভ করতে পারেন, তিনিই সত্যিকারের নিত্যকালের বোধিসত্ত্ব মানুষ। এই আশ্রমটির যত প্রসার ঘটবে, মানুষ তত আত্মস্থ হয়ে ধ্যানের জগতে শান্তিলাভ করবে।

সংস্কৃতির উৎস

আমাদের এই ভারতবর্ষ একদিন সহজ মনে সকলের সঙ্গে মিতালী পাতিয়েছে। তার যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি তপোবন থেকে সৃষ্টি, সেই তপোবন মানুষে এবং প্রকৃতিতে মিলন ঘটিয়েছিল। যেখানে শুধু লোকালয়, শুধু লোক আর লোক, সেখানে মনো-লোক স্বচ্ছন্দ হ'য়ে উঠতে পারে না; সেখানে বিরাগের বিরোধ, অনুরাগের অত্যাচার।

ভূগোল বলতে সেখানে সেদিন তাই প্রাধান্য পেয়েছিল বনরাজিনীলা। প্রকৃতির সঙ্গে মন একত্র হ'য়ে গ'ড়ে তুলেছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ভারতীয় ঋষিরা জানতেন —'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম,' অর্থাৎ—বিশ্বজগতের যা কিছু সবই মহাপ্রাণ থেকে উচ্ছৃত হ'য়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। এই দেহ ভিন্ন সেই প্রাণের ঠাঁই নেই, এই দেহটা হচ্ছে প্রকৃতিগত। বিশ্বপ্রকৃতিতে যতকিছু আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, যতকিছু রাসায়নিক ক্রিয়া, তার সব কিছু এই দেহের সঙ্গে আমাদের মনে মিশে আছে ; সেই মন অনুভূতিপ্রবণ হ'য়ে মননের সৃষ্টি করছে এবং সেই সৃষ্টিকে নানা বর্ণে নানা রসে রসাশ্রিত ক'রে দেশ থেকে দেশে, মন থেকে মনে সঞ্চারিত করছে ও অপরের কাছ থেকে গ্রহণ করে নিজে সম্পূর্ণ হচ্ছে। এই সম্পূর্ণতা যেখানে নেই, সেখানে সভ্যতা বা সংস্কৃতি দাঁড়াতে পারে না, তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। উপনিষদ তাই বলেছেন—

'যস্তু সর্বাণী ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্বভুতেষু চ আত্মানং ন ততঃ বিজুগুপ্সতে।'

অর্থাৎ—যিনি সকলের মধ্যে এবং সকলকে নিজের মধ্যে মেলাতে পারেন, তার বিনাশ নেই। Bible তাই বলেন ঃ 'know thy neighbour, know thyselt.' অর্থাৎ—তোমার প্রতিবেশীকে চেন, নিজেকে চেন, উভয়কে এক ক'রে চেন—এই জাতীয় পারস্পরিক মিলনের ভিত্তিতে যেখানে জীবন-চর্চা ও জীবন-চর্যা সার্থক হয়ে ওঠে, সেখানেই সংস্কৃতির জয়, সভ্যতার জয়। আমাদের গোটা বৈদিক যুগ আর বৌদ্ধ-যুগে এই চর্যা ভারতীয় দর্শনের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। ক্রমে এদেশে ইসলাম এসেছে, সুফী এসেছে, ক্রিশ্চিয়ানিটি এসেছে, ভারতীয় জীবনবোধের সঙ্গে তারা একত্রে মিলে গেছে। এইভাবে আমরা একটা বৃহত্তর ও মহত্তর সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছি।

প্রাকৃতিক চর্যা

মানুষকে মানবীয় সংজ্ঞায় মনুষ্যত্বের পূজারী হ'তে হ'লে তাঁকে মূলতঃ পাঁচটি প্রাকৃতিক চার্যায় সিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতির এই পাঁচটি আধার হচ্ছে—পর্বত, সমুদ্র, আকাশ, অরণ্য ও শ্মশান। মানুষের দ্বারা তখনই মহৎ ব্রত সাধিত হ'তে পারে—যখন পর্বতের ধ্যানীমৌন গাম্ভীর্য, সমুদ্রের অতলস্পর্শী গভীরতা, আকাশের দিগন্তব্যাপী মহাশূন্যতা, অরণ্যের সবুজ-শোভন নিস্তব্ধতা ও শশ্মানের বৈরাগ্য তার সমস্ত অস্তিত্বকে প্রভাবিত করে। মানুষকে তাই প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রামকে অতিক্রম ক'রে কিছুসময় পর্বত, সমুদ্র, আকাশ, অরণ্য ও শ্মশানের সান্নিধ্যে এসে নীরবে বসবার প্রয়োজন আছে। মনের মধ্যে যখন এই পঞ্চ প্রাকৃতিক চর্যা ওতপ্রোত হ'য়ে ওঠে, তখন আর আধিভৌতিক কোনো যোগ বা ধর্মের বাহুল্য নিয়ে তাকে নিজের বাইরে অপর কোনো আশ্রয় খুঁজে মরতে হয় না, তখন তার নিজের মধ্যেই

এমন শক্তি সঞ্চারিত হয়—যার আশ্রয়ে প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রাম ও পার্থিব জটিলতাকে সে হাসিমুখে পেরিয়ে আসতে পারে—পারে নিজের চৈতন্যকে ঊর্ধ্বে তুলে ধ'রে ব্যক্তিসত্তাকে বেণু করে বাজাতে। এই প্রাত্যহিক চর্চা জীবনচর্যারই নামান্তর। প্রকৃতির এই বিশাল যজ্ঞের মুখোমুখি হ'য়ে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে ঃ 'আমি কে ? এই ধ্যানগম্ভীর চিরতপস্বী মহীমণ্ডলে আমার অস্তিত্ব কতটুকু?'—এই প্রশ্ন থেকেই মনুষ্যত্ব-বোধের মধ্য দিয়ে মানুষ সেই স্তরে গিয়ে পৌঁছায়—যেখানে ধর্ম নিয়ে গ্লানি নেই, ঈশ্বরবোধ নিয়ে ভ্রান্তি নেই, মানবসমাজকে নিয়ে সংশয় নেই এবং কোনো সংস্কার নিয়েই কোনো দ্বিধা নেই। সেই স্তরে গিয়ে পৌঁছাবার জন্যেই মানুষের যত ধ্যান, যত প্রাণায়াম। সেখানে গিয়ে পৌঁছানোই মানুষের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

সিম্ফোনী

জলধারা নানা গতিতে প্রবাহিত হ'তে হ'তে কখনো নদীতে পরিণত হয়, এবং নদী ক্রমে সমুদ্রে মিশে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণিকার মধ্যে আমরা হয়তো সমুদ্রের স্বাদ উপলব্ধি করি না, কিন্তু সীমাহীন পরিবেশে এই অসংখ্য জল-কণিকাই যখন বিরাট কোনো সমুদ্র রচনা করে, তখন সেই অকূল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশির মধ্যে যে অপরিসীম জীবনীশক্তি লক্ষ্য করি—তার মূল প্রাণাধার যে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণিকাসমষ্টিই, একথা তখন আর অস্পষ্ট থাকে না। ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে এবং অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায় পরিণতিলাভ—সৃষ্টির মূলগত আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে এই। জলাশয়কে তাই সমুদ্র হ'তে হয়, আচ্ছাদনকে তাই উন্মুক্ত হতে হয়, কুঁড়িকে ফুটে ফুটে তাই ফুলের পূর্ণতায় পরিণত হতে হয়।

মানুষের জীবনেও এই একই ইতিহাস। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকেই তার গতি। নানা স্তর ভেদ ক'রে তবে তাকে এই পূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছাতে হয়। পথে পথে নানা সংঘাত, নানা অভিজ্ঞতার জট, নানা বিরোধ, নানা সংশয়। এই সংঘাত, বিরোধ আর সংশয়ের কাঁটাবেড়া পেরিয়ে জীবন-অভিজ্ঞা আর অভিজ্ঞতার ঝুলি কাঁধে যে-পথিক শেষ-পারাণির পারে গিয়ে সিদ্ধ হতে পারলো, সে-ই মানবশ্রেষ্ঠ। তাকেই আমরা মহত্তম পুরুষ বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। পৃথিবীর কোটি কোটি জন্ম-ইতিহাসে মানুষ ক'জন? নানা যুগের বহু সাধনায় কদাচিৎ কখনো হয়তো এমন এক-একজন মহত্তম পুরুষের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি-বিনিময় হয়—যার জীবনের প্রারম্ভিক কালগুলির দিকে আমাদের হয়তো লক্ষ্যই ছিল না, সেই কালগুলি ছিল তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণিকার মতই; যখন সে সমুদ্র হ'য়ে উঠলো, আমরা লক্ষ্য করলাম সেই সমুদ্রকেই। সে তখন আমাদের হৃদয়ের একুল-ওকুল দু'কুল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের বহুকালের সংস্কারের আবর্জনা তার তরঙ্গবিক্ষেপে নিঃশেষে মুছে দিয়ে যায়, দূর ক'রে দিয়ে যায় আমাদের অন্ধতা আর মূঢ়তা। তার বাণীবিধৃত মন্ত্রের সাধন হয় আমাদের জীবনবেদ, তারই নির্দেশিত পথ হয় আমাদের একমাত্র পথ। কিন্তু সেই

অক্লান্ত পথিকের জীবন-অভিজ্ঞতার রেণুতে রেণুতে কোন্ বীণার তার মন্দ্রিত হয় ? তার ধ্বনি এসে আমাদের শ্রবণ স্পর্শ করে না, অথচ সেই হচ্ছে তার পরম জিজ্ঞাসা, জীবন-জিজ্ঞাসা। মন্দ্রিত বীণার তারে তারে এই জিজ্ঞাসার বাণী ধ্বনিত হতে হতে তার সমগ্র সত্তা জুড়ে যে অনিন্দ্য সিম্ফোনীর সৃষ্টি হয়, সেই সুরই হচ্ছে তার জীবনের মূলগত সুর। এই সুর-সাধনাই তার জীবন-সাধনা। অনন্ত সমুদ্রের কল-কল নাদের মধ্যেও এই সুর, মহত্তর মানব-জীবনেও এই সুর। কিন্তু এই সুর কি শুধু ভৈরবী, শুধু কেদারা, শুধু বাগেশ্রী ? তা হ'লে 'সা' থেকে 'নি'—এই সাতটি পর্দার প্রয়োজন ছিল কি! প্রয়োজন উদারা থেকে মুদারা এবং মুদারা থেকে ক্রমে তারায় উত্তরণ। সুর কোথাও স্থির নয়, অথচ সব সুর মিলিয়ে এক অদ্ভুত ঐকতান, এক অনির্বচনীয় সিম্ফোনী। মানুষের জীবনও তেমনি স্থির নয়, সে নানা ঘাটে ও নানা ঘটনায় পরিবর্তনশীল। অথচ সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে সে এক অখণ্ড চৈতন্যসত্তা।

নিঃসঙ্গ একক

মাঝে মাঝে এমন এক-একটি মানুষ আমাদের মধ্যে আসেন—যাঁর সংসার বা নিজের বলতে কিছু থাকে না। তিনি কোনো বিশেষ পরিবারে আবির্ভূত হন বটে, কিন্তু পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর জন্যে নয়। পারিবারিক পরিবেশে তিনি নিঃসন্দেহে বেমানান ; পরিজনের ভ্রূকুটিভঙ্গে তাঁকে আপন জীবনীশক্তি নিয়ে বেড়ে উঠতে হয়, তারপর একদিন কর্মের গৌরবে ও জ্ঞানের মহনীয়তায় তিনি হ'য়ে ওঠেন সূর্যস্নান, তাঁর আলোকে গোটা পরিবার-পরিজন আলোকিত হয়। সংসার তাঁর জন্যে না-হয়েও তিনি সংসারকে উজ্জ্বল বৈভবে ভরে তোলেন ; তাঁর পুঁজি ভিক্ষাপাত্র হ'লেও সেই পাত্রের সংগ্রহকে সংসার তার নিজের স্বার্থে পুরোপুরি ব্যয় ক'রে তবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, মানুষ তাঁকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ না করলেও তাঁর জীবনের প্রধানতম লক্ষ্যই হয় মানুষ। মানুষের যাতে কল্যাণ হয়, মানুষ যাতে পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন ক'রে সমাজ ও দেশের মহত্তর কাজে আসতে পারে, যাতে এই পার্থিব জগতের নানা গঠনমূলক ও কল্যাণকর কাজে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দান করতে পারে, সেই আদর্শেরই পথ রচনা ক'রে দিয়ে যান তিনি। সমসাময়িক কালের চোখে প্রায়শঃই তিনি অপাংক্তেয় ও অগ্রাহ্য হ'য়ে মহাকালের দৃষ্টিতে তিনি যুগন্ধর কর্মী ও ঋষিত্বে পরিণত হন।

এরকম মানুষ যদিও কদাচ দৃষ্ট হয়, কিন্তু একেবারে বিরল নয়। বিরল নয় ব'লেই স্বার্থসচেতন পৃথিবীতে আমরা কিছু পরিমাণে প্রাণের আভাস পেয়ে বাঁচবার স্পৃহা বোধ করি, মহাশ্মশানের বুকে কিছু ফুলের ঘ্রাণ নিয়ে শ্বাস টানতে পারি, পারি নিজের কাছে নিজেকে কিছু পরিমাণে সুন্দর মনে করতে, আর পারি অন্যের প্রতি মমতা সঞ্চার ক'রে আমাদের সকল কাজে, সকল চিন্তায় এবং সকল ধ্যান-ধারণায়

অনেকখানি বিকশিত হ'তে। এই পারি বলেই সংসার, সমাজ ও পৃথিবীর একটা সহজ সরল মানে খুঁজে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না, কষ্ট হয় না হাজার দুঃখ ও অপঘাতের মধ্যেও ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে জীবনের বীজ বপন ক'রে চলতে। তিনি আমাদের মধ্যে সেই বোধকে জাগিয়ে দেন, সেই উন্মাদনা এনে দেন, সেই উৎসাহ সঞ্চার করেন। তিনি নইলে সব কাজই কেমন যেন বিশৃঙ্খল মনে হয়, সব কিছুর হাল ধরার যেন কেউ একজন থাকে না, তরী নিয়ে নদী পেরোবার বৈঠাখানি যেন অকস্মাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি সংসারের না হয়েও সংসারকে যতবেশী দেন, সংসারী মানুষগুলো উদয়াস্ত দিয়ে-দিয়েও তাঁর সমপরিমাণে এসে পৌঁছাতে পারে না। অথচ তিনি কত নিঃস্ব, কত একা, কত নিঃসঙ্গ। একটি পর্বতশিলা কি একটি বৃক্ষ যেমন মহাকাশের নিচে একা দাঁড়িয়ে থেকে ছায়া সঞ্চার করে, তিনিও তেমনি। চির জাগ্রত, চির উন্নত, স্নিগ্ধ ও মধুর, অথচ চিরকালের দুঃখী ও সঙ্গীহীন।

চলা

ঘুম থেকে উঠে পূর্বাকাশে তাকিয়ে প্রতিদিন নমস্কার জানাই প্রভাত-সূর্যকে। সূর্য তখন তার আপন কক্ষপথে বিঘূর্নিত হতে থাকে। তারপর যতই বেলা বাড়তে থাকে, যতই ঘড়ির কাঁটা পেণ্ডুলামের টিক্‌টিক্ শব্দে ঘুরতে থাকে, সূর্য ততই পূর্ব গগন ছেড়ে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে পশ্চিম দিগন্তে। অথবা বৈজ্ঞানিক সূত্রে বলা যায়, সূর্যের এই অগ্রযাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ন্ত্রিত হয় দিনের প্রহরগুলি। প্রহরও নিশ্চল নয়, তারও ঊষা থেকে রাত্রি-পরিক্রমা চলে ধীরে অতি সন্তর্পনে। আমরা যে বলি, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, মাঝে মাঝে এই বৈজ্ঞানিক সত্যের অবলুপ্তি ঘটে মনে ; ভাবি—এই মাটি, জল, গাছ, পাথর, বাড়ি-ঘর সবই তো ঠিক আছে, সুতরাং সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, সেইটেই আমাদের সাদা চোখে স্পষ্ট। সনাতন পৃথিবীতে এ বিশ্বাস যে ছিল না, এমন নয়। কিন্তু বিবর্তিত পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা এ বিশ্বাসকে ক্রমে উল্টিয়ে দিয়েছে। তা দিক, তা নিয়ে তর্ক নেই। মূল কথা হচ্ছে চলা। পৃথিবীও চলছে, সূর্যও চলছে, পল-অনুপলও চলছে, ঘড়ির কাঁটাও চলছে, আমরাও চলছি, তারও আগে পৃথিবীতে প্রাণশক্তি চলছে। এই চলাই তো জীবন! এই বুকের ভিতরে যতক্ষণ প্রাণবায়ু ধুকপুক করছে, ততক্ষণই আমি জীবিত, নইলে এই দেহ মৃত বলে গ্রাহ্য হয়, তেমনি এই সৃষ্টিও তাই। সৃষ্টি চলছে বলেই সে সজীব, নইলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কবেই অসাড় ও নিস্পন্দ হয়ে যেতো। তাই বলি, চলো, চলতে থাকো, এই চলাই তোমার জীবনকে তোমার প্রাণশক্তিকে প্রকাশ করছে। তুমি চলছো বলেই তুমি আছো, অন্যথায় সব অন্ধকার, সব একাকার, সব বোধের বাইরে। প্রভাত-সূর্যের পথ থেকে নিশিযাম অবিরাম তুমি চলো, তোমার চলার ছন্দে অনুরণিত হোক্ মহাপ্রাণের সঙ্গীত।

ভ্রমণ

পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক। সকলেই ভ্রমণপিয়াসী। গৃহের আবদ্ধ পরিবেশ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একঘেয়েমি এবং একই স্থানের অভ্যস্ত সংলাপ, পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিচরণশীলতায় অতিষ্ঠ হয়ে মানুষমাত্রেই চায় স্থানের বৈচিত্র্য। এই স্থানের বৈচিত্র্যই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আনে, আনে বৃহতের উদার আহ্বান। সেই আহ্বানে সাড়া দিতে মন ছুটে যায়, ছুটি চায় মন তার প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা থেকে। নইলে নিজের মধ্যে কখনই যেন সে থেমে পড়ে, সুর কেটে যায় সব কিছুর। তাই প্রাকৃতিক পরিবর্তন খুঁজে অনবরত বেরিয়ে পড়তে চায় সে নানা দিকে। রেলে, জাহাজে, স্টীমারে, নৌকোয়, এরোপ্লেনে, মোটরে তাই টিকিট কাটার বিরাম নেই লোকের। আরও একটা ছুটি খোঁজে সে আবিষ্কারের মোহে। তাই সৌরমণ্ডল পরিক্রমায় স্পুট্‌নিকের সাহায্য নিয়েছে মানুষ। কিন্তু একটি দিকের আবিষ্কার এবং একটি দিকের ভ্রমণ থেকে আজও পৃথিবীর সাধারণ লোকেরা নিবৃত্ত রয়েছে। তা হচ্ছে ভগবৎ-পরিমণ্ডল ও ঈশ্বরক্ষেত্র। লোকে কুরুক্ষেত্রে যায়, শ্রীক্ষেত্রে যায়, কিন্তু ঈশ্বরক্ষেত্রে যায় না। অথচ সেখানে যেতে গাড়ীভাড়া নেই, আছে শুধু মনের ভাড়া, অর্থাৎ মনের টিকিট-ঘর থেকে একাগ্রতার টিকিট কেটে নিতে হয়। তার মতো বিচিত্র ক্ষেত্র আর কোথায় আছে? যানবাহনের আশ্রয় নিয়ে লোকে যেসব অঞ্চলে গিয়ে তার শ্যামশোভায় মানসিক শান্তি খুঁজে বেড়ায়, সেখানে এই ঈশ্বর আছেন বলেই তার এত রূপ, এত শোভা। তবে তাঁতে গিয়ে পৌঁছাবার আগ্রহ নেই কেন? নেই—স্থূল জগতের মানুষ স্থূলতর বলে, সূক্ষ্মকে তার স্থূলচোখে দৃষ্ট হয় না, সূক্ষ্ম ছেড়ে তাই স্থূলেই তার আনন্দ। অথচ এ আনন্দ শান্তি দেয় না। শিশু যেমন খেল্‌না নিয়ে আনন্দ পায়, এ তেম্‌নি আনন্দ, তাতে মায়ের বুকের স্নেহ-সুধার শান্তি নেই। ভক্ত রামপ্রসাদ তাই গাইলেন—

> 'কাজ কি আমার যেয়ে কাশী?
> মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী।'

সেই ঈশ্বরক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রের মিলন, সেই ভগবৎ-পরিমণ্ডলে সমগ্র সৌর-মণ্ডলের রূপ-লাবণ্য। একে একটি আইডিয়া ধরে বাউল তাই গেয়েছে—

> এমন ভাবের নদীতে সই ডুব দিলাম না,
> আমি ডুবি ডুবি মনে করি, মরণ ভয়ে ডুবলাম না।

এ কিসের মরণ? না—তাঁর সঙ্গে একাত্ম হবার আত্মলুপ্তি—যেমন মীরাবাঈ মিশে গিয়েছিলেন গিরিধারীলালে। প্রতিদিনের বৈচিত্র্যসন্ধানী স্থূল মানুষের তাতে বড় ভয়। তারা পরম শান্তিতে ডুবতে চায় না, সাময়িক স্থূল আনন্দে মজতে চায়। তারা চিনির পিঁপড়ের মতো; চিনি খাবে, কিন্তু চিনি হবে না। পিঁপড়ে তাই পিঁপ্‌ড়েই থাকে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এর স্বাতন্ত্র্য আছে। সেখানে স্থূল জীবনের বাইরেও কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ধ্যান আছে, যোগ আছে, স্তবগাথা আছে, আছে হোম-যজ্ঞ ও

প্রাণায়াম। তার যারা শরিক, তার পথ নিঃসন্দেহে সন্ন্যাসের। সন্ন্যাস অর্থে গৃহহীন জীবনই নয়, গৃহীজীবনেও মানসিক সন্ন্যাসের অবকাশ আছে। তাকে মন দিয়ে ধরতে হয় ও ধ্যান দিয়ে বুঝতে হয়। এই বোঝার ক্ষেত্রে যে অনুভূতি জাগ্রত হয়, সেই অনুভূতিই লোককে নিয়ে যায় লোকে লোকে আলোকে আলোকে সেই পরম ঈশ্বরের ক্ষেত্রে—যেখানে সকল তীর্থের মহাতীর্থ, সকল ভ্রমণের শেষ ভ্রমণ। সেই ভ্রমণের টিকিট কেটে জড়বাদী পৃথিবীর অভ্যস্ত সংসারধর্মী মানুষেরা কবে বেরিয়ে পড়বে সংস্কার ও বন্ধনের বেড়া ভেঙে ? গার্ডের হুইসিল বেজে চলেছে, টিকিটঘরে তাই মাশুল জমা পড়া সাপেক্ষ। তা হ'লেই প্রতিদিনকে রমনীয় মনে হবে, প্রতি কাজকে মনে হবে বরণীয় এবং নিজের পরিবেশকে মনে হবে দর্শনীয়। কারণ তার মধ্যে এই ঈশ্বরই যে বহুরূপে রয়েছেন। তাঁর রূপ থেকে রূপ নিয়েই যে রূপময় সব কিছু।

তপস্যার ধন

দুর্লভ ধন পেতে হলে দুর্লভ তপস্যা প্রয়োজন। যা সহজে আসে, তা সহজেই ভেসে যায়। ঠিক যেন বর্ষার জল। নিজেই উচ্ছ্বসিত আবেগে উজিয়ে এসে উপ্‌চে পড়ে, আবার ভাঁটার টানে আপনিই দৃশ্যান্তরিত হয়। কিন্তু সমুদ্রের গভীরে যেতে হলে তোমাকে তো সামুদ্রিক শক্তি অর্জন করতেই হবে! নইলে যে ভরাডুবি! তপস্যা হচ্ছে সেই শক্তি যা-দ্বারা দুর্লভকে লাভ করা যায়। ঈশ্বরলাভের পথ এই তপস্যারই পথ। নিজেকে সম্পূর্ণ চেতনার গভীরে নিয়ে গিয়ে ধ্যানের ঐশ্বর্যে তাঁকে পেতে হয়। এই ঐশ্বর্যে বাস করেন বলেই তিনি ঈশ্বর।

দেহ-মন

এই দেহ হচ্ছে মন্দির, আর মন হচ্ছে পূজারী। এই দেহ-মন্দিরে দেবতাকে প্রতিষ্ঠা ক'রে পূজারী হয়ে মন তার ভক্তিপুষ্পে দেব-পূজা সমাপন করে। মনকে তাই শুদ্ধাচারী হতে হয়, একাগ্র হতে হয়। দেবতার আবির্ভাব ঘটে সেই একাগ্র তপস্যায়। তাঁর প্রসন্ন আবির্ভাবই তাঁর কৃপা। সেই কৃপা-প্রার্থী হয়েই মন ধ্যানমগ্ন হয়। তাই দেহকে পবিত্র ও মনকে শুচিশুদ্ধ ক'রে রাখতে হয়।

দু'টি দ্বার

সূতিকাগার ও শ্মশান। জীব-জীবনের দু'টি দ্বার। আগমন ও নির্গমন; আবির্ভাব ও তিরোভাব। দু'টিই গমন ঃ একটি আ-যুক্ত, আর একটি 'নিঃ-যুক্ত ; আবার দু'টিই ভাব, একটি আবি-যুক্ত, আর একটি তিরো-যুক্ত। একটি দেহ-ধারণ ক'রে আসা, আর একটি দেহত্যাগ ক'রে দেব-সমুদ্রের তীরে পৌঁছে যাওয়া। এই দেহটা তাই নিতান্তই পার্থিব। এই পার্থিব দেহকে কেন্দ্র ক'রে যিনি আসেন এবং যান, তিনি লীলাময়

পরমাত্মা। তিনি স্বেচ্ছায় দেহ ধারণ ক'রে একটা বিশেষ রূপে চিহ্নিত হন, এইটেই তাঁর লীলা। আবার লীলা-কাল শেষ হলে দেহ ত্যাগ ক'রে চলে যান। একেই বলি আমরা জন্ম ও মৃত্যু। জন্মের মধ্য দিয়ে আমরা নবীন জীবদেহকে লাভ ক'রে খুশী হই, আবার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবকে হারিয়ে আমরা শোকার্ত হই। এ শোক তো দেহ-বিচ্ছেদের শোক। যদি বুঝতে পারি—দেহটা আধার মাত্র, এই আধারকে আবৃত ক'রে যিনি নিরন্তর আসা-যাওয়া করছেন, তিনি যে চিরন্তন সত্তা, তাঁর কখনো লয় নেই, তিনি অবিনাশী আত্মা। তিনি দেহী হয়েও যেমন আছেন, বিদেহী হয়েও তেমনিই আছেন। কখনো দৃশ্যে, কখনো অদৃশ্যে। তাঁর এই দৃশ্যাদৃশ্যের খেলাই আগমন ও নির্গমন, আবির্ভাব ও তিরোভাব। মৃত্যু দিয়ে আমরা যা চিহ্নিত করি, তা হচ্ছে দৃশ্যমান দেহটা। শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াটাও তাই দেহী-সত্তারই হয়। অবিনাশী আত্মার হয় না। আর যদি শ্রাদ্ধ অর্থে শ্রদ্ধা নিবেদনই বুঝায়, তবে সেই শ্রদ্ধা জীবদেহের স্থিতি-কালে নিবেদিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তখন অবিনাশী আত্মার জীবদেহে সক্রিয় ভূমিকা থাকে। তবে যদি 'আমি' নামক ব্যক্তি মনে করি—সব জীবাত্মাই পরমাত্মার অংশ, যাকে 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' বলি, তাকেই 'তত্ত্বমসি' জানি, তবে আর না-আমির দেহান্তে শ্রাদ্ধ-বাসর বসাতে হয় না। বসালে সেটা নিজের উপরেও বর্তায়। চাই বিদেহী আত্মার লীলা-অভিসারের পথকে পবিত্র ইচ্ছা দিয়ে ভূষিত ক'রে দেওয়া, চাই অবিনাশী আত্মার উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করা। পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার শ্রদ্ধা। জীবন-মৃত্যুর এই দু'টি অবস্থাকে যিনি এক ক'রে দেখেন, তাঁকেই আমরা স্থিতধী ও স্থিতপ্রজ্ঞ ব'লে জানি।

লক্ষ্য

যিনি প্রতীকে আছেন, ধ্যানে তিনিই প্রত্যক্ষ হন। প্রতীক উপলক্ষ, প্রত্যক্ষই লক্ষ্য। যেমন কুঁড়ি থেকে পুষ্পে বিকাশ, তেমনি প্রতীক থেকে প্রত্যক্ষে। কুঁড়ির যেমন জল, বায়ু ও সূর্যের তাপ চাই পুষ্পে পরিণত হ'তে, তেমনি অন্তরের ধ্যান ও আত্ম-নিবেদনে প্রতীক হয়ে ওঠেন প্রত্যক্ষ। তখন উপলক্ষ লক্ষ্যে পৌঁছে মুক্তি পায়। এ কোন্ মুক্তি ? তমসা থেকে আলোয়, ক্ষুদ্রতা থেকে বৃহতে, সীমা থেকে অসীমে, বন্ধন থেকে নির্বন্ধনে, জড়তা আর অন্ধতা থেকে অবারিত ঔদার্যে, বিষয় থেকে বিভবে, সংসার থেকে সারাৎসারে। মনকে তাই একটি পদ্মকোরকের মতো পুষ্পের পূর্ণতায় পৌঁছে দিতে হয়, তখন প্রতীকের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষে গিয়ে পৌঁছায় সেই পুষ্পাঞ্জলি। তিনি সেই অঞ্জলি গ্রহণ ক'রে তোমার সঙ্গে শুভযোগে যুক্ত হন। তাঁর সঙ্গে সংযুক্তিই তো মুক্তি !

স্বার্থ, পরার্থ ও পরমার্থ

তিনটি শব্দ ঃ স্বার্থ, পরার্থ ও পরমার্থ। তিনটি শব্দই অর্থবাচক। একটি স্ব-অর্থে, একটি পর-অর্থে এবং অন্যটি পরম অর্থে। স্ব-অর্থই তো স্বার্থ, নিজের ভিন্ন পরার্থে

মন যার সঙ্কীর্ণ, সেই তো স্বার্থসম্পন্ন ! তেমনি পরম অর্থই তো পরমার্থ। স্ব-অর্থ থেকে মুক্তি পেলেই তবে পরার্থ এবং পরমার্থ বোধ জাগ্রত হয়। এই জাগৃতিই মানব-চিত্তকে প্রকৃত চৈতন্যসত্তায় উন্নীত করে।

ঈর্ষা

ঈর্ষা মানুষের একটি সহজাত বৃত্তি। ঈর্ষা যখন প্রচণ্ড হয়, তখন তা অনলে পরিণত হয়। সেই অনলে দগ্ধ হয় কে ? যে ঈর্ষাপরায়ণ, সে। রামবাবুর এমন কিছু আছে—যা শ্যামবাবুর নেই। পাশাপাশি বাস ক'রে রামবাবুর পারিবারিক সুখ আর সামাজিক মর্যাদা শ্যামবাবুকে তাই বিদ্ধ করে। রামবাবুর স্ত্রীর জড়োয়ার গয়না আছে, শ্যামবাবুর স্ত্রীর নেই। এ তো বড় কম কথা নয়। রামগিন্নী তাই শ্যামগিন্নীর ঈর্ষার পাত্রী। এই নিয়ে তাঁরা শুধু অসুখী নন্, রীতিমতো অসুস্থ। এই অসুস্থতা ক্রমে তাঁদের দাম্পত্যকলহে রূপ নেয়, এবং অবশেষে তা বিড়ম্বিত ভাগ্যের তাড়নায় সিনিসিজ্‌মে গিয়ে পৌঁছায়। পরের সুখে অসুখী হবার মতো এমন শ্যাম-দম্পতির অভাব নেই। তেমনি ভিন্নতর ব্যক্তির অনায়াস সুযোগ ও কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদ লাভ সম্পর্কেও মানুষের স্বভাবজাত ঈর্ষাপ্রবণতা রয়েছে। প্রতিভা নিয়েও বিদগ্ধ সমাজে এরকম ঈর্ষা প্রায়ই ঘটে। কিন্তু—'আমি থাকি ছোট ঘরে বড় মন ল'য়ে,/ নিজের দুখের অন্ন খাই সুখী হয়ে',—এরকম উদাহরণ মণীষীদের বাণীবদ্ধ কাব্যে থাকলেও তার ব্যবহারিক রূপ খুবই দুর্লভ। কিন্তু দুর্লভ হলেও এমন মানুষ যে নেইই, তা তো নয়! আমি একদা কোনো এক বিশেষ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলাম ঃ 'আপনার প্রতিবেশী অমুক ভদ্রলোক দেখতে দেখতে চোখের সামনে বাড়ি, গাড়ী, বিষয়সম্পত্তি কতকিছু ক'রে ফেললেন, আর আপনি কি করেছেন?' তিনি বললেন ঃ 'আমার ক্ষুদ্র শক্তি ও নগন্য আয়। নিজের সামর্থ্যকে ছাপিয়ে কারুর বৃহত্তম সম্পদে আমার বিন্দুমাত্র লোভ বা ঈর্ষা নেই। এই পর্ণকুটীরই আমার দেবতার আলয়, আর আমার যে নেই কিছু—সেইটেই আমার পরম সম্পদ। না থাকার আনন্দকে থাকার দুঃখ দিয়ে আমি ঢেকে রাখতে চাই না।'

বললাম ঃ 'বাঃ, ভারী সুন্দর কথা বললেন। আপনি ধন্য।'

জীবনকে ধন্য মনে করতে পারে কে ? যে মুক্ত, যে পরশ্রীকাতর নয়, যে পর-সুখী, যে অল্প নিয়ে থেকেও বৃহত্তর আনন্দের অধিকারী, সে। ঈর্ষা, লোভ বা মোহ তার অভিধানে নেই। সে নিজের বৃন্তেই নিজে একটি প্রস্ফুটিত ফুল। ছোট ঘরে বড় মন নিয়ে থেকে নিজের দুঃখের অন্ন সে সুখী হ'য়ে গ্রহণ করে। আর সে শুধু নিজে সুখী হয় না, সেই সুখ অপরকেও দান করে।

মননেন হি জীবতি

দৈহিক অস্তিত্ব রক্ষা করাই জীবিত থাকা নয়। এরকম জীবিত থাকা তো পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ও তরুলতাও থাকে ; মন ও মননের দ্বারা জীবিত থাকাই প্রকৃত জীবিত

থাকা। মনই সর্ব চিন্তার উৎস আর মননই সর্ব মন্ত্রের উদগাতা। মননের দ্বারা যিনি এগিয়ে চলেন—কেবল এগিয়েই চলেন, তার মধ্যেই জীবনের সর্বব্যাপী জাগৃতি উৎসারিত হ'য়ে ওঠে, এবং পার্থিব অস্তিত্বের অবসানেও তিনি কেবলই চ'লেন—কেবলই চলেন, চলার মধ্যেই তিনি মূর্ত হয়ে ওঠেন, চলার মধ্যেই তিনি জীবিত থাকেন। 'যোগবাশিষ্ঠ' তাই বলেছেন—

'তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি ॥'

সর্বানুভূঃ

এই যে পিতৃহীন ও মাতৃহীন হয়ে আমি সংসারে একা আছি, এ কি নিতান্তই আমার একক সত্তা? তাঁদের দেহ নিয়েই তো আমি দেহী হয়েছি, আমার শরীরের শিরায় শিরায় তাঁদের শরীরেরই যে রক্ত প্রবাহিত, আমার বুদ্ধিবৃত্তি আর চেতনায় যে তাঁদেরই সংস্কার লেগে রয়েছে। আজ তাঁরা দৃশ্যালোকে নেই বলে কি আমার অস্তিত্ব থেকে তাঁরা একেবারেই লুপ্ত? না, তা তো নয়! তাঁরা আজ দৃশ্যের বাইরে আমার সমগ্র সত্তার অনুভবে সদা জাগ্রত। তেমনি ঈশ্বর বলে যাঁকে জানি, তিনি কি দৃশ্যে নেই ব'লেই নেই? আমার পিতা, আমার মাতা যেমন আমার ব্যক্তিসত্তায় জেগে আছেন, তেমনি ঈশ্বরও চিরজাগ্রত রয়েছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অনু-পরমানুতে। সেই মহাপ্রাণই প্রতিটি প্রাণে প্রবিষ্ট থেকে সকলের মধ্যে জীবন সঞ্চার করছেন। জীবনের মধ্যেই তিনি জীবনেশ্বর হ'য়ে আছেন। প্রাণের মধ্যে প্রাণ হ'য়ে তিনি বাক্‌শক্তি, দর্শন-শক্তি, ঘ্রাণ-শক্তি, চলৎ-শক্তি, চিৎশক্তি প্রমুখ নানা শক্তিতে ও নানা বৃত্তিতে জীবদেহকে পরিচালিত ক'রে চলেছেন। তিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা, সর্বানুভূঃ, সর্বঅনুভূতিসম্পন্ন, অন্তরতম, অন্তর্যামী। বিশ্বচেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে ব'সে বিশ্বের যাবতীয় ভাবপ্রবাহকে তিনি আপন অনুভবে গ্রহণ ক'রে আছেন। তাঁর অনুভবের বাইরে কিছু নেই। চলমান মেঘের মধ্যে যেমন তিনি বারি ও বিদ্যুৎপ্রবাহ, এই দেহের মধ্যেও তেমনি তিনি সঞ্চারমান অস্তিত্ব হয়ে আছেন। অথচ তিনি বায়ুহিল্লোলের মতই দৃশ্যপটের বাইরে। পরিব্যাপ্ত অনুভবের মধ্যে আছেন ব'লেই তিনি সর্বানুভূঃ। আমাদের পরিপূর্ণ চেতনার স্বীকৃতির মধ্যেই তাঁর নিত্য-উপস্থিতির সত্য জাগ্রত।

ভগবৎ-প্রীতি

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হ্লাদিনী শ্রীরাধার যে ভক্তি, সেই ভক্তিতেই ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়। আর এই ভক্তির মূলে কি প্রয়োজন? প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধির। কিভাবে এই চিত্তশুদ্ধি হয়? হয় রোমহর্ষে, চিত্তের দ্রবতায়, আনন্দাশ্রুতে ও ভক্তিতে। এই চিত্তশুদ্ধিগত ভক্তির দ্বারাই ভগবানের প্রতি প্রীতি জন্মে, ভগবৎ-সাম্মুখ্য ঘটে। এবং এই প্রীতি থেকেই একাত্মতা। ভাগবত-শ্লোকে তাই বলা হয়েছে ঃ 'রোমহর্ষাদিকং

বিনা কথং ভক্তির্গম্যতে। ভক্ত্যা চ বিনা কথমাশয়ঃ শুদ্ধ্যেৎ। তদেবং প্রীতিলক্ষণং চিত্তদ্রবঃ তস্য রোমহর্ষাদিকম্ কথঞ্চিৎ জাতেঽপি চিত্তদ্রবে রোমহর্ষাদিকে বা ন চেদাশয়-শুদ্ধিস্তদাপি ন ভক্তেঃ সম্যগাবির্ভাব ইতি জ্ঞাপিতম্। আশয়শুদ্ধির্নাম চান্যতাৎপর্যপরিত্যাগঃ প্রীতিতাৎপর্য্যঞ্চ। অতএব অনিমিত্তা স্বাভাবিকী চেতি তদ্বিশেষণম্।'

হ্লাদিনী শ্রীরাধা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বা অনন্যশক্তি ভগবানেরই হ্লাদিনী শক্তি। এই শক্তি তাঁতেই নিত্য বিদ্যমান। এই হ্লাদিনী শক্তির জন্য তিনি যেমন নিত্য আনন্দময়, তেমনি অপরকেও আনন্দানুভব করান। 'রসো বৈ সঃ, রস্যতে ইতি রসঃ, রসয়তি ইতি রসঃ।' —এই শক্তি তখন অপরের চিত্তে রতি বা রসবৃত্তিরূপে সঞ্চারিত। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এবং ভগবানের সঙ্গে ভক্তের তখন উভয়াঙ্গিক রস-রাস। ভক্ত কে? সর্ববিধ চিত্তশুদ্ধির দ্বারা যে ভক্তি নিবেদন করে, সে-ই ভক্ত। ভগবৎ-প্রীতিতে ভগবানের এই হ্লাদিনী শক্তি আনন্দরূপে জীবে প্রকাশ পায়। এইভাবে ভগবৎ-প্রীতি ও হ্লাদিনী শক্তির এই একত্ববশতঃ পরস্পরের আবেশ হয়ে থাকে; এই আবেশই ভাবাবেশ বা রস-রাস। তখন 'সৎসুখেন ভক্ত-ভগবতোঃ পরস্পরমাবেশমাহ।' ভাগবত তখন বলেন ঃ 'যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।'

বিশ্বাস-অবিশ্বাস

বিশ্বাসী বললেন ঃ 'ঈশ্বর আছেন।'

অবিশ্বাসী বললেন ঃ 'ঈশ্বর নেই। তুমি যে বলছো ঈশ্বর আছেন, তার প্রমাণ কি?'

বিশ্বাসী বললেন ঃ 'তার প্রমাণ—তুমি আছো। তত্ত্বমসি। তুমিই তিনি। সোঽহং, আমিই তিনি। তিনি রূপং রূপং প্রতিরূপ, রূপে রূপে প্রতিরূপে তিনি প্রকাশিত। তোমার মধ্যে তিনি তুমি হয়ে আছেন, আমার মধ্যে তিনি আমি হয়ে আছেন, সমস্ত বিশ্বচরাচরে তিনি বিশ্বরূপা হয়ে ছড়িয়ে আছেন। ঈশাবাস্য মিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ঃ জগতের যা কিছু, সবই তাঁর দ্বারা পূর্ণ।'

অবিশ্বাসী বললেন ঃ 'তাই যদি, তবে কেউ সাধু কেউ চোর কেন, কেউ অন্ধ কেউ চক্ষুষ্মান কেন, কেউ দাতা কেউ গ্রহীতা কেন?'

বিশ্বাসী বললেন ঃ 'তিনি জগৎ সৃষ্টি করে মায়ার আবরণে নানা দেহের মধ্য দিয়ে এই লীলাই করছেন। একদিকে তিনি ভাঙছেন, অন্যদিকে গড়ছেন, কখনো হাসছেন, কখনো কাঁদছেন। সবই তিনি, তিনিই সব করাচ্ছেন। নিজেকে নানারূপে আস্বাদন করতেই তাঁর এই সৃষ্টিলীলা।'

অবিশ্বাসী বললেন ঃ 'প্রকৃত প্রমাণের অভাবে এ সব নিতান্তই গোজামিল। ঈশ্বর আছেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথায়?'

বিশ্বাসী বললেন ঃ 'একবাড়ির একতলায় ছেলে থাকে, পিতা থাকেন দোতলায়। একতলায় পিতা নেই ব'লে কি ছেলের কাছে পিতার অস্তিত্ব মিথ্যা? তুমি কি

বলবে—তুমি পিতৃহীন ? তাতেও প্রমাণিত হচ্ছে—তোমার পিতা ছিলেন, এখন তিনি নেই, অথবা তিনি আছেন—আছেন দৃশ্যের বাইরে, তোমার অস্তিত্বে। তেমনি প্রত্যক্ষে হোক পরোক্ষে হোক—ঈশ্বর আছেন, আছেন দৃশ্যের বাইরে, অথচ আমাদেরই সমস্ত অস্তিত্বে, চাইলেই যাঁকে দৃশ্যে পাওয়া যায়।'

অবিশ্বাসী এবারে নীরবে কেমন একটা উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন, মনে মনে চেষ্টা করলেন সেই দৃশ্যের ভিতরে প্রবেশ করতে।

ঈশ্বর-দর্শন

তাঁকে কি দেখা যায় ? যায়। তাঁকে কি পাওয়া যায় ? যায়। কি করে দেখা যায় ? যেমন ক'রে দেখা যায় সূর্যকে, যেমন ক'রে দেখা যায় অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ আর চন্দ্রকে, যেমন ক'রে দেখা যায় নানা বৃক্ষশোভিত প্রকৃতিকে। কি ক'রে পাওয়া যায় ? যেমন করে পাওয়া যায় সূর্যের কিরণকে, যেমন ক'রে পাওয়া যায় নক্ষত্রপুঞ্জ আর চন্দ্রের শুভ্র আলোকে, যেমন ক'রে পাওয়া যায় বাতাসকে। জলে তিনি প্রাণ হয়ে আছেন, নিঃশ্বাসের বায়ুতে তিনি প্রাণ হয়ে আছেন, সূর্যের কিরণে আর চন্দ্রের আলোকে তিনি প্রাণ হয়ে আছেন। সব মিলিয়ে তিনি এক অনন্ত অখণ্ড সত্তা। এই দেহসত্তার সঙ্গে সেই অনন্ত সত্তা যুক্ত। তিনি নিরাকার—অথচ আকারে ধরা দেন। কি সেই আকার ? যেমন সন্তানের কাছে মা। মায়ের রূপটি সন্তানের মনে গাঁথা হয়ে আছে। মাকে তাই দেখে চিনতে দেরী হয় না সন্তানের। তেমনি বিশ্বজননীকে যে-কাল্পনিক রূপে যে-ব্যক্তি মনে গেঁথে নিয়েছে, সেই রূপেই তিনি তার কাছে প্রতিভাত হন, কখনো মূর্তি ধরে, কখনো বা জ্যোতি হয়ে। তাঁকে প্রত্যক্ষ করাই হচ্ছে মূর্তিময়ী জ্যোতির্ময়-সত্তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া। তিনি তাঁর স্নেহময়ী প্রোজ্জ্বল দু'টি চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন সন্তানের দিকে। সেই চোখ দু'টি প্রত্যক্ষ করলেই মাতৃকরুণা বিগলিত ধারায় এসে সন্তানের সমস্ত সত্তাকে অমৃতরসে ভাসিয়ে দেবে। শুধু তাঁকে দেখতে পারার মতো দৃষ্টি চাই, উপলব্ধি করবার মতো মন চাই, আর পাবার মতো হৃদয় চাই।

সংশয়বাদী নরেন্দ্রনাথ যখন প্রশ্ন করলেন ঃ 'আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন ?' পরমহংসদেব বললেন ঃ 'দেখেছি বৈ কি, যেমন চোখের সামনে এই তোকে দেখছি, তেমনি ভবতারিণী মাকেও দেখি, মার সঙ্গে কথা বলি। তুইও মাকে মনে মনে উপলব্ধি কর, মাকে ডাক, তুইও তবে দেখতে পাবি।'

তিনি যে দেখা দিতেই আমাদের দু'চোখ আচ্ছন্ন ক'রে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে একান্ত ক'রে দেখতে চাওয়াটাই দেখতে পাওয়া।

ভারত কথা

জগৎ কি ? —প্রশ্নটা কঠিন। একটি সুন্দর ভাষ্যে তা পরিষ্কার করে দিলেন ভারত ব্রহ্মচারী। বললেন ঃ 'এ জগৎ মায়ের প্রতিমা।'—এর চাইতে সুন্দর মানে বোধ করি

কেউ কোথাও খুঁজে পায়নি। মা বলতে কাকে বুঝি ? বুঝি এই জগৎসৃষ্টিকারিনী ব্রহ্মময়ী মহামায়াকে। তিনি আমার প্রাণের মধ্যে নিত্য প্রাণ হয়ে জেগে আছেন। এ বিশ্ব তাঁরই প্রাণের লীলা। জগতের আনন্দযজ্ঞে তিনি চির আনন্দময়ী। প্রতি-দিন প্রভাতে সূর্য ওঠে, আকাশে জাগে আলোর সঙ্গীত ; বনে-বনান্তে, নদীতে সমুদ্রে, পাহাড়ে পর্বতে, বিটপীর শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় পাখিদের কল-কাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে সেই সঙ্গীত। এ তো প্রাণেরই খেলা। অনন্ত প্রাণ যে এই বিশ্বপ্রাণেই প্রতিমুহূর্তে মূর্ত হয়ে উঠছে! 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণঃ এজতি নিঃসৃতম্।' সামগ্রিক এই প্রাণচিত্রকে প্রতিমা ভিন্ন আর কিছু কি ভাবা যায় ? যায় না। এই জগৎকে তাই মায়ের প্রতিমা বলেছেন ভারত ব্রহ্মচারী।

যিনি ব্রহ্মে বিচরণ করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা যে এই ভারতভূমিতেই! ভারত এলেন যেন এই ভূমিরই প্রতীক হয়ে! প্রাণবায়ুতে যাঁর ব্রহ্মভাবনা, ব্রহ্মই যাঁর প্রাণায়াম আর উপাসনা, তিনিই তো যোগী। কিসের যোগে যোগী ? যোগ ব্রহ্মের সাথে আর ব্রহ্মসৃষ্ট এই জগতের সাথে। এমন যোগীপুরুষ মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হ'য়ে মানব-কল্যাণের মন্ত্র রেখে যান সকলের অন্তরে।

মানুষ বড় অসহায়, সমাজ বড় অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাদের সমুন্নতি সাধনে নিজেকে ব্যয় করা—তার মতো সার্থকতা মানবজীবনে আর কী আছে ? ঈশ্বরাদেশই যে তাই। যোগসিদ্ধ পুরুষেরা এই ধরাধামে আসেন ঈশ্বরাদিষ্ট সেই কাজ ক'রে যেতে। যোগ-চিত্তে ব্রহ্মচারী তাঁর এক ভক্তকে লেখেন : 'আমি মায়ের বড় বাৎসল্যের ধন। এই যে শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় পঞ্চক, কেবল আমার জন্য। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি আমার জন্য, সৃষ্টি-লয়াদি ক্রিয়া আমার জন্য। হাসি-কান্নাও আমার জন্য। জন্ম-মৃত্যু আমার জন্য। সুখ-দুঃখ আমার জন্য। শুধু আমার জন্যই নিদ্রারূপে মা, তৃষ্ণারূপে মা, ভ্রান্তিরূপে মা, পুষ্টিরূপে মা, দয়ারূপে মা, ক্ষমারূপে মা। আবার আকাশরূপে মা, বাতাস রূপে মা, তেজোরূপে মা, জল রূপে মা। এমন কি কেবল আমার জন্যই মা আমার একে-বারে মাটি হ'য়ে গেছে। এই যে জগৎ, এও আমার জন্য ; জগৎটা আমার খেলা।'

এ একেবারে পূর্ণচৈতন্য ব্রহ্মের গভীরতম উপলব্ধি। সর্বাকিছুর সঙ্গে একাত্মতা-বোধ এবং নিজেকে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ উপলব্ধি। এ বড় সহজ নয়। সাধক তাঁর তপস্যার কোন্ স্তরে গিয়ে পৌঁছালে এই উপলব্ধি আসে, তা তাঁর সমধর্মী সাধক ভিন্ন অপরের পক্ষে বলা কঠিন। কিন্তু এই কঠিনকে জয় করেই তো সাধনার শীর্ষস্তরে উত্তরণ! এই উত্তরণের পথ মানুষেরই পথ।